উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (<Education>)[<NED>]
Course Title : Thoughts of Great Educators

Course Code : 6CC-ED-04

First Print : March, 2025

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (<Education>)[<NED>]
Course Title : Thoughts of Great Educators
Course Code : 6CC-ED-04

: বিষয় সমিতি (Board of Studies) :
: সদস্যবৃন্দ (Member) :

ড. অতীন্দ্রনাথ দে
Director, SoE, NSOU, Chairman (BoS)

ড. শিবপ্রসাদ দে
Professor, SoE, NSOU

ড. খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
Professor, Dept. of Education, University of Burdwan

ড. অভিজিত কুমার পাল
Professor, Dept. of Education, West Bengal State University

ড. দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য
Professor, Dept. of Education, University of Kalyani

ড. দেবী প্রসাদ নাগ চৌধুরী
Professor, SoE, NSOU

ড. পাপিয়া উপাধ্যায়
Assistant Professor, SoE, NSOU

ড. পরিমল সরকার
Assistant Professor, SoE, NSOU

ড. নিমাই চাঁদ মাইতি
Professor, SoE, NSOU

: কোর্স রচয়িতা :
ড. দেবী প্রসাদ নাগ চৌধুরী
Professor, SoE, NSOU

: সম্পাদনা :
ড. নিমাই চাঁদ মাইতি
Professor, SoE, NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা :
ড. পরিমল সরকার
Assistant Professor, SoE, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

মহান শিক্ষাবিদদের চিন্তাভাবনা (Thoughts of Great Educators)
Course Code : 6CC-ED-04

মডিউল-1

একক 1 ❐ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (Ishwarchandra Vidyasagar) 9 - 18

একক 2 ❐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore) 19 - 31

একক 3 ❐ স্বামী বিবেকানন্দ (Swami Vivekananda) 32 - 54

মডিউল-2

একক 4 ❐ মহাত্মা গান্ধী (Mahatma Gandhi) 57 - 68

একক 5 ❐ শ্রী অরবিন্দ (Sri Aurobindo) 69 - 78

একক 6 ❐ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (Sarvepalli Radhakrishnan) 79 - 87

মডিউল-3

একক 7 ❐ জ্যাঁ জ্যাক রুশো (Jean Jacques Rousseau) 91 - 104

একক 8 ❐ জোহান হাইনরিখ পেস্তালৎসি (Johann Heinrich Pestalozzi) 105 - 113

একক 9 ❐ ফ্রেডরিখ উইলহেম অগাস্ট ফ্রোবেল (Friedrich Wilhelm August Froebel) 114 - 124

মডিউল-4

একক 10 ❒ জন ডিউই (John Dewey) 127 - 138

একক 11 ❒ ম্যাডাম মারিয়া মন্টেসরি (Madam Maria Montessori) 139 - 156

একক 12 ❒ উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক (William Heard Kilpatrick) 157 - 169

মডিউল-5

একক 13 ❒ পাওলো ফ্রেইরে (Paulo Freire) 173 - 185

একক 14 ❒ ইভান ইলিচ (Ivan Illich) 186 - 195

একক 15 ❒ এ. পি. জে. আবদুল কালাম (A. P. J. Abdul Kalam) 196 - 207

Module – I

Indian Thinkers–I

একক 1 ❑ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার (Ishwarchandra Vidyasagar)

গঠন

1.1 উদ্দেশ্য **(Objectives)**

1.2 ভূমিকা **(Introduction)**

1.3 পারিবারিক জীবন, শিক্ষা এবং বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ **(Family life, Education and obtaining the title Vidyasagar)**

1.3.1 পারিবারিক জীবন **(Family Life)**

1.3.2 শিক্ষা **(Education)**

1.3.3 বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ **(Obtaining the title Vidyasagar)**

1.4 সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা **(Vidyasagar's Role in Social Reform)**

1.4.1 বিধবা বিবাহ প্রবর্তন **(Introduction of Widow Marriage)**

1.4.2 বাল্যবিবাহ রোধ **(Prevention of Child Marriage)**

1.4.3 বহুবিবাহ নিবারণ **(Prevention of Polygamy)**

1.5 শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান **(Contribution of Vidyasagar to Education)**

1.5.1 শিশু শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান **(Contribution of Vidyasagar to Child Education)**

1.5.2 নারী শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান **(Contribution of Vidyasagar to the Expansion of Womens Education)**

1.5.3 সাহিত্য ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান **(Contribution of Vidyasagar to the field of Literature)**

1.6 সারাংশ **(Summary)**

1.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

1.8 গ্রন্থপুঞ্জ **(Bibliography)**

1.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান ও তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং বহুবিবাহ নিবারণে সমাজ সংস্কারক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা জানতে পারবেন।
- শিশু শিক্ষার জন্য পুস্তক রচনা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের অবদান জানতে পারবেন।
- নারী শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান জানতে পারবেন।
- সাহিত্য ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান জানতে পারবেন।

1.2 ভূমিকা (Introduction)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। পশ্চিমবাংলার পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও গদ্যকার ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে 1839 খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘‘বিদ্যাসাগর’’ উপাধি লাভ করেন। তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ ও সহজপাঠ্য করে তোলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই। তিনি শিশুপাঠ্য ‘‘বর্ণ পরিচয়’’ সহ একাধিক পাঠ্যপুস্তক এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। অন্যদিকে বিধবা বিবাহ প্রচলন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহর মত সামাজিক অভিশাপ দূরীকরণে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা সবার স্মরণীয়। বাংলার নবজাগরণের পুরোধা এই ব্যক্তিত্ব দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন ‘দয়ার সাগর’ নামে। দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িত মানুষ কখনোই তাঁর কাছ থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেত না। পিতামাতার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তি ও বজ্রকঠিন চরিত্রবল বাংলায় প্রবাদপ্রতিম। পশ্চিম মেদিনীপুরে তাঁর স্মৃতিরক্ষায় স্থাপিত হয়েছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।

1.3 পারিবারিক জীবন, শিক্ষা এবং বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ (Family life, Education and obtaining the title Vidyasagar)

1.3.1 পারিবারিক জীবন (Family life)

1820 খ্রিস্টাব্দের 26 সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শর্মা জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম শ্রীমতী ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর পিতামহী ছিলেন বীরসিংহ গ্রামের বিদগ্ধ পণ্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের কন্যা শ্রীমতী দুর্গাদেবী। বিদ্যাসাগররা ছিলেন সাত ভাই তিন বোন। তিনি পিতা-মাতার প্রথম সন্তান। শৈশব থেকে বিদ্যাসাগরের জীবনে পিতা-মাতার সঙ্গে পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের প্রভাবও খুব বেশি পড়েছিল।

ছেলেবেলা থেকেই বিদ্যাসাগর ছিলেন খুব জেদি ও সংকল্পে অবিচল মানুষ। তাঁর মাতৃভক্তি কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। মাতৃ আজ্ঞা তাঁর কাছে ছিল অলঙ্ঘনীয়। তৃতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্রের যখন বিয়ে ঠিক হলো, জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে মা চিঠি লিখেছিলেন—"শত কাজ থাকুক, নির্দিষ্ট দিনে তোমাকে উপস্থিত থাকতেই হবে। তুমি না আসতে পারলে মনে আমি কষ্ট পাব।" বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ ইংরেজ সাহেবের কাছে যখন ছুটির জন্য দরখাস্ত জমা দিলেন, তখন অধ্যক্ষ কলেজে পরীক্ষা চলছে বলে তাঁকে ছুটির আবেদন না-মঞ্জুর করেছিলেন। পরের দিন বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়ে অধ্যক্ষকের কাছে পদত্যাগপত্র দিয়ে মাতৃ আদেশ পালনের কথা জানালেন। তখন অধ্যক্ষ তাঁর ছুটির দরখাস্ত অনুমোদন করেছিলেন। তখন বর্ষাকাল। কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করে প্রথমে খরস্রোতা দামোদর নদী ও পরে দ্বারকেশ্বর নদী সাঁতরে পেরিয়ে মধ্যরাতে বীরসিংহ গ্রামে মায়ের কাছে পৌঁছলেন।

আনুমানিক 14 বছর বয়সে 1834 খ্রিস্টাব্দে তিনি ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দীনময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। 1849 খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম সন্তান পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের জন্ম হয়। হুগলী জেলার খানাকুল নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 14 বছর বয়সী বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর সাথে বিদ্যাসাগর তাঁর 21 বছরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ দেন। বিদ্যাসাগরের এক পুত্র এবং চার কন্যা। প্রথম কন্যা হেমলতার সাথে গোপালচন্দ্র সমাজপতির বিয়ে হয়। দ্বিতীয় কন্যা কুমুদিনীর সাথে বিয়ে হয় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের, তৃতীয় কন্যা বিনোদিনীর সাথে বিয়ে হয় সূর্যকুমার অধিকারীর এবং কনিষ্ঠ কন্যা শরৎকুমারীর সাথে বিয়ে হয় কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে। বারানসীতে 1870 খ্রিস্টাব্দে মা ভগবতী দেবীর এবং 1876 খ্রিস্টাব্দে বাবা ঠাকুরদাসের মৃত্যু হয়। 1888 খ্রিস্টাব্দের 13 আগস্ট স্ত্রী দীনময় দেবীর মৃত্যু ঘটে। 1891 খ্রিস্টাব্দের 29 জুলাই কলকাতার বাদুড়বাগানের বসতবাড়ীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 70 বছর 10 মাস 3 দিন বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

1.3.2 শিক্ষা (Education)

চার বছর নয় মাস বয়সে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের সনাতন বিশ্বাসের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। কিন্তু সনাতন বিশ্বাস বিদ্যাদানের চেয়ে শাস্তিদানেই বেশি আনন্দ পেতেন। সেই কারণে পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের উদ্যোগে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে উৎসাহী

যুবক বীরসিংহ গ্রামে একটি নতুন পাঠশালা স্থাপন করেন। অতঃপর এই পাঠশালায় ভর্তি হন ঈশ্বরচন্দ্র। তিনি সেখানে প্রচলিত বাংলা শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

1828 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পিতার সঙ্গো কলকাতায় আসেন। কথিত আছে, পদব্রজে বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় আসার সময় পথের ধারে মাইল ফলকে লেখা ইংরাজি সংখ্যাগুলি দেখে ইংরাজি সংখ্যা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। 1829 খ্রিস্টাব্দের 1 জুন কলকাতা গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ, যা বর্তমানে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন ঈশ্বরচন্দ্র। ব্যাকরণ পড়ার সময় 1830 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি শ্রেণিতেও ভর্তি হন তিনি। 1831 খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য মাসিক পাঁচ টাকা হারে বৃত্তি পান এবং একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ ও আট টাকা পারিতোষিক পান। তিন বছর ব্যাকরণ অধ্যয়নের পরে 12 বছর বয়সে তিনি কাব্য শ্রেণিতে প্রবেশ করেন। 1833 খ্রিস্টাব্দে 'পে স্টুডেন্ট' হিসেবে তিনি আরও 2 টাকা পান। 1834 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য 5 টাকা মূল্যের পুস্তক পারিতোষিক হিসেবে পান। ঐ বছরই ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দীনময়ী দেবীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। 1935 খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে 'অলংকার' শ্রেণিতে প্রবেশ করেন। অলংকার শাস্ত্র একটি অত্যন্ত কঠিন বিষয়। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তিনি সাহিত্য দর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলংকার গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে নয়টি গ্রন্থ পারিতোষিক পান।

1837 খ্রিস্টাব্দে তাঁর মাসিক বৃত্তি বেড়ে হয় আট টাকা। এই বছরেই ঈশ্বরচন্দ্র 'স্মৃতি' শ্রেণিতে ভর্তি হন। তখন 'স্মৃতি' পড়তে হলে আগে বেদান্ত ও ন্যায়দর্শন পড়তে হবে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের মেধায় সন্তুষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁকে সরাসরি 'স্মৃতি' শ্রেণিতে ভর্তির অনুমতি দেন। ঐ পরীক্ষাতেও তিনি অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। অতঃপর তিনি ভর্তি হন 'বেদান্ত' শ্রেণিতে। 1838 খ্রিস্টাব্দে বেদান্ত পাঠ সমাপ্ত করেন। ঐ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে মনুসংহিতা, প্রবোধ চন্দ্রোদয় প্রভৃতি পাঁচটি গ্রন্থ পারিতোষিক পান। সংস্কৃতে শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার জন্য 100 টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। 1840-41 খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ন্যায়' শ্রেণিতে পঠনপাঠন করেন। ন্যায় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় 100 টাকা, পদ্য রচনার জন্য 100 টাকা, দেবনাগরী হস্তাক্ষরের জন্য 8 টাকা এবং বাংলায় কোম্পানির রেগুলেশন বিষয়ক পরীক্ষায় 25 টাকা, সর্বমোট 233 টাকা পারিতোষিক পেয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। 1841 খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর সেই বছরেই তিনি 29 ডিসেম্বর মাত্র 21 বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদ অলংকৃত করেন এবং কর্মজীবন শুরু করেন।

1.3.3 'বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ (Obtaining the title Vidyasagar)

জন্মগ্রহণ কালে তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ তাঁর বংশানুযায়ী নাম রেখেছিলেন 'ঈশ্বরচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়'। 1839 খ্রিস্টাব্দের 22 এপ্রিল হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা দেন ঈশ্বরচন্দ্র। এই পরীক্ষাতেও ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গো উত্তীর্ণ হন এবং 16 মে হিন্দু ল কমিটির কাছ থেকে তিনি যে প্রশংসাপত্র পান তাতেই প্রথম তাঁর নামের সঙ্গো 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি ব্যবহৃত হয়। প্রশংসাপত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

HINDU LAW COMMITTEE OF EXAMINATION

We hereby certify that at an Examination held at the Presidency of Fort William on the 22nd Twenty-second April 1839 by the Committee apointed under the provision of Regulation XI 1826 Issur Chandra Vidyasagar was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law Officer in any of the Established Courts of Judicature.

H.T. Prinsep
President
J. W. J. Ousely
Member of the Committee of Examination

The Certificate has been granted to the said Issur Chandra Vidyasagar under the seal of the committee. This 16th Sixteenth day of May in the year 1839 Corresponding with the 3rd Third Joistha 1761 Shukavda.

J.C.C. Sutherland
Secy to the Committee
(পুরনো বানান অপরিবর্তিত)

1.4 সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা (Vidyasagar's Role in Social Reform)

উনিশ শতকে বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে যে সমস্ত মনীষী চিরস্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম বাস্তববাদী ও মানবতাবাদী সংস্কারক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও গোড়ামী থেকে সমাজের মানুষের মুক্তি দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগর আজীবন লড়াই করেছেন।

1.4.1 বিধবা বিবাহ প্রবর্তন (Introduction of Widow Marriage)

তৎকালীন হিন্দু সমাজে স্বামী মারা গেলে নারীদেরকে আজীবন বৈধব্য জীবন যাপন করতে হতো। হিন্দু বিধবাদের অসহনীয় দুঃখ, তাদের প্রতি পরিবারবর্গের অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল তাঁকে। হিন্দুশাস্ত্র উদ্ধৃত করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, যে লোকাচার ধর্মের নামে সমাজে প্রচলিত, আসলে তা ধর্মবহির্ভূত স্থবিরতার আচার মাত্র। তিনি সমাজের আচার আচরণের রক্ষকদের দেখিয়েছিলেন, পরাশর সংহিতায় বিধবা বিবাহ দেওয়ার বিধান রয়েছে, তাই বিধবা বিবাহ অনুচিত কর্ম

নয়। এই বিষয়ে তিনি 1855 খ্রিস্টাব্দে একটি পুস্তক রচনা করেন যেটি তৎকালীন সমাজে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল।

বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় 1856 খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে 15 নং আইনের মাধ্যমে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। তিনি বিধবা বিবাহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে প্রথম তাঁর একমাত্র পুত্র 22 বছর বয়সী নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ে সাথে শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্দশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিবাহ দিয়েছিলেন। 1866 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি আরও 60টি বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন।

1.4.2 বাল্যবিবাহ রোধ (Prevention of Child Marriage)

বিদ্যাসাগরের সময়ে সমাজ ব্যবস্থায় বাল্য বিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে পরিগণিত হতো। বিদ্যাসাগর প্রথম তৎকালীন সময়ে বাল্যবিবাহ রোধে বিশেষ প্রচেষ্টা করেন, সেটি সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি নারী শিক্ষার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ করার পদক্ষেপ করেন। তিনি বলেন, নারীরা শিক্ষিত হলেই স্বাভাবিকভাবে বাল্যবিবাহ রোধ হবে।

বাল্যবিহ রোধ করার স্বপক্ষে তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন। তিনি 1850 খ্রিস্টাব্দে মতিলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "সর্ব শুভকরি" পত্রিকায় বাল্য বিবাহের দোষ নামক প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে প্রকটভাবে সমালোচনা করেন। সমাজ সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানগুলির মধ্যে বাল্যবিবাহ রোধের প্রচেষ্টা হল অন্যতম। বিদ্যাসাগরের "বাল্যবিবাহের দোষ" নামক প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছিল। তিনি অতি সহজ ভাষায় ও বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি প্রয়োগ করে বাল্যবিবাহের দোষ ও বয়স্ক বিবাহের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন। সকল কিছু বিচার করে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—

> "বাল্যকালে বিবাহ করিয়া আমরা সর্বতোভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হই। কারণ, প্রথমত বিবাহ ঘটিত আমোদ প্রমোদেও কেলিকৌতুকে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য কাল যে বাল্যকাল, তাহা বৃথা হইয়া যায়। অনন্তর উপার্জন ক্ষমতার জন্ম না হইতেই সন্তানের জন্মদাতা হই। তখন নিত্য প্রয়োজনীয় অর্থের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে হয়।"

1.4.3 বহুবিবাহ নিবারণ (Prevention of Polygamy)

বহুবিবাহ প্রথা ছিল হিন্দু মেয়েদের কাছে এক ভয়ংকর অভিশাপ। একাধিক সতীন নিয়ে প্রবল দুঃখে ঘর-সংসার করা ছিল তাদের অনিবার্য নিয়তি। মেয়েদের এই দুঃখ নিবারণে এগিয়ে আসেন বিদ্যাসাগর। যুক্তি-তর্কে বিরুদ্ধবাদীদের পরাস্ত করে বহুবিবাহকে আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত 1955 খ্রিস্টাব্দে এই নিষ্ঠুর প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। 1955 খ্রিস্টাব্দে হিন্দু বিবাহ আইনের 25 নং ধারা অনুযায়ী এক স্ত্রী অথবা স্বামী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

1871 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা

এতদ্বিষয়ক বিচার" বইটি। এই বইয়ে বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় পন্ডিত এবং রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। একটি তালিকায় তিনি দেখিয়েছিলেন, 197 কুলীন পুরুষ 2288টি বিয়ে করেছে। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু রক্ষণশীলদের মধ্যে যে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল, তার জবাব দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর রচনা করেন "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার"- দ্বিতীয় পুস্তকটি, যা প্রকাশিত হয়েছিল 1872 খ্রিস্টাব্দে। এই বিষয়ে কিশোরীচাঁদ মিত্র, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখের সমর্থনে বহুবার ভারত সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে বিদ্যাসাগরের সমর্থনে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসেন। সভাসমিতি, লেখালেখি ও সরকারী দপ্তরে ডেপুটেশন প্রভৃতির মাধ্যমে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ নিবারণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

1.5 শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান (Contribution of Vidyasagar on Education)

শিক্ষার বিভিন্ন দিকে যেমন শিশু শিক্ষার বিস্তার, সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার, নারী শিক্ষার বিস্তার, বিদ্যালয় স্থাপন ও সাহিত্য ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান উল্লেখযোগ্য।

1.5.1 শিশু শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান (Contribution of Vidyasagar to Child Education)

বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষার বিকাশের জন্য যে সমস্ত ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল "বর্ণ পরিচয়" পুস্তক রচনা। বাংলা ভাষা বলা ও লেখার পদ্ধতি প্রকরণ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সুচিন্তার ফলই 'বর্ণ পরিচয়'। বর্ণ পরিচয়ের 'প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হয় 1855 খ্রিস্টাব্দের 13 এপ্রিল এবং 'দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশিত হয় 1855 খ্রিস্টাব্দের 14 জুন। ধ্বনি মাধুর্য রেখে যথার্থ উচ্চারণ শেখানো এবং বাংলা ভাষার সরলীকরণের জন্যই তিনি বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন। কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে তিনি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার অনেক সরল করেন। দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসাগর শিখিয়েছিলেন মূল সংযুক্ত বর্ণ, র-ফলা ও মিশ্র সংযোগের ব্যবহার। দুই পয়সা মূল্যের এই ক্ষীণকায় পুস্তিকার প্রকাশ বাংলার শিক্ষাজগতে ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। গ্রন্থটি যে শুধু বিদ্যাসাগরের জীবিতকালেই সমাদৃত হয়েছিল তা নয়, আজও এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি।

'বর্ণ পরিচয়' ছাড়া ভাষা শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর 'কথামালা', 'বোধোদয়' প্রভৃতি পুস্তিক রচনা করেন। তিনি ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ কৌমুদী, উপক্রমণিকা প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। তিনি 1855 থেকে 1856 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পশ্চিমঙ্গের বিভিন্ন জেলা, যেমন—মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে 20টি মডেল স্কুল

গড়ে ওঠে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনোটিতে তিনি পুরো নির্মাণ খরচ বহন করেছিলেন।

1.5.2 নারী শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান (Contribution of Vidyasagar to the Expansion of Women Education)

বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ছিলেন নারীশিক্ষা বিস্তারের পথিকৃত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীজাতির উন্নতি না ঘটলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ড্রিংক ওয়াটার বেথুন উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই প্রথম ভারতীয় বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। এটি বর্তমানে 'বেথুন স্কুল' নামে পরিচিত। 1857 খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলায় মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামাঞ্চলে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় ''স্ত্রীশিক্ষা বিধায়নী সম্মেলনী'' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে 1858 খ্রিস্টাব্দে মে মাসের মধ্যে নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় 35টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তখন প্রায় 1300 ছাত্রী এই স্কুলগুলিতে পড়াশুনা করত। ধারাবাহিক ভাবে তিনি সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করায় সরকার এই স্কুলগুলির কিছু আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে রাজি হয়। 1864 খ্রিস্টাব্দে বাংলায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় সর্বমোট 288টি। এরপর কলকাতায় 1872 খ্রিস্টাব্দে ''মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন'' এবং মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি নিজ গ্রাম বীরসিংহে ''ভগবতী বিদ্যালয়'' প্রতিষ্ঠা করেন।

1.5.3 সাহিত্য ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান (Contribution of Vidyasagar to the field of Literature)

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে 1839 খ্রিস্টাব্দে তিনি ''বিদ্যাসাগর'' উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁকে বাংলা সাহিত্যে সার্থক গদ্যকার মনে করা হয়। তিনি গদ্যে চলিত ভাষার গতিশীলতাও যুক্ত করেন। কল্পনা ও স্বকীয় পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণে তিনি যে গদ্য ভাষার জন্ম দেন, তা ছিল সরস, সুমধুর, সুশ্রাব্য ও ছন্দোময়। এই অর্থে তিনি ছিলেন গদ্যের নব জন্মদাতা। 1854 খ্রিস্টাব্দে 'শকুন্তলা' এবং 1860 খ্রিস্টাব্দে 'সীতার বনবাস' গ্রন্থে তাঁর বিশিষ্ট গদ্যশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অসামান্য দখল ছিল। সংস্কৃত শব্দ ও পদবিন্যাসের শ্রুতিমাধুর্য ও গাম্ভীর্যকেই তিনি স্থান দিয়েছিলেন বাংলা গদ্যে, দুর্বোধ্যতা বা দুরূহতাকে নয়। সাহিত্যে তাঁর প্রায় অর্ধশত অবদানের মধ্যে ব্যাকরণ কৌমুদী, বোধোদয়, বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথামালা ভ্রান্তিবিলাস, অন্নদামঙ্গাল, কাদম্বরী প্রভৃতি কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হল।

1.6 সারাংশ (Summary)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল যুগপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কুলিন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মসূত্রে তাঁর উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে অলংকৃত করেছে। বর্তমানেও তিনি একই ভাবে বাংলা তথা ভারতবর্ষে সমাদৃত। তাঁকে ছাড়া বাংলা ভাষা অসমাপ্ত। বাংলা ভাষার যদি চিহ্ন ও অলংকার তাঁর হাতেই প্রকাশ পায়। শিশু শিক্ষার জন্য তাঁর সৃষ্টি 'বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ', এবং বর্ণ পরিচয় 'দ্বিতীয় ভাগ' হল যুগান্তকারী অবদান।

সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর তৎকালীন পুরুষ শাসিত সমাজে নারীজাতির উপর অমানবিক অবমাননা বন্ধ করার জন্য আন্দোলন করে আইন পাশের মাধ্যমে সমাজে বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছিলেন। চালু করেছিলেন বিধবা বিবাহ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিজের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়েছিলেন এক বিধবা নারীর সঙ্গে। তিনি বহুবিবাহ নিবারণের জন্যও আন্দোলন করেছিলেন। ফলশ্রুতি হিসেবে 1955 খ্রিস্টাব্দে হিন্দু বিবাহ আইন পাশ হয় এবং বহুবিবাহ বন্ধ হয়।

সমাজে বিভিন্ন কুপ্রথার মূলে রয়েছে শিক্ষার অভাব তা বিদ্যাসাগর মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি বুঝেছিলেন, যথাযথ শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে বিশেষ করে নারীদের সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। তিনিই প্রথম বাংলায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যাসাগরের সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা এবং বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি যাতে সহজে ও দ্রুত শিক্ষা সম্প্রসারণ ঘটানো যায়, তাঁর জন্য বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্য বই, যেমন বেতাল, পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস ইত্যাদি রচনা আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে।

1.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতা-পিতার নাম করুন। তিনি কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মাতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ কিছু ঘটনা উল্লেখ করুন।
2. বিদ্যাসাগরের শিক্ষাগত পারদর্শিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবৃত করুন।
3. ঈশ্বরচন্দ্র কিভাবে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেছিলেন?
4. বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং বহুবিবাহ নিবারণ সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার মূলক ভূমিকা আলোচনা করুন।

5. শিশুশিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা করুন।

6. নারীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

7. সাহিত্য ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

1.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- ড. নন্দিনী জানা, 2023. বিদ্যাসাগর ও বহুবিবাহ। nariswattwo.com, Retrieved on 18.02.2024
- উইকিপিডিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, bn.m.wikipedia.org Retrieved on 12.02.2024
- অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 2023. পিতা মাতা ও তাঁদের প্রথম সন্তান, https://bhalobhasa.com/remembering.ishwar.chandra.vidyasagar, Retrieved on 14.02.2024
- তুলি কলম, 1987, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, http://onushilon.org, Retrieved on 14.02.2024
- Manik Mukhopadhyay (Edition on chief) 1993. The Golden Book of Vidyasagar (A Commemorative Volume). All Bengal Vidyasagar Death Centenary Committee. Pages 1–543.
- সমাজ সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান। www.edutiips.com. Retrieved on 17.02.2024
- সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান। https://history.banglarsiksha.com, Retrieved on 17.02.2024
- বাল্যবিবাহের দোষ বিশ্লেষণী পাঠ। http://idr.ans.ac.in.Retrieved on 18.02.2024

একক 2 ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore)

গঠন

2.1 উদ্দেশ্য **(Objectives)**

2.2 ভূমিকা **(Introduction)**

2.3 রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি **(Rabindranath's Family Life, Education and Receiving Noble Prize)**

2.3.1 পারিবারিক জীবন **(Family Life)**

2.3.2 শিক্ষা **(Education)**

2.3.3 নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি **(Receiving Noble Prize)**

2.4 রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি **(Educational philosophy, Aims of Education, Curriculum and Teaching Methods of Rabindranath)**

2.4.1 রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন **(Educational Philosophy of Rabindranath)**

2.4.2 রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার লক্ষ্য **(Aims of Education of Rabindranath)**

2.4.3 রবীন্দ্রনাথের পাঠক্রম **(Curriculum of Rabindranath)**

2.4.3 রবীন্দ্রনাথের শিক্ষণ পদ্ধতি **(Teaching Methods of Rabindranath)**

2.5 রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক শিক্ষা ও শান্তিনিকতনের শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য **(Practical Education of Rabindranath and Characteristics of Shantiniketan Education System)**

2.5.1 রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক শিক্ষা **(Practical Education of Rabindranath)**

2.5.2 শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য **(Characteristics of Shantiniketan Education System)**

2.6 সারাংশ **(Summary)**

2.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

2.8 গ্রন্থপুঞ্জ **(Bibliography)**

2.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতা-পিতার নাম, জন্মের স্থান ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রবীন্দ্রনাঠ ঠাকুরের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতবাদ জানতে পারবেন।
- পাঠক্রম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতবাদ জানতে পারবেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহারিক শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

2.2 ভূমিকা (Introduction)

উনিশ শতকের অন্তিম লগ্নে যে মহামানব জ্ঞানের আলোর দীপ্তিকে সাহিত্যে প্রয়োগ করলেন, তিনি হলেন আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান জ্যোতিষ্ক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

1861 খ্রিস্টাব্দের 8 মে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর বিদ্যালয় ছিল প্রধানত গৃহপরিবেশ। তবুও তাঁকে কিছু সময়ের জন্য বিদ্যালয়ে যেতে হয়েছিল। সেখানে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়, তা অত্যন্ত নেতিবাচক যা সারাজীবন তিনি ভোলেন নি, আর যার প্রতিক্রিয়ার ফসল হল শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'গীতাঞ্জলি' নামক গ্রন্থটি নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয় এবং 1913 খ্রিস্টাব্দে তিনি এশিয়ার প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রকৃতি প্রেমী দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সার্থক অভিযোজন করা। তাছাড়া তিনি শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার পাঠক্রম হবে কর্মকেন্দ্রিক ও বাস্তব জীবনের সঙ্গো সম্পর্ক যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষক হবেন সহানুভূতিশীল এবং

নমনীয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে মর্যাদা সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা চিন্তার অন্যতম ব্যবহারিক বা বাস্তবায়িত দিক হল 1901 খ্রিস্টাব্দের 22 ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই আশ্রমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 17 বছর পর 1918 খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে "বিশ্বভারতী" বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

2.3 রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি (Rabindranath's Family Life, Education and Receiving Noble Prize)

2.3.1 রবীন্দ্রনাথের পারিবাকি জীবন (Rabindranath's Family Life)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1861 খ্রিস্টাব্দের 7 মে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মগুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (1817–1905) এবং মাতা ছিলেন সারদাসুন্দরী দেবী (1826–1875)। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মাতা-পিতার চর্তুদশ ও কনিষ্ঠতম সন্তান।

1875 খ্রিস্টাব্দে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। এরপর তিনি কয়েক মাসের জন্য পিতার সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বের হন। প্রথমে তাঁরা যান শান্তিনিকেতনে, পরে পাঞ্জাবের অমৃতসরে কিছুদিন কাটিয়ে শিখদের উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেখান থেকে তাঁরা যান পাঞ্জাবের 'ডালহৌসি' শৈলশহরের নিকট বক্রোটায়।

1883 খ্রিস্টাব্দের 9 ডিসেম্বর ঠাকুরবাড়ীর অধস্তন কর্মচারী বেণীমাধব রায় চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহিত জীবনে ভবতারিণীর নামকরণ হয়েছিল মৃণালিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর পাঁচ সন্তান ছিলেন—মাধুরীলতা (1886–1918), রথীন্দ্রনাথ (1888–1961), রেণুকা (1891–1903), মীরা (1894–1969) এবং সমীন্দ্রনাথ (1896–1907)। এঁদের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই রেণুকা ও সমীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে।

1891 খ্রিস্টাব্দে থেকে 1901 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পিতার নির্দেশে অধুনা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জমিদারী তদারকির জন্য কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কুটিবাড়িতে সপরিবারে কাটান। 1901 খ্রিস্টাব্দে তিনি সপরিবারে চলে আসেন বীরভূম জেলার বোলপুরের শান্তিনিকেতনে। এখানে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 1888 খ্রিস্টাব্দে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 1902 খ্রিস্টাব্দের 23 সেপ্টেম্বর মাত্র 30 বছর বয়সে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। 1905 খ্রিস্টাব্দের 19 জানুয়ারী পিতা দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে।

1877 খ্রিস্টাব্দ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গল্প, কবিতা, গান, কাব্যগ্রন্থ, নাটক প্রভৃতি

বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। 1913 খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি এশিয়ার প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। 1912 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট হুড' উপাধি দেয়। পরে 1919 খ্রিস্টাব্দে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট হুড' উপাধি ত্যাগ করেন।

জীবনের শেষ চার বছর ছিল তাঁর ধারাবাহিক অসুস্থতার সময়। 1940 খ্রিস্টাব্দে অসুস্থ হওয়ার পর আর তিনি সেরে উঠতে পারেন নি। দীর্ঘ রোগভোগের পর 1941 খ্রিস্টাব্দে 7 আগস্ট জোড়াসাঁকোর বাসভবনেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

2.3.2 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা (Education of Rabindranath Tagore)

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আরম্ভ হয় দাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল অ্যাকাডেমি এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে কিছুদিন ধরে পড়াশুনা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষায় অনাগ্রহী হওয়ার বাড়িতেই ভবানী শংকর ভট্টাচার্য নামক গৃহশিক্ষক রেখে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অথবা বোলপুর ও পানিহাটির বাগানবাড়িতে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেশি পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে যখন দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তখন পাঞ্জাবের ডালহৌসি শৈলশহরের নিকট বক্রোটা বাংলোয় বসে তিনি পিতার কাছে সমস্কৃত ব্যাকরণ, ইংরেজি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পাঠ নিতে শুরু করেন। হিমশীতল অতি প্রত্যুষে উঠে সংস্কৃত পড়তে বসতেন তিনি।

1878 খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে যান। সেখানে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে ভর্তি হন তিনি। কিন্তু সাহিত্য চর্চার আকর্ষণে অন্য কোন পড়াশুনা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। প্রায় দেড় বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে কোনো ডিগ্রি না নিয়ে এবং ব্যারিস্টারি পড়া শুরু না করেই 1880 খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তবে তাঁর বিলেতে থাকার সময় ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছিলেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাটকে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

2.3.3 নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি (Receiving Nobel Prize)

'গীতাঞ্জলি' হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতে মোট 157টি গীতিকবিতা সংকলিত হয়েছে। 1910 খ্রিস্টাব্দের 5 সেপ্টেম্বর কলকাতার ইন্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস থেকে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 1912 খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতাগুচ্ছ সহজ ইংরেজিতে অনুবাদ শুরু করেন। তিনি বাংলা গীতাঞ্জলি থেকে 53টি এবং বাকি 50টি কবিতা অন্যান্য 8টি কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচন করে ইংরেজিতে মোট 103টি কবিতার সংকলনের একটি পাণ্ডুলিপি

তৈরী করেন এবং এই গ্রন্থটির নাম দেন "গীতাঞ্জলি : সং অফারিংস" (GITANJALI : SONG OFFERINGS)। গীতিমাল্য থেকে 16টি, নৈবেদ্য থেকে 16টি, খেয়া থেকে 11টি, শিশু থেকে 3টি, কল্পনা থেকে 1টি, চৈতালী থেকে 1টি, স্মরণ থেকে 1টি এবং অচলায়তন থেকে 1টি "গীতাঞ্জলি : সং অফারিংস"-এ স্থান পেয়েছে। এই পাণ্ডুলিপি সঙ্গো করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1912 খ্রিস্টাব্দের 27 মে বোম্বাই বন্দর থেকে বিলেত যাত্রা করেন এবং লন্ডনে পৌঁছান 16 জুন। ঐ সময়ে উইলিয়াম রোটেনস্টাইনের সঙ্গো রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি রোটেনস্টাইনকে পাণ্ডুলিপিটি দেন। রোটেনস্টাইন পাণ্ডুলিপিটি টাইপ করিয়ে কবি ইয়েটস সহ আরও কয়েকজন কাব্যযোদ্ধাকে দেন। 1912 খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে লন্ডনে ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গীতাঞ্জলি : সং অফারিংস-এর ভূমিকা লেখেন স্বয়ং কবি ইয়েটস (W. B. Yeats)। এই ভূমিকাটি ছিল যথেষ্ট আন্তরিক ও প্রশস্তিমূলক। পরে 1913 খ্রিস্টাব্দে ম্যাকমিলান কোম্পানী এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণ একযোগে লন্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশ করে। 1913 খ্রিস্টাব্দের 10 নভেম্বর "গীতাঞ্জলি : সং অফারিংস"-এর জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

2.4 রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি (Educational philosophy, Aims of Education, Curriculum and Teaching Methods of Rabindranath)

2.4.1 রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy of Rabindranath)

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন তাঁর জীবন দর্শনের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষার কর্মকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে তাঁর জীবনদর্শনকে প্রথমেই উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

A. **উপনিষদের প্রতি আস্থা (Hope in the Upanishads) :** রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যবাহী উপনিষদের প্রবক্তা। উপনিষদের এই তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ আস্থা স্থাপন করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা এই সামগ্রিকতার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল।

B. **বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (Unity in diversity) :** রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—বহুর মধ্যে ঐকতান সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছিলেন। অন্তর দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বা এক ব্রহ্ম বা পরম অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় একথা বিশ্বাস করতেন।

C. **মানবতাবাদ (Humanism) :** রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে মানবতাবাদ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। তিনি ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু জাত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষকে সমান দেখতেন।

তাই তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃতিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব ও বিশ্বজনীনতার ভিত্তি স্থান পেয়েছে। এটাই তাঁর জীবনদর্শন।

D. **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individuality) :** রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন হল ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা বা মুক্তি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের বিশ্বাস থেকে রবীন্দ্রনাথের মনে এসেছে মনোবিজ্ঞানভিত্তিকতা, বিশ্বজননীনতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য।

E. **প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় (Integration of Eastern and Western) :** তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রাচ্য শিক্ষার উন্নতি ঘটাতে হলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন। তাই তিনি তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

F. **প্রকৃতিবাদ (Naturalism) :** রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন আর জীবনদর্শনের কেন্দ্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রকৃতি অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন আত্মীয়তা আছে তেমনি ব্যক্তির সঙ্গে সকল মানুষের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। এজন্য রবীন্দ্রনাথ শিশুকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন। প্রকৃতিই শিশুর দেহ-মনে জীবনসম্পন্দন সঞ্চার করতে পারে। এই প্রকৃতিই শিশুর সঙ্গে বিশ্বমানবের নিবিড় সম্পর্ককে আরও নিবিড়তর করে তুলতে পারে।

G. **সৌন্দর্যানুভূতি (Aesthetic) :** রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পুজারী। এই সৌন্দর্যানুভূতির মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে নানা কল্পনাশক্তি জাগ্রত হয়। তাই তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রবাহমান সৌন্দর্যের আনন্দধারার সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটাতে চেয়েছেন।

H. **শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশ (Self-expression of learner) :** রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে এবং শিক্ষার্থী সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী হবে।

I. **শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ (Holistic Development) :** শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য তিনি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন—গান, নাচ, নাটক, নানা গ্রামীণ উৎসব ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা এসকলের সংস্পর্শে এসে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের সার্বিক বিকাশ ঘটানোতে সহায়তা করা সম্ভব।

J. **সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষা (Activity centric education) :** রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদর্শনে শিশুর নেক্রিয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশুরা যেমন খেলার মধ্য দিয়ে সক্রিয়তার প্রকাশ করে তেমনি বয়স্করা কর্মের মাধ্যমে সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় খেলা এবং কাজ উভয়কে স্থান দিয়েছেন। তিনি শ্রীনিকেতন-এর শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মভিত্তিকতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

2.4.2 রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education of Rabindranath)

তিনি সমসাময়িক গতানুগতিক শিক্ষাকে বিশেষভাবে সমালোচনা করেছেন। কারণ তার মধ্যে আমাদের দেশের রীতি-নীতি, আদর্শ, কোনো কিছুকে স্থান দেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষ চিরদিনই এইসব নৈতিক গুণাবলীর ওপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যে সকল লক্ষ্যের কথা বলেছেন সেগুলি হল—

1. **ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন :** রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন।

2. **ধর্মীয় ভাব জাগ্রত করা :** শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয়ভাব জাগ্রত করা, যাতে সে পরম সত্ত্বাকে উপলব্ধি করতে পারে।

3. **নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশ :** ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণগুলির বিকাশ সাধন করা।

4. **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জাগ্রত করা :** রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য হল, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করা।

5. **সামাজিক বিকাশসাধন :** সামাজিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে স্বার্থকভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

6. **জীবনবিকাশের সহায়তা :** রবীন্দ্রনাথ তার শিক্ষার লক্ষ্যে জীবন বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার্থী যেসব গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তার সার্বিক বিকাশ ঘটানোই হল অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থী প্রকৃতির সংস্পর্শে এলে সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবে তার জীবনবিকাশ ঘটে থাকে।

7. **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি :** শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগরিত করতে সহায়তা করা এবং যার সাহায্যে শিক্ষার্থী বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনে চেষ্টা করবে।

8. **ধর্মীয় মনোভাব :** রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় মনোভাব জাগ্রত করে তোলা অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায় আধ্যাত্মিক শিক্ষার সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। এই আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয়বোধ জাগরিত হবে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

9. **সামাজিক গুণাবলির বিকাশ :** শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন, একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক কর্মসূচি, সমাজসেবামূলক কাজ, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণ প্রভৃতি শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন।

10. **প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক :** তিনি তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটাতে

চেয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর শারীরিক বিকাশ সুগঠিত হবে এবং উন্নত মানসিকতার অধিকারী হয়ে উঠবে।

2.4.3 রবীন্দ্রনাথের পাঠক্রম (Curriculum of Rabindranath)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শের ওপর ভিত্তি করে পাঠক্রম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তিনি পাঠক্রমের মধ্যে এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যার মধ্য দিয়ে মানব সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করা সম্ভব। পদ্ধতিগুলি হল :

(i) ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, অঙ্কন প্রভৃতি।

(ii) তাঁর মতে, মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম। তিনি বলেছেন—'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম'।

(iii) শিক্ষার্থী যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে তার জন্য তিনি 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(iv) বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি। তাই পাঠক্রমে তিনি বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(v) পাঠক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থী যাতে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তার ব্যবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথ পাঠক্রমের মধ্যে শিল্পকলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(vi) তিনি পাঠক্রমে পল্লিউন্নয়নমূলক কাজকে স্থান দিয়েছেন এছাড়া উৎপাদনভিত্তিক শিক্ষা, কর্ম-অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয়কে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

2.4.4 রবীন্দ্রনাথের শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Methods of Rabindranath)

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতিকে সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পাঠদানের ক্ষেত্রে ভ্রমণ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, গল্পের ছলে পাঠ দান এবং প্রত্যক্ষ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেন। তিনি বলেছেন, যে-কোনো আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতিই তিনটি মৌলিক নীতি অনুসরণ করবে। এই নীতিগুলি নিম্নরূপ,—

(1) স্বাধীনতা : স্বাধীনতা বলতে রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাচারের অধিকারকে বোঝাননি। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে কাজ করার। তাঁর বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের যেমন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলেছেন, তেমনি দেহ-মনের বিকাশের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন।

(2) সৃজনাত্মক আত্মপ্রকাশের সুযোগ : তাঁর মতে, স্বাধীনভাব থেকেই সৃজন প্রতিভার বিকাশ পাবে, এবং তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী নিজেকে বিকশিত করবে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিতে গান্ধীজীর মতো সৃজনাত্মক কাজের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

(3) **প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সংযোগ :** সবশেষে তিনি প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। শিশুকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা দিতে হবে এবং শিক্ষার মাধ্যমে যাতে সমাজ পরিবেশের সঙ্গে আত্মিক সূত্র স্থাপন হয় তার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষার মাধ্যমে যদি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ না ঘটে সে শিক্ষার কোনো মূল্য নেই।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক (Relation between Teacher and Learner) : রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষক হবেন প্রাণবন্ত মানুষ। শিশুর মতো সারল্য নিয়ে তিনি শিক্ষার্থীর মনোরাজ্যে বিচরণ করবেন। শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। এককথায় একটি আনন্দময় পরিবেশে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার কাজ এগিয়ে চলবে।

শৃঙ্খলা (Discipline) : রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দিলে তারা আপনা থেকে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়বে। তবে একথাও ঠিক স্বাধীনতা কখনও স্বেচ্ছাচারে পরিণত হবে না।

2.5 রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক শিক্ষা ও শান্তিনিকতনের শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Practical Education of Rabindranath and Characteristics of Shantiniketan Education System)

2.5.1 রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক শিক্ষা (Practical Education of Rabindranath)

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিবাদে বিশ্বাস করলেও তিনি মূলত ছিলেন ভাববাদী। তাই তিনি স্বাভাবিকভাবে ভাবরাজ্যেই বাস করতেন, কিন্তু আশ্চর্যের কথা তাঁর চিন্তা বাস্তব জগতকে ছাড়িয়ে যায়নি। শ্রীনিকেতন হল তাঁর বাস্তব শিক্ষাচিন্তার মূর্ত প্রতীক। এখানে গতানুগতিক বিষয়ের সাথে হাতের কাজ, কুটিরশিল্প, গ্রামোন্নয়নমূলক কাজ স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে ব্যবহারিক দিকগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তাঁর শিক্ষা ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তা হল—

(i) **কর্মমুখী শিক্ষা :** রবীন্দ্রনাথ বিশেষত কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ধরনের শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষার্থীরা কর্মজগতে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে। তেমনি বৈচিত্র্যময় কর্মজগতের সংস্পর্শে এসে তারা নিজেদের যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের প্রতি মর্যাদা বোধ গড়ে উঠবে।

(ii) **গ্রামোন্নয়ন :** গ্রামোন্নয়ন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিকল্পনায় একটি বিশেষ স্থান পেয়েছে। শিক্ষার সুফল যাতে সরাসরিভাবে গ্রামবাসীরা পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই তিনি শান্তিনিকেতনের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত গ্রামোন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করেছিলেন।

(iii) অর্থনৈতিক উন্নয়ন : তিনি মনে করতেন শিক্ষায় শুধু বৌদ্ধিক চর্চারই স্থান থাকবে না, তার সঙ্গো গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও জাগিয়ে দিতে হবে। গ্রাম সর্বত্র এই ভারতবর্ষের গ্রামগুলির উন্নতিসাধন করতে না পারলে উন্নয়নের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই জন্য তার শিক্ষা পরিকল্পনায় গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।

2.5.2 শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Shantiniketan Education System)

ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গো খাপ খাইয়ে শিক্ষাকে সাধারণ এবং ব্যবহারিক দিক থেকে প্রয়োগ উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য তিনি বোলপুরে শান্তিনিকেতনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে বাস্তবে রূপায়িত করার অনন্য নিদর্শন হল শান্তিনিকেতন। আজও ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে শান্তিনিকেতন স্বমহিমায় বিরাজমান। শান্তিনিকেতনে একদিকে যেমন দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল অপরদিকে এখানে বিভিন্নভাবে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হত। শুধু তাই নয়, দেশীয় শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে শিক্ষার্থীরা যাতে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে সে ব্যাপারে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

(1) স্বাধীনভাবে শিক্ষাগ্রহণ : রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে অর্থাৎ নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও কাজের মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

(2) প্রকৃতির মাঝে শিক্ষাদান : শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির মাঝে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের কৃত্রিম শিক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষা দান করা সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতনে তাই তিনি মুক্ত আকাশের নীচে গাছের তলায় পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন।

(3) সহপাঠ্যক্রমিক ও সৃজনমূলক কাজে অংশগ্রহণ : শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজ এবং সৃজনমূলক কাজে অংশগ্রহণের বিশেষ সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে যোগদানের মাধ্যমে তাদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, সৃজনশীল ক্ষমতা প্রভৃতির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা রয়েছে।

(4) শিক্ষার্থীরা চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা : রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন বা চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষালাভের কথা বলেছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকে নির্দিষ্ট কোনো সময় তালিকা অনুযায়ী দেওয়ার কথা বলেননি।

(5) **শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক :** এখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সঙ্গো বন্ধুর মতো মিশে শিক্ষাদান করতে সাহায্য করেন। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়। এই মধুর সম্পর্কই শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী করে তোলে।

(6) **বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা :** শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য কোনো জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং আর্থিক বৈষম্য দেখা হয় না। এখানে শিক্ষার্থীরা একই খাওয়া-দাওয়া, খেলাধূলা ও পড়াশোনা হয়ে থাকে।

(7) **কৃষ্টি ও সংস্কৃতি শিক্ষার ভিত্তি :** ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার ওপর উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করে যাতে শিশুরা ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গো পরিচিত হয়ে নিজে গর্ব অনুভব করে, সেই প্রচেষ্টা দেখা যায়।

(8) **মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান :** রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গো তুলনা করেছেন। তাই তিনি শান্তিনিকেতনে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন। যথার্থ শিক্ষাদান মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব।

(9) **হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান :** রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন। এখানে নানারকম কুটীরশিল্প, তাঁতশিল্প, কৃষিকাজ, চামড়ার কাজ, মাটির কাজ, উদ্যানের পরিচর্যা প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হয়।

(10) **সমাজসেবা ও পল্লি উন্নয়ন :** শান্তিনিকেতনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সমাজসেবা ও পল্লি উন্নয়ন। সমাজসেবার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যেমন পল্লি উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় তেমনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গো সংযোগ স্থাপন করা যায়। সমাজের প্রতিটি মানুষের এই দুটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম। শান্তিনিকেতনের আবশ্যিক কর্ম হল একই ধর্মের অনুশীলন।

2.6 সারাংশ (Summary)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাগত দর্শন তাঁর নিজের জীবন দ্বারা প্রভাবিত। যদিও ঠাকুর শিক্ষা বিষয়ে পশ্চিমী চিন্তাবিদদের ধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন তবে তিনি তার নিজস্ব ধারণাগুলি প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলেন যা শিশুকে শ্রেণিকক্ষ বা বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। তার মতে, প্রকৃতিই শিশুর জন্য শ্রেষ্ঠ পাঠ্যক্রম ও শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাগত নীতি বিশ্লেষণ করতে গেলে বলা যায় তিনি প্রকৃতিবাদের পাশাপাশি বাস্তববাদেরও অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তার শিক্ষাগত দর্শন অত্যন্ত

প্রাকৃতিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। তিনি স্ব-শিক্ষা বিশ্বাস করেন না আত্ম-উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। এই স্বাধীনতা হবে বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত, হৃদয়, জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনার। তিনি কাজ করার মাধ্যমে পরিপূর্ণতায় বিশ্বাস করেন। তাই শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং ডিগ্রি অর্জন শিক্ষার লক্ষ্য নয়। তিনি শিক্ষার ধারণায় 'সর্বজনীনতা' ধারণাটি সংজ্ঞায়িত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রকৃত শিক্ষা এমন একটি বিষয় যা তার ব্যক্তিগত আত্মার বাইরে গিয়ে চিন্তা করে এবং কাজ করে এবং বিশ্বজনীন আত্মাকে উপলব্ধি করার জন্য বিশ্বাস যোগায়। তার শিক্ষামূলক দর্শনের নীতিগুলি নিম্নরূপ :

1. আত্ম-উপলব্ধি শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।
2. তিনি প্রাচীন বৈদান্তিক শিক্ষাকে সংশ্লেষ করে শিক্ষার লক্ষ্য প্রণয়ন করেন আধুনিক পশ্চিমী বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সঙ্গো।
3. সৃজনশীল বিকাশের জন্য শিশুকে সুযোগ দিতে হবে।
4. তিনি শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় উন্নয়ন সহ মানব শক্তির অবিচ্ছেদ্য বিকাশকে সমর্থন করেছিলেন।
5. তিনি যে পরিবেশে বসবাস করেন তার সঙ্গো সামঞ্জস্য বজায় রাখতে এবং তার পরিবেশের সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে সমর্থন করেন। বাচ্চাদের বইয়ের মাধ্যমে জ্ঞান নিতে বাধ্য করা উচিত নয়।
6. শিক্ষার লক্ষ্য শিশুকে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং জীবিকা নির্বাহ করা।

2.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
2. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
3. রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
4. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে লিখুন।
5. রবীন্দ্রনাথের মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্যগুলি লিখুন।
6. রবীন্দ্রনাথের পাঠক্রম সংক্ষেপে কি পরামর্শ দিয়েছেন?
7. রবীন্দ্রনাথের মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত?

8. রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

9. শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

2.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- Purkait, B.R. (1995), Great Educators and their Philosophies, New Central Book Agency (P) Ltd., Kolkata.
- Mohanty, J. (1994). Indian Education in the Emerging Society, New Delhi, Sterhing Publishers Pvt. Ltd.
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উইকিপিডিয়া, https://bn.m.wikipedia.org Retrieved on 27.02.2024
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী (2023), https://swapno.org Retrieved on 27.02.2024
- রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ (2017), https://www.banglanews24.com Retrierved on 28.02.2024
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা চিন্তা ও শান্তিনিকেতন ভাবনা সংক্ষিপ্ত পরিচয় (2023), https://endtips.com.rabindranath, Retrieved on 28.02.2024
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শন (2023), https://rashtriyashiksha.com. Retrieved on 28.02.2024
- Dutta, M (2023), রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা। Pratidhwani the Echo, volume-XI, Issue-III, pp 9-14, https://www.theco.in, Retrieved on 28.02.2024

একক 3 ❑ স্বামী বিবেকানন্দ (Swami Vivekananda)

গঠন

3.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

3.2 ভূমিকা (Introduction)

3.3 পারিবারিক জীবন এবং শিক্ষা (Family life and Education)

3.3.1 পারিবারিক জীবন (Family Life)

3.3.2 শিক্ষা (Education)

3.4 সন্ন্যাস জীবন, শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা ও পরিব্রাজক বিবেকানন্দ (Ascetic Life, Speech of Chicago Congress of Religions and Traveller Vivekananda)

3.4.1 সন্ন্যাস জীবন (Ascetic Life)

3.4.2 শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা (Speech of Chicago Congress of Religions)

3.4.3 পরিব্রাজক বিবেকানন্দ (Traveller Vivekananda)

3.5 জীবন দর্শন (Philosophy of Life)

3.5.1 বিশ্বজনীনতা (Universalism)

3.5.2 অধ্যাত্মতত্ত্ব (Spiritualism)

3.5.3 মানবতা (Humanism)

3.6 শিক্ষা দর্শন (Philosophy of Education)

3.6.1 শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education)

3.6.2 পাঠক্রম (Curriculam)

3.6.3 শিক্ষণ পদ্ধতি (Method of Teaching)

3.6.4 নারীশিক্ষা, ভাষাশিক্ষা, শারীর শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, জনশিক্ষা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (Woman Education, Language education, Physical Education, Relegious Education, Mass Education and Abolition of Untouchability)

3.7 সারাংশ (Summary)

3.8 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

3.9 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

3.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অবগত হবেন।
- স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আমেরিকা শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- স্বামী বিবেকানন্দের ভারত ও বিশ্ব পরিক্রমন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দর্শন, যেমন—বিশ্বজনীনতা, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও মানবিকতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষাদর্শন, যেমন—শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, শারীর শিক্ষা, নারীশিক্ষা, জনশিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

3.2 ভূমিকা (Introduction)

স্বামী বিবেকানন্দ একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক ও সর্বোপরি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় স্থাপন এবং হিন্দু ধর্মকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রচার করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বক্তৃতা হল 1893 খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ধর্ম মহাসভায় প্রদত্ত শিকাগো বক্তৃতা।

স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের শিক্ষাসমূহকে তাঁর শিক্ষা দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেন। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, শারীর শিক্ষা, নারীশিক্ষা, জনশিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার উপর তিনি মতবাদ প্রকাশ করেছেন। তাই তিনি একজন মহান শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিগণিত। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, হিন্দু ধর্ম ও অন্যান্য সমস্ত ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন পথে একই লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে

জাতীয়তাবাদী ধারণার অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদী আদর্শকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ প্রভূত অবদান রেখেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের নির্ভীক দেশাত্মবোধ সারা ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, ''বিবেকানন্দ ছিলেন আধুনিক ভারতের স্রষ্টা''। ভারতে তাঁর জন্মদিন 12ই জানুয়ারী জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালিত হয়।

''আত্মনো মোক্ষার্থম্ জগদ্ধিতায় চ''—অর্থাৎ নিজের মোক্ষলাভ এবং জগতের মঙ্গালের জন্য—এই নীতিতে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

3.3 পারিবারিক জীবন এবং শিক্ষা (Family Life and Education)

3.3.1 পারিবারিক জীবন (Family life)

1863 খ্রিস্টাব্দে 12ই জানুয়ারী উত্তর কলকাতার সিমলাপাড়ার বিখ্যাত দত্ত পরিবারে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। পেশায় পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন একজন আইনজীবি। একদিন স্বামী বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবী স্বপ্নে দেখেন ''ভগবান শিব বলছেন যে তিনি তাঁর ছেলে রূপে জন্মগ্রহণ করবেন।'' একথা শুনে ভুবনেশ্বরী দেবী খুবই খুশী হন। তাই তিনি ছেলের নাম 'বীরেশ্বর' (ভগবান শিবের আরেক নাম) রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ীর অন্যরা তার নাম রাখলেন 'নরেন্দ্রনাথ'। সবাই ভালবেসে তাঁকে 'নরেন' বলে ডাকত। আবার কেউ কেউ তাঁকে বলতেন 'বিলে'।

নরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই আধ্যাতিকতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং শিব, রাম, সীতা এবং মহাবীর হনুমানের মতো দেব-দেবীর মূর্তির সামনে ধ্যান করতেন। তিনি বিচরণ তপস্বী এবং সন্ন্যাসীদের দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ শৈশবে দুষ্টু ও অস্থির ছিলেন এবং তাঁর পিতা-মাতা প্রায়ই তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসুবিধায় পড়তেন। তাঁর মা বলতেন, ''আমি শিবের কাছে একটি পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেছিলোম, কিন্তু তিনি আমাকে একটি ভূত পাঠিয়েছেন।'' মাঝে মধ্যে খেলার ছলে নরেন্দ্রনাথ 'সন্ন্যাসী' সাজতেন এবং মাকে বলতেন, ''দেখ মা, আমি কেমন সন্ন্যাসী সেজেছি''। তাই দেখে মা চিন্তিত হয়ে বলতেন, ''নরেন বড় হয়ে ঠাকুরদাদার মত সন্ন্যাসী হয়ে সংসার না ত্যাগ করে''।

স্বামী বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলকাতা হাইকোর্টের একজন অ্যাটর্নি ছিলেন এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ গৃহিণী। নরেন্দ্রনাথের পিতামহ দুর্গাচরণ দত্ত ছিলেন একজন সংস্কৃত ও ফার্সি পণ্ডিত, যিনি 25 বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। নরেন্দ্রনাথের পিতার প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী মনোভাব এবং তাঁর মায়ের ধর্মীয় আচার আচরণ তাঁর চিন্তাভাবনা এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করেছিল।

নরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতামাতার দশ সন্তানের মধ্যে পঞ্চম ছিলেন, যাদের মধ্যে তিন জন শৈশবেই মারা গিয়েছিল। প্রথম সন্তান ছিল একটি পুত্র যে আট মাস বয়সেই মারা যায়। তারপর একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয় যে আড়াই বছর বয়সেই মারা যায়। তৃতীয় সন্তানের জন্ম হয় 1858 খ্রিস্টাব্দে এবং তার নাম ছিল 'হরমণী'। দত্ত পরিবারের চতুর্থ সন্তান 'স্বর্ণময়ী' জন্মগ্রহণ করেন 1860 খ্রিস্টাব্দে। অতপর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী কাশী বিশ্বনাথ শিবের কাছে একটি পুত্র সন্তানের জন্য অনেক প্রার্থনার পর 1863 খ্রিস্টাব্দে 12 জানুয়ারিতে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়, যিনি পরবর্তীকালে বিশ্বে একজন মহান ব্যক্তি রূপে পরিগণিত হন।

নরেন্দ্রনাথের পর আরেক কন্যা সন্তানের জন্ম হয় যে ছয় বছর বয়সেই মারা যায়। তারপর সপ্তম সন্তান 'কিরণবালা' জন্মগ্রহণ করেন 1865 খ্রিস্টাব্দে এবং অষ্টম সন্তান 'জোগেন্দ্রবালা' জন্মগ্রহণ করেন 1867 খ্রিস্টাব্দে। নবম সন্তান 'মহেন্দ্রনাথ' হলো পুত্রসন্তান, যিনি 1869 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সর্বকনিষ্ঠ ও দশম সন্তান হলো 'ভূপেন্দ্রনাথ' যিনি 1880 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাইয়েরা তাদের নিজেদের চেষ্টায় তাদের জীবনের ঘটনাগুলিকে সুপরিচিত করে তুলেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ অনেক বিষয়ে পণ্ডিত এবং একজন জনহিতৈষী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের দাতব্য কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ ভাই ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন 'যুগান্তর'-এর সাথে যুক্ত একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী, পেশায় একজন নৃতত্ত্ববিদ এবং লেখক। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের বোনেদের জীবন উল্লেখযোগ্য নয়। শিশু অবস্থাতেই তিন বোনের মৃত্যু স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল।

3.3.2 বিবেকানন্দের শিক্ষা (Education of Vivekananda)

শিশু অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মায়ের কাছেই বাংলা ও ইংরেজি শিখতেন। ছয় বছর বয়সে তাঁকে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। একদিন তিনি স্কুলে বন্ধুদের কাছে শেখা কিছু অশ্লীল শব্দ বাড়ীতে বলেছিলেন। তখন তাঁকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে বাড়ীর উপসনালয়ে একজন প্রাইভেট টিউটরের কাছে লেখাপড়া করার জন্য দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তির বিকাশ ঘটে।

আট বছর বয়সে 1871 খ্রিস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ কলকাতার মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্তি হন। 1879 খ্রিস্টাব্দে মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করে নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় ভুগে ডিসকলেজিয়েট হয়ে যাওয়ায় এই কলেজ থেকে ছেড়ে তাকে ভর্তি হতে হয় জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইন্সটিউশনে যার বর্তমান নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ। সেখান থেকে 1881 খ্রিস্টাব্দে এফ.এ. এবং 1884 খ্রিস্টাব্দে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে বি.এ. পাশ করেন।

স্কুল কলেজের পরীক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিলেও নরেন্দ্রনাথ প্রবল বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং পড়াশুনার পরিধিও ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি হার্বার্ট স্পেন্সারের একটি মতবাদের

সমালোচনা করে তাকে চিঠি লিখেছিলেন। স্পেন্সার নরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট প্রশংসা করে লিখেছিলেন যে বই এর পরবর্তী সংস্করণে তিনি সেই সমালোচনা অনুযায়ী কিছু পরিবর্তন করবেন। কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি বিবেকানন্দের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "নরেন্দ্রনাথ সত্যিই একজন জিনিয়াস। আমি বহু জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু তাঁর মত বুদ্ধি আর বহুমুখী প্রতিভা কোথাও দেখিনি। এমনকি জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দর্শনেরও নয়"। কলেজে পড়ার সময় পাশ্চাত্য দর্শনের সংস্পর্শে এসে নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহবাদী হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবাহ ও সংস্পর্শও তাঁকে প্রভাবিত করে। নরেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভাতে যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীতে পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য। তিনি হিন্দি, উর্দু ও ফার্সি ভাষাতে পারদর্শী ছিলেন।

3.4 সন্ন্যাস জীবন, শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা ও পরিব্রাজক বিবেকানন্দ (Ascetic Life, Speech of Chicago Congress of Religons and Traveller Vivekananda)

3.4.1 স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস জীবন (Ascetic Life of Swami Vivekananda)

যৌবনে নরেন্দ্রনাথ ঘুমিয়ে পড়ার আগে দুটি দর্শন চিন্তা করতেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির—একটি হল একজন পার্থিব পুরুষ যার একজন স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে এবং সম্পদ, বিলাসিতা, খ্যাতি ও সামাজিক অবস্থান ভোগ করছে। অন্যটি হল একজন পরিভ্রমণকারী সন্ন্যাসী যিনি পার্থিব ভোগবিলাস ত্যাগ করে ঈশ্বরের ধ্যানে নিবেদিত। নরেন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে এই দুটি আদর্শের যে কোনটি গ্রহণ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু তিনি অনিবার্যভাবে ত্যাগের জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন, তাই ঈশ্বরকে দেখেছেন এমন একজন মহাপুরুষ দ্বারা নির্দেশিত হওয়ার অপরিহার্য প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তিনি তখন ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" দেবেন্দ্রনাথ লজ্জিত হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "তোমার চোখ যোগীর মত এবং তোমার ধ্যান অনুশীলন করা উচিত"।

নরেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের কথায় হতাশ হয়ে বুঝে ছিলেন যে ঐ শিক্ষক তাঁর আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানে সাহায্য করতে সক্ষম নন্। তারপর তিনি অধ্যাপক হেস্টির কাছ থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শুনেছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর এক আত্মীয় রামচন্দ্র দত্তর কাছ থেকেও শুনেছিলেন। রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রনাথের বিবাহে অনিচ্ছার কথা জানতে পেরে বলেছিলেন, "তুমি যদি সত্যিই আধ্যাত্মিকতা গড়ে তুলতে চাও, তাহলে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে যাও।"

নরেন্দ্রনাথ 1881 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে উত্তর কলকাতায় ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে প্রথমবারের মতো রামকৃষ্ণের সাথে দেখা করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের সুরেলা সঙ্গীতে দর্শকদের বিনোদন

দেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর আন্তরিকতা ও ভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা বললেন। নরেন্দ্রনাথ রাজী হলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, রামকৃষ্ণই তাঁর আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন কিনা। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাতটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রামকৃষ্ণ তাঁকে ভবিষ্যতের দূত হিসেবে চিনতে পারলেন। তাঁর চোখ ছিল চিত্তাকর্ষক। তিনি কয়েকটি গান গেয়েছিলেন যাদের মধ্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যখন গান শেষ হল, শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের হাত ধরে বললেন, ''তুমি এত দেরীতে এসেছ। কত নির্দয় তুমি, আমাকে এতদিন অপেক্ষা করালে''। যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ এই কথাগুলোকে একজন উন্মাদ ব্যক্তির অর্থহীন শব্দবাক্য বলে মনে করেন। আরও হতাশ হয়ে পড়লেন যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ঘর থেকে কিছু মিষ্টি এনে তাঁকে নিজের হাতে খাওয়ালেন এবং আবারও তাঁর কাছ থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসার প্রতিশ্রুতি নিলেন। নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?'' মুহূর্তের মধ্যে শ্রী রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, ''হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি। আমি যেমন তোমাকে দেখছি, আমি তাঁকেও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। ঈশ্বরকে দেখা যায়, একজন তাঁর সাথে কথা বলতে পারে। কিন্তু কে ঈশ্বরের জন্য চিন্তা করে? মানুষ তার স্ত্রী, সন্তান, ধন-সম্পত্তির জন্য অশ্রু ঝরায়, কিন্তু ঈশ্বরের দর্শনের জন্য কে কাঁদে? কেউ যদি ঈশ্বরের জন্য আন্তরিকভাবে কাঁদে, তবে সে ঈশ্বরকে অবশ্যই দেখতে পাবে।'' নরেন্দ্রনাথ অভিভূত হলেন এবং মনে শান্তির অনুভূতি নিয়ে কলকাতার বাড়ীতে ফিরে এলেন।

এরপর নরেন্দ্রনাথ বহুবার দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হয় এবং দরিদ্র নারায়ণ সেবার মাধ্যমে সমাজ তথা ভারতবর্ষের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি উপলবব্ধি করেন যে সংসারে থেকে ইহা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং কয়েকজন প্রায় সমবয়সী বন্ধু নরেন্দ্রনাথের মতই জীবন যাপন করার জন্য 'বরাহনগর মঠ' গঠন করেন। সেখানে একসাথে বারোজন গৃহত্যাগী থাকতেন ও ঈশ্বরের সাধনা করতেন। ১৬ই আগস্ট ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াণ ঘটে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নরেন্দ্রনাথের গুরুভ্রাতা বাবুরামের মা নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের হুগলি জেলার আঁটপুরে আমন্ত্রণ জানান। তাঁরা সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আঁটপুরে যান এবং কিছুদিন সেখানে থাকেন। আঁটপুরেই বড়দিনের পূর্ব সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথ ও আটজন গুরুভ্রাতা আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো করে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। নরেন্দ্রনাথ ''স্বামী বিবিদিষানন্দ'' নাম গ্রহণ করেন। শিকাগো যাওয়ার পথে তিনি ''বিবেকানন্দ'' ছদ্ম নামটি গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ঐ নামটি সর্বাধিক প্রচারিত হয়। এইভাবে মাত্র ২৪ বছর বয়সে বিবেকানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস জীবনে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হল 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা। ১৮৯৭ সালের ১ মে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। রামকৃষ্ণ মিশন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্বাস্থ্য পরিসেবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণকার্য, গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে বিশ্বে প্রায় ২০০টি কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

3.4.2 শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা (Speech of Chicago Congress of Religions)

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগোর প্রথম বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও কোন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। মাদ্রাজের কিছু ধর্মানুরাগী ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহীশূর, রামনাদ ও খেতড়ির মহারাজাদের অর্থানুকূল্যে স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকায় পাঠাবার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন। 1893 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে খেতড়ির মহারাজা প্রাইভেট সেক্রেটারীকে বম্বে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে পাঠান। 1893 খ্রিস্টাব্দের 31 মে স্বামী বিবেকানন্দ বম্বে থেকে পেনিনসুলার (Peninsular) নামক জাহাজে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং কলোম্বো, পিনাঙ, সিঙ্গাপুর হয়ে হংকঙে পৌছান। হংকঙে তিন দিন থেকে সেখান থেকে রওনা দিয়ে জাপানের নাগাসাকি বন্দর হয়ে কোবিতে পৌঁছে জাহাজ ছেড়ে দিলেন এবং স্থলপথে 10 জুলাই 1893-এ ইয়াকোহোমায় পৌঁছান। জাপানে কয়েকদিন থেকে আবার জাহাজে রওনা দিয়ে কানাডা হয়ে বঙ্কুবরে (Vancouver) পৌঁছান। সেখান থেকে 30 জুলাই 1893 খ্রিস্টাব্দে শিকাগো পৌঁছান।

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো শহরে পৌঁছে মূলতঃ দুটি সমস্যায় পড়েন—এক, মহাসভা শুরু হতে তখনো প্রায় দেড় মাস বাকি, এবং দুই, কোনো খ্যাত প্রতিষ্ঠানের প্রশংসাপত্র বা পরিচিতিপত্র ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করবে না, যা তাঁর কাছে ছিল না। এই সময় তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের সংস্পর্শে এলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে হার্ভার্ডে আমন্ত্রণ জানান এবং ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নিকট এক চিঠিতে লিখলেন, "আমাদের সকল অধ্যাপক একত্রে যতটা শিক্ষিত স্বামী বিবেকানন্দ তাদের থেকেও বেশি শিক্ষিত"। রাইট ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে বোঝান। রাইট মনে করেছিলেন, বিশ্বে স্বামী বিবেকানন্দকে একটি পরিচিতি দেবে।"

আমেরিকার শিকাগো শহরে 'আর্ট ইনস্টিটিউটে' (Art Institute of Chicago) 1893 খ্রিস্টাব্দের 11 সেপ্টেম্বর থেকে 17 দিন ব্যাপী প্রথম বিশ্বধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব ধর্মমহাসভায় প্রথম দিন স্বামী বিবেকানন্দ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি ভারত থেকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই "Sisters and Brothers of America" বলে সম্বোধন করেন। তাঁর এই সম্ভাষণে প্রায় সাত হাজার দর্শক-শ্রোতা দুই মিনিটকাল দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে স্বামী বিবেকান্দকে সংবর্ধনা জানান, যা অন্য কারো বক্তৃতায় ঘটেনি এবং তাঁর বক্তৃতা বিশ্বখ্যাত হয়েছিল। তাঁর বক্তৃতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—

"Sisters and Brothers of America !

It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects......."

"I am proud of belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong a nation which has sheltered the presented and the refugees of all religions and all nations of the earth....."

''আমেরিকার বোনেরা ও ভাইয়েরা!

আনপারা আমাদের যে উষ্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ স্বাগত জানিয়েছেন তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইহা আমার হৃদয়কে অবর্ণনীয় আনন্দে পূর্ণ করেছে। আমি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ভিক্ষুদের নামে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, আমি ধর্ম সমূহের জননীর নামে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, এবং সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দুর নামে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।...."

''আমি এমন একটি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে গর্বিত যা বিশ্বকে সহনশীলতা এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা উভয়ই শিক্ষা দিয়েছে। আমরা শুধু বিশ্বজনীন সহীষ্ণুতায় বিশ্বাস করি না, সব ধর্মকেই সত্য বলে মেনে নিই। আমি এমন একটা জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে গর্বিত যারা পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম ও সমস্ত জাতির নির্যাতিত এবং উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়েছে।......"

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় ইহুদীদের ওপর রোমান আক্রমণ এবং ইহুদী মন্দির ধ্বংস হয়ে যাবার পর ভারতে আশ্রয় এবং পারসিক জাতির ভারতে আশ্রয় নেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতের অবদান ও ভারতের মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন।

ধর্মমহাসভার সভাপতি ড. ব্যারেজ বলেন, ''কমলা-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মসমূহের মাতা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং তাঁর শ্রোতাদের উপর সবচাইতে বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করেছেন।" নিউইয়র্ক হেরাল্ড লিখেছে, ''বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে ধর্মসভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। আমেরিকার পত্রিকাসমূহ স্বামী বিবেকানন্দকে ''ধর্মসভার সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব" এবং ''সভার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি" হিসেবে প্রতিবেদন লেখে। সভা 1893 খ্রিস্টাব্দের 27 সেপ্টেম্বর সমাপ্ত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ 11, 15, 19, 20, 26 এবং 27 সেপ্টেম্বর মোট 6 বার বক্তৃতা করেন। সভায় তার সকল বক্তৃতার একটি সাধারণ বিষয়বস্তু ছিল—'সর্বজনীনতা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা'।

3.4.3 পরিব্রাজক বিবেকানন্দ (Traveller Vivekananda)

স্বামী বিবেকানন্দ 1888 খ্রিস্টাব্দে পরিব্রাজক রূপে বরানগর মঠ ত্যাগ করেন। পরিব্রাজক জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গো ছিল একটি কমণ্ডুলু, লাঠি ও তাঁর প্রিয় দুটি গ্রন্থ—'ভাগবদগীতা' ও 'ইশানুসরণ'। পাঁচ বছর ধরে তিনি ভারতের সর্বত্র এবং পরে কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করেন। এই সময় কালে তিনি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গো সুপরিচিত হন। সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি তাঁর সহানুভূতি জন্মায় এবং তিনি জাতির উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় ভিক্ষোপজীবী হয়ে সারা ভারতে পদব্রজেই পর্যটন করেন স্বামী বিবেকানন্দ। কখনো কখনো তাঁর গুণমুগ্ধেরা তাঁকে ট্রেনের টিকিট কেটে দিতেন।

উত্তর ভারত

1888 খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ বারাণসী থেকে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। বারাণসী থেকে তিনি একে একে যান অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন, হথরাস ও ঋষিকেশ। তারপর তিনি বৈদ্যনাথ ও এলাহাবাদ ভ্রমণ করেন। এলাহাবাদ থেকে যান গাজিপুরে। 1888–1890 সময়কালে তাঁর এই ভ্রমণকালে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনি কয়েকবার বরাহনগরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

1890 খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে তিনি পুনরায় পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে দেশভ্রমণে বের হন। মঠে ফেরেন একেবারে পাশ্চাত্য ভ্রমণ সেরে। তিনি নৈনিতাল, আলমোড়া, শ্রীনগর, দেরাদুন, ঋষিকেশ, হরিদ্বার হয়ে হিমালয়ে যান। কথিত আছে, এই সময় এক দিব্যদর্শনে তিনি বহির্জগৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। মিরাটে কিছুদিন তিনি অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে জপধ্যান, প্রার্থনা ও শাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করেন। 1891 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষদিকে তিনি একাকী দিল্লীর পথে অগ্রসর হন।

দিল্লীর ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখার পর তিনি যান জয়পুরে। সেখানে তিনি এক সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে অধ্যয়ন করেন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী। তারপরের গন্তব্য ছিল আজমীর। সেখান থেকে চলে যান মাউন্ট আবুতে। মাউন্ট আবুতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হয় ক্ষেতরির মহারাজা অজিত সিংহের, যিনি পরে বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। অজিত সিংহের আমন্ত্রণে বিবেকানন্দ খেতরিতে আসেন। খেতরিতে আড়াই মাস কাটানোর পর 1891 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে তিনি রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

পশ্চিম ভারত

রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র ভ্রমণ শেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ ভ্রমণ করেন আহমেদাবাদ ও লিম্বদি। আহমেদাবাদে তিনি ইসলামি ও জৈন সংস্কৃতির পাঠ সমাপ্ত করেন। লিম্বদিতে ঠাকোর সাহেব জসওয়ান্ত সিংহের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। যিনি নিজে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেছিলেন। ঠাকোর সাহেবের কাছ থেকেই বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারে যাওয়ার ধারণাটি প্রাপ্ত হন। এরপর তিনি যান জুনাগড়, গিরনার, কচ্ছ, পোরবন্দর, দ্বারকা, পালিতানা ও বরোদা। পোরবন্দরে তিনি পণ্ডিতদের থেকে দর্শন ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করেন।

এরপর স্বামী বিবেকানন্দ যান মহাবালেশ্বর ও পুণেতে। পুণে থেকে 1892 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তিনি যান খাণ্ডোয়া, ইন্দোর ও কাথিয়াওয়াড়ে। কাথিয়াওয়াড়ে তাঁর অনুগামীরা তাঁকে বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদানের অনুরোধ করেন। এরপর তিনি যান মুম্বাইয়ে। 1892 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে তিনি বেলগাঁও যান। সেখানে তিনি সাবডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি যান গোয়ার পঞ্জিম ও মারগাঁওয়েতে। গোয়ার প্রাচীনতম কনভেন্ট কলেজে সংরক্ষিত ধর্মীয়

সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত রচনাবলি থেকে স্বামী বিবেকানন্দ খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে মূল্যবান জ্ঞান অর্জন করেন। সেখান থেকে তিনি রেলপথে প্রথমে ধারওয়াড় এবং পরে মহীশূর (বর্তমান কর্ণাটক) রাজ্যের ব্যাঙ্গালোরে যান।

দক্ষিণ ভারত

স্বামী বিবেকানন্দ মহীশূরের মহারাজার অতিথি হিসেবে রাজপ্রাসাদে অবস্থান করেন। মহারাজা স্বামিজিকে কোচিনের দেওয়ানের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে একটি পত্র এবং একটি রেলওয়ে টিকিট দেন। ব্যাঙ্গালোর থেকে তিনি ভ্রমণ করেন ত্রিচুড়, এর্নাকুলাম ও ত্রিবান্দ্রম। 1892 খ্রিস্টাব্দের বড়োদিনের প্রাক্কালে তিনি পায়ে হেঁটে 'কন্যাকুমারী' পৌঁছান। সেখানে স্বামীজি "ভারতীয় পাহাড়ের শেষ প্রান্তে" তিন দিন ধরে ধ্যান করেন। পরে কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ শিলায় "বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল" গড়ে ওঠে এবং খ্যাতি লাভ করে।

কন্যাকুমারী থেকে তিনি যান মাদুরাই যেখানে রামনাথের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে দেখা করে পরিচয়পত্র দেখান। রাজা স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে শিকাগোতে ধর্মমহাসভায় যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। মাদুরাই থেকে স্বামীজি যান পণ্ডিচেরির রামেশ্বরম। সেখান থেকে যান মাদ্রাজ। তাঁর মাদ্রাজের শিষ্যদের এবং মহীশূর, রামনাদ, খেতরির রাজাদের, দেওয়ান ও অন্যান্য অনুগামীদের সংগৃহীত অর্থের সাহায্য নিয়ে খেতরির মহারাজার পরামর্শকৃত নাম "বিবেকানন্দ" ধারণ করে স্বামী বিবেকানন্দ 1893 খ্রিস্টাব্দের 31 মে শিকাগোর উদ্দেশ্যে মুম্বাই ত্যাগ করেন।

চীন ও জাপান ভ্রমণ

শিকাগো যাবার পথে স্বামী বিবেকানন্দ 1893 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 3 দিন চীন এবং জাপান ভ্রমণ করেন। প্রথমে তিনি বন্দর নগরী নাগাসাকি পৌঁছান এবং একটি স্টীমারে চড়ে 'কোবে' যান। সেখান থেকে স্থলপথে তিন বড়ো শহর ওসাকা, কিয়োটা এবং টোকিও ভ্রমণ করে ইয়োকোহামা যান। তিনি জাপানীদের "পৃথিবীর সবচেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জনগণের অন্যতম" বলে অভিহিত করেন। জাপানের দ্রুত অগ্রগতির বিপরীত ভারতের পরিস্থিতি তুলনা করে স্বামী বিবেকানন্দ তাগিদ দেন তাঁর দেশের মানুষকে "কুসংস্কার এবং নিপীড়নের শতাব্দীর সন্তান-সন্ততিদের" সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বিদেশের দিকে তাকাতে।

প্রথম পাশ্চাত্য ভ্রমণ

স্বামীজী Express of India নামক স্টীমারে চেপে 1893 খ্রিস্টাব্দের 14 জুলাই ইওকোহামা ত্যাগ করে 25 জুলাই কানাডা এবং পরে আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূল বঙ্কুবরে (Vancouver) পৌঁছান। সেখান থেকে ট্রেনে করে Winnipeg হয়ে 30 জুলাই শিকাগো পৌঁছান। স্বামী বিবেকানন্দ হলেন ইতিহাসে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসী যিনি সমুদ্র পেরিয়ে পাশ্চাত্য দেশে পৌঁছেছেন। তিনি শিকাগোতে প্রথম

ধর্মমহাসম্মেলনে 1893 খ্রিস্টাব্দের 11 সেপ্টেম্বর থেকে 27 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট 6 দিন বক্তৃতা করেন। (3.42 অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে)।

ধর্মসভা শেষ হওয়ার পর বিবেকানন্দ পুরো দু-বছর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে অতিথি হিসেবে ভ্রমণ করেন। তিনি শিকাগো ছাড়া ডেট্রয়েট, বোস্টন এবং নিউইয়র্কে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। 1895 খ্রিস্টাব্দের জুন মাস থেকে দুই মাসব্যাপী তিনি থাউজ্যাণ্ড আইল্যান্ড পার্কে তাঁর এক ডজন শিষ্যকে ব্যক্তি পর্যায়ে শিক্ষা দেয়ার জন্য ভাষণ দেন। স্বামী বিবেকান্দ 1895 এবং 1896 খ্রিস্টাব্দে দু-বার ইংল্যান্ডে ভ্রমণ করেন এবং বক্তৃতা করেন। সেখানে তিনি সাক্ষাৎ পান এক আইরিশ মহিলা মিস মার্গারেট নোবলের, যিনি পরে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিত। দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড ভ্রমণের সময় তিনি দেখা পান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্স মুলারের। ইংল্যান্ড থেকে অন্য ইউরোপীয় দেশেও ভ্রমণ করেন। সেই সময় জার্মানীতে তিনি ভারততত্ত্ববিদ পল ডিউসেনের সঙ্গো সাক্ষাৎ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্য ক্যাপ্টেন এবং মিসেস সোভিয়ের ও জেজে ওডউইনকে নিয়ে 1896 খ্রিস্টাব্দের 16 ডিসেম্বর ইংল্যান্ড ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁরা ফ্রান্স ও ইতালি ভ্রমণ করেন এবং লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির দ্য লাস্ট সাপার দর্শন করে 1896 খ্রিস্টাব্দের 30 ডিসেম্বর ভারতের উদ্দেশ্যে ন্যাপলস বন্দর ত্যাগ করেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তন

স্বামী বিবেকানন্দ 1897 খ্রিস্টাব্দের 15 জানুয়ারী কলম্বো পৌঁছান। এখানে তিনি প্রাচ্যে তাঁর প্রথম বক্তৃতা করেন। কলম্বো থেকে তিনি যান পাম্বান, রামেস্বরম, রামনাদ, মাদুরাই, কুম্বাকোনাম এবং মাদ্রাজে। এই জায়গাগুলোতে স্বামীজী বক্তৃতা দেন। পাম্বানে মিছিলে রামনাদের রাজা নিজে স্বামীজির ঘোড়ার গাড়ি টানেন। তিনি কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে আলমোড়া পর্যন্ত বক্তৃতা অব্যাহত রাখেন। এ সমস্ত বক্তৃতা "কলম্বো থেকে আলমোড়া" শীর্ষক গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ 1897 খ্রিস্টাব্দের 1 মে কলকাতার কাছে বেলুড়ে 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় হিমালয়ের মায়াবতীতে আলমোড়ের নিকটে, যেটি 'অদ্বৈত আশ্রম' নামে পরিচিত। তৃতীয় মঠটি মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে তিনি ভ্রমণ করেন রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর, দিল্লী ও খেতরিসহ বিভিন্ন জায়গায়।

দ্বিতীয় পাশ্চাত্য ভ্রমণ

স্বামীজি ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও 1899 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে পুনরায় পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গী ছিল ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামী তুরিয়ানন্দ। তিনি স্বল্প সময় ইংল্যান্ডে থেকে তারপর যুক্তরাষ্ট্রে যান। তাঁর এই ভ্রমণকালে তিনি সানফ্রান্সিকো ও নিউইয়র্কে "বেদান্ত সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এক সহৃদয় আমেরিকান ভক্তের নিকট থেকে পাওয়া 160 একর জমিতে ক্যালিফোর্ণিয়ায় "শান্তি আশ্রম"

প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী তিনি 1900 খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে ধর্মমহাসভায় যোগ দেন। প্যারিস থেকে তিনি স্বল্প সময়ের জন্য ভ্রমণ করেন ব্রিটানি, ভিয়েনা, ইস্তানবুল, এথেন্স ও মিশরে। 1900 খ্রিস্টাব্দের 9 ডিসেম্বর স্বামীজি কলকাতায় ফিরে আসেন।

জীবনের শেষ পর্ব

পরবর্তীতে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বেলুড় মঠে অবস্থান করে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের কাজ এবং ইংল্যান্ড ও আমেরিকার রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ তদারকি করেছেন। 1901 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর জাপানের ধর্ম মহাসভায় যোগ দেওয়ার জন্য স্বামীজি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে তিনি তাতে যোগ দিতে ব্যর্থ হন। তাঁর শেষের দিনগুলোতে তিনি বোধগয়া ও বারাণসীতে তীর্থ ভ্রমণ করেন। 1902 খ্রিস্টাব্দের 4 জুলাই বেলুড় মঠে রাত 9.10 মিনিটে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যানরত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 39 বছর 5 মাস 24 দিন।

3.5 জীবন দর্শন (Philosophy of Life)

3.5.1 বিশ্বজনীনতা (Universalism)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—

> "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
> জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই আদর্শের আলোকে স্বামী বিবেকনন্দ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই অর্থেই তিনি জীবকে শিব আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর এই মানবতাবাদী জীবনাদর্শের উপর ভর করে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। বিচিত্র এই বিশ্বে বহুবিধি ও বিচিত্র ধর্মের প্রভাব প্রায়শই মানুষে মানুষে বিভেদ বা বৈরীতা বাড়ায়। বিবেকানন্দ মনে করতেন একমাত্র বহুবিধ ধর্মের মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই হতে পারে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন, ধর্মের বিশ্বজনীনতার মাপকাঠি স্থান কালের গণ্ডি নয়। বিশ্বজনীনতার মাপকাঠি নিহিত থাকে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গিতে। তিনি ধর্মকে কোনভাবেই হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাননি। তিনি সর্বধর্ম সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। অনুশাসন বলতে শুধুমাত্র বিবেকের অনুশাসন, কোন বিশেষ ধর্মীয় অনুশাসনের কাছে মাথা নত করা নয়। তিনি বলতেন, বিশ্বজনীন ধর্মের প্রচার করতে হবে, যে ধর্মের আদ্যপান্ত মোড়া থাকবে মানবতায়, প্রেমে ও সেবায়। ধর্ম হবে বিশ্বজনীন মানবধর্ম।

3.5.2 অধ্যাত্মতত্ত্ব (Spiritualism)

আধুনিক বিশ্বে স্বামী বিবেকানন্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানগুলির মধ্যে একটি হল তাঁর ধর্মের ব্যাখ্যা। তাঁর মতে ধর্ম হল একটি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা, যা সমস্ত মানুষের জন্য সাধারণ। এই সর্বজনীন ধারণা ধর্মকে কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতার কবল থেকে মুক্ত করে এবং ধর্মকে পরম জ্ঞান ও পরম সুখের সর্বোচ্চ মহৎ সাধনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই সাধনার মাধ্যমে একজনের আত্মাকে পরমাত্মার অংশ হিসেবে উপলব্ধি করার কথা বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা, আত্মাকে দেবত্বের জ্ঞানে বিশ্বাস করা সামাজিক অবক্ষয় রোধ করে এবং জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। তাঁর মতে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল ব্যাহ্য ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঈশ্বর উপলব্ধি সম্ভব। আর এই উপলব্ধিই হল ধর্মের সারসত্য। অন্ধবিশ্বাস, আচার-বিচার, মন্দির-মসজিদ সর্ব গৌণ বিষয়।

স্বামীজি সারা বিশ্বে ধ্যান ও প্রাণায়ামের প্রতি বর্তমান আগ্রহের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ব্যক্তি জীবনে এবং সামাজিক জীবনে আমাদের নৈতিকতার বেশির ভাগই সামাজিক নিন্দার ভয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ আত্মার অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধতার উপর ভিত্তি করে নীতিশাস্ত্রের একটি নতুন তত্ত্ব নীতির কথা বলেছেন। তাঁর মতে, বিশুদ্ধতা হল আমাদের আসল প্রকৃতি ও আমাদের সত্যিকারের ঐশ্বরিক আত্মা। একইভাবে আমাদের চারপাশের মানুষকে ভালবাসা বা সেবা করা উচিত, কারণ সবাই পরমাত্মারই অংশ। এইভাবে তিনি বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাতে সহায়ক হয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন পাশ্চাত্যে ভারতের প্রথম মহান সাংস্কৃতিক দূত। তাঁর মতে, মানুষের ঐক্য ধর্মের প্রাথমিক লক্ষ্য। তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বকে বোঝার জন্য চেতনার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান বলে মনে করেন।

3.5.3 মানবতা বাদ (Humanism)

সম্প্রীতি ও মানবতাবাদ ভৌগলিক সীমানা পেরিয়ে যারা বিশ্বে পৌঁছানোর জন্য তাঁর বৃহত্তর দর্শনের একটি মূল উপাদান। দেশ-জাতি নির্বিশেষে মানবের প্রতি প্রেম-সহানুভূতি এবং মানুষের দুঃখ মোচনে ব্রতী হওয়ার মনোভাবই হল মানবতাবাদের মূল কথা। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে ছিল সীমাহীন নিঃস্বার্থপরতা, যার অপর নাম বিশুদ্ধ মানবপ্রেম। আসমুদ্রহিমাচল ভারত পরিক্রমা করে ভারতের কোটি কোটি নরনারায়ণের অধ্যাত্মজীবনের গতিপ্রকৃতি শুধু নয়, লৌকিক, প্রাত্যহিক, জাগতিক জীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, আশা-নিরাশার সঙ্গো সহানুভূতিতে এক হয়ে গিয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন। সংবাদ পেলেন, কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারে। বিশ্রাম সুখ ছেড়ে স্বামীজি পাহাড় থেকে নেমে শিষ্য ও গুরুভ্রাতাদের সহযোগিতায় সেবাকার্যের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

বিবেকানন্দের ভারতপ্রেম তাঁর মানবপ্রেমেরই একটি দিক। ভারতবর্ষের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর প্রেম ও সেবা প্রবৃত্তি ভারতবাসীর দিকে ধাবিত হয়েছে। স্বামীজি বলেছিলেন, 'যতদিন এদেশের একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততদিন আমার ধর্ম হবে সে কুকুরকে খাওয়ানো।"

স্বামীজি জগতের মানুষকে সমভাবে ভালবাসেন বলেই ভারতকে বিশেষভাবে ভালবাসতেন। ভারতের ভাল হওয়ার উপর পৃথিবীর অধ্যাত্মিক উন্নয়ন নির্ভর করছে। তিনি সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন, "আমি যেমন ভারতের তেমন বিশ্বের"। গভীরতম স্বদেশপ্রেমের সাথে উদারতম বিশ্বপ্রেমের দুর্লভ মিলন স্বামীজির জীবনে সঙ্ঘটিত হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন যে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারের যুগে তাত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক দিয়ে বেদান্তের মানবপ্রেম ও মানব সেবার আদর্শ প্রচারিত ও অনুশীলিত হোক।

3.6 বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন (Philosophy of Education)

বিবেকানন্দের জীবনদর্শন থেকেই তাঁর শিক্ষাদর্শনের উদ্ভব। শিক্ষার সংজ্ঞা প্রসঙ্গো স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনই শিক্ষা (Education is the manifestation of perfection already in man)। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর মতে, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আত্মার বাস। মানুষের মধ্যে মহৎ হওয়ার সকল সম্ভাবনা নিহিত। মহত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশই শিক্ষা। মানবসত্তার মধ্যে ঈশ্বরের মহত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য।

3.6.1 শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education)

স্বামীজীর বিশ্বাস, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিসত্তার উপলব্ধি (Self-realization)। তবে ব্যক্তির বস্তুগত উন্নতি ছাড়া এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়। তাঁর মতে, শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বিমুক্তি। এ কেবল আত্মার বিমুক্তি নয়, সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি, সকল দুর্বলতা থেকে মুক্তি। ইংরেজিতে বলা যায়—Salvation from bondage of all kinds-Spiritual, Economic and Social। বিবেকানন্দের শিক্ষার লক্ষ্যকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়,—

1. শিক্ষার আপাত লক্ষ্য (Proximate Aims) এবং 2. শিক্ষার চরম লক্ষ্য (Ultimate Aims)।

1. শিক্ষার আপাত লক্ষ্য (Proximate Aims)

(a) **দৈহিক বিকাশ (Physical Development) :** স্বামীজীর মতে, শিক্ষার আপাত লক্ষ্য দৈহিক বিকাশ যা আধ্যাত্মিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত। তিনি বলেন, শক্তি পূণ্যের নিদর্শন, দুর্বলতা পাপ। সকল পাপ ও সকল অসৎ একটি শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায়, তা হল 'দুর্বলতা' (Weakness)। বিবেকানন্দ বলেন, দেহ দেবমাতার শান্তিপূর্ণ আবাসস্থল। তাই যুবকেরা

অবশ্যই প্রথমে শক্তিমান হবে, পরে ধর্ম পালন করবে। দেহকে সুস্থ, সতেজ, পরিষ্কার ও পবিত্র রাখতে হবে। তাই বিবেকান্দ বলেন দৈহিক শিক্ষার লক্ষ্য হল—লোহার মতো মাংসপেশি, ইস্পাতের মতো স্নায়ু এবং দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি।

(b) মানসিক বিকাশ (Mental Development) : বিবেকানন্দের মতে, আপাত শিক্ষার লক্ষ্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ। মানসিক বিকাশ বিদ্যার্থীকে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে। এই জ্ঞান আবার ভক্তি ও যোগ সাধনে তাকে অনুপ্রাণিত করবে এবং অবশেষে আত্মোপলব্ধিতে সাহায্য করবে। বস্তুত, মানসিক বিকাশের জন্য তিনি মনস্তাত্ত্বিক 'যোগসাধনা' রাজযোগের কথা বলেন।

(c) চরিত্র বিকাশ (Character Development : স্বামীজী বলেন, চরিত্র মানুষের আসল শক্তি। এটি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যা বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে বা গৃহ পরিবেশে অর্জন করবে। মানুষ ভালোমন্দ অসংখ্য প্রবণতা ও ইচ্ছার অধিকারী। সেই অগণিত ইচ্ছার প্রবাহ ও প্রকাশকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনকল্যাণদায়ী শক্তিতে পরিণত করাই প্রকৃত শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা কতকগুলি শব্দ-সংগ্রহ নয়, মেধা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ।

বিবেকানন্দ বলেন, 'চরিত্র গঠন' শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য। মানসিক বল, বুদ্ধির দীপ্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি সৃষ্টি করা শিক্ষার মর্মকথা। সব শিক্ষার শেষ কথা মানুষ তৈরি করা। দেহ-মন-নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশে এক পরিপূর্ণ মানুষ গড়া। Man-making is my mission—বলেন স্বামীজী।

(d) একাগ্রতার জন্য ব্রহ্মচর্য (Brahmacharya for Concentration) : বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের দেহের শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা দরকার। তাঁর কথায় 'Complete continence gives great intellectual and spiritual power। সর্বাবস্থায় পবিত্রতা করুন, চিন্তায়, কথায় ও কাজে শুচিতা রক্ষাই ব্রহ্মচর্য যা জীবন ও অনুশীলনের মূলভিত্তি। উচ্চ আদর্শ বা উন্নত নীতির চর্চার মাধ্যমে যে-কোনো বিষয় সহজে অধিগত করা যায়। মনন ও স্মৃতিশক্তির চর্চার মাধ্যমে মনের একাগ্রতা অর্জন ঘটে। এই একাগ্রতার জন্যই চাই কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন। তা বর্ধিত হয়। সুতরাং বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে, শিক্ষার লক্ষ্য কেবল তথ্য আহরণ নয়, Controlled desires lead to the highest results !

(e) বৃত্তিশিক্ষা (Vocational Education) : স্বামীজী বলেন শিক্ষার আরেকটি আপাত লক্ষ্য স্বাবলম্বী শিক্ষা (Self-sufficiency in Education) বা বৃত্তিশিক্ষা (Vocational Education)। স্বামীজী বলেন, শিক্ষার আর একটি মাধ্যমে শিশুর মধ্যে এমন সামর্থ্য বিকশিত করে তুলতে হবে যাতে সে নিজেই নিজের জীবিকা (A bread & Salt) অর্জন করতে পারে। সচ্ছল

জীবনযাপন করতে পারে। শিশুদের উপযুক্ত কর্মযোগ শিক্ষা—স্বামীজীর মতে শিক্ষার আপাত লক্ষ্যের অন্তর্গত।

2. শিক্ষার চরম লক্ষ্য (Ultimate Aims)

(a) ব্যক্তিসত্তার বিকাশ (Development of Personality) : বেদান্ত মতে কেবল শুদ্ধ নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ নিজ ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বেদান্ত মতাদর্শ অনুসরণ করে স্বামীজী ব্যক্তিসত্তার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন—শক্তি (Strength) এবং নির্ভীকতা (Fearlessness)। শিক্ষার চরম আদর্শ হল এই দুই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানবসত্তার বিকাশ যা তাদের আত্মোপলব্ধিতে সাহায্য করবে। বিবেকানন্দের বেদান্তের ভাষ্য অনুযায়ী জীবরে অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিভাব সনাতন। আর এই আধ্যাত্মিকতাকে তীব্রতর করে তোলাই শিক্ষার উপযোগিতা। বিবেকানন্দের কাছে শিক্ষা কোনো আধিভৌতিক বিষয় নয়, মানবসেবার মধ্যেই চরম আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ। আর এই চেতনাই শিক্ষা।

(b) আত্মবিশ্বাস (Faith in One's Self) : শিক্ষার চরম লক্ষ্য বিদ্যার্থীর মধ্যে এই সচেতনতা জাগিয়ে তোলা যে তারা অনন্ত শক্তির আধার। আর এই সুপ্ত শক্তি তাদের জীবনকে শুদ্ধ করে দেবত্বে উত্তীর্ণ করতে পারে। বিবেকানন্দ বলেন, ভারতবাসীকে জানাতে হবে। উপনিষদের সেই মহান বাণী—'আমিই আত্মা, তরবারি আমাকে ছিন্ন করতে পারবে না... আমিই সর্বশক্তিমান আমিই সর্বজ্ঞ।" আপন সত্তার প্রতি আস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে বজ্রকণ্ঠে তাঁর আহ্বান—ওঠো, জাগো, চলো যতক্ষণ না উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাওয়াই শিক্ষার পরম উদ্দেশ্য; 'চরৈবেতি'—অর্থাৎ শুধু চলো আর চলো। স্বামীজী দেশবাসীকে আত্মবিশ্বাসী হবার জন্য আহ্বান জানান, অন্যথা কোনো মুক্তি সম্ভব নয়। তাঁর কথায়—"বিশ্বাসী হও, শক্ত সবল হও। নিদ্রিত আত্মাকে আহ্বান করো। দেখ, কীভাবে উহা জাগিয়া ওঠে। শক্তি আসিবে, গৌরব আসিবে, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহাই আসিবে।"

(c) আত্মার বৈরাগ্যসাধন (Developing a Spirit of Renunciation) : সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকান্দের বিশ্বাস, 'কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—কর্মে তোমার অধিকার, তার ফলে তোমার অধিকার নেই। এরূপ কর্মই ব্যক্তিকে আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করবে। বিচ্যুতি (Detachment) হয়েই মানুষ তার কাজ করবে। তবেই তিনি কর্মযোগী হতে পারেন। বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বিমুক্তি। এ কেবল আহ্বার বিমুক্তি নয়, সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি, সকল দুর্বলতা থেকে মুক্তি।

(d) সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের উত্তরণ (Promotion of Universal Brotherhood) : স্বামীজীর মতে, প্রতিটি ক্ষুদ্রজীব থেকে প্রতিটি পূর্ণ মানুষ পর্যন্ত সকল আত্মার স্বরূপ এক

আর যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা কেবল প্রকাশের (Manifestation)। শিক্ষার লক্ষ্য হল মানব আত্মার পূর্ণ প্রকাশে সহায়তা করা। সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা।

(e) **আত্মোপলব্ধি (Self-Realization) :** আত্মোপলব্ধিই শিক্ষার পরম লক্ষ্য। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য যোগের সাহায্যে মনকে কেন্দ্রীভূত করা। তাঁর মতে যোগ পদ্ধতি বিদ্যার্থীর অন্তর্নিহিত গুণাবলির, যথা—নির্ভীকতা, প্রেম, সহানুভূতি ইত্যাদি বিকাশের পরম সহায়ক।

3.6.2 পাঠক্রম (Curriculam)

স্বামীজী পাঠক্রম সম্পর্কে কোনো সুসংহত বক্তব্য রাখেননি। পাঠক্রম সম্পর্কে তাঁর অভিমত তাঁর নানা লেখা ও ভাষণের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। নীচে তা বর্ণনা করা হল,—

- বিজ্ঞান ও বেদান্তের মধ্যে সমন্বয়সাধন স্বামী বিবেকানন্দের পাঠ্যক্রমের মূল কথা।
- নেতৃত্বের জন্য শিক্ষা।
- দেশভক্তি এবং স্বাধীনতার জন্য শিক্ষা।
- দৈহিক শিক্ষা—পাঠক্রমে শারীরশিক্ষা এবং শারীর সঞ্চালনমূলক খেলার উপর জোর দেন। স্বামীজী বলেন, অসুস্থ শরীর অনেক অনিষ্ট ডেকে আনে। সুস্থ শরীরে দেবতার বাস। তাই একে সতেজ রাখতে গীতা পাঠের পরিবর্তে খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষার নির্দেশ দেন স্বামীজী।
- ভাষা—বিবেকানন্দ মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠনের কথা বলেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ইংরেজির মাধ্যমে অধিগত করতে পারে। সংস্কৃত শিখবে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য।
- বৃত্তিমূলক শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা-বিবেকানন্দের কথায় ভারতের আত্মায় আছে শিক্ষা। এশীয়বাসীদের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে শিল্প। এদেশের শিল্পচর্চা ধর্মের একটি অঙ্গ। আসলে তিনি প্রাচীন শিল্পকলার পুনঃপ্রবর্তনের কথা বলেন। সাম্প্রতিককালে এসব শিল্পকর্ম ফুট প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি নামে পরিচিত। যেমন, জমানো দুধ দিয়ে ফলের বিভিন্ন খাবার, শৌখিন রান্নাবান্না, সেলাই, ছবি আঁকা, ফোটোর কাজ, কাগজ কেটে নানারকম জিনিস তৈরি, সোনা রুপার উপর সুন্দর সুন্দর কাজ মেয়েদের ব্যবহারিক পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন। নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামীজী ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, মাতৃভাষা ও কিছু ইংরেজি চর্চার কথা বলেন। এছাড়া নারী শিক্ষাক্রমে স্থান পাবে সন্তান প্রযত্নের রীতিনীতি, গৃহ পরিচর্যার শিল্প, রন্ধন কুশলতা ও সেলাইয়ের কাজ।
- শিক্ষার্থীর সেবাপরায়ণতাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পঠনপাঠনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবা প্রকল্পে আত্মনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

- **মানবিক বিদ্যা (Humanities) :** পাঠক্রমে থাকবে ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতির সম্মানজনক স্থান। মোটের উপর ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপুষ্টির জন্য যে যে বিষয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন তার সবকটিই স্বামীজী কোনো না কোনোভাবে উল্লেখ করেন। বিবেকানন্দ প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে এমন কিছু শেখাতে বলেন যাতে প্রয়োজনে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে।

3.6.3 শিক্ষণ পদ্ধতি (Method of Teaching)

বিবেকানন্দ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষণ পদ্ধতির কথা বলেছেন :

(i) **একাগ্রতার মনোভাব :** জ্ঞানার্জনের অন্যতম পদ্ধতি হল একাগ্রচিত্ত হওয়া। অর্থাৎ বিষয়বস্তু এক মনে শিক্ষার্থী উপলব্ধি করবে।

(ii) **আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে :** আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষাদান যথার্থভাবে সম্পন্ন হবে বলে তিনি মনে করতেন। কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ এই চার প্রকার যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অজ্ঞতা দূর হবে এবং আত্মোপলব্ধি সহজতর হবে।

(iii) **আলোচনার মাধ্যমে :** শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটি যদি আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। তাহলে শিক্ষাদানের কাজটি সহজতর হয় বলে তিনি মনে করতেন।

(iv) **অনুসরণের মাধ্যমে :** শিক্ষার্থীগণ যেহেতু অনেক কিছুই অনুকরণের মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করে সেহেতু তাদের অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(v) **বক্তৃতা পদ্ধতি :** শিক্ষার্থীদের কাছে জটিল পাঠ্যবিষয়বস্তু সহজ সরল উপস্থাপনের জন্য তিনি বক্তৃতা পদ্ধতিকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

(vi) **সক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতি :** তিনি শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রেখে শিক্ষাদানকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তিনি গান, গল্প, নাটক, নৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাদান সহজতর হবে বলে মনে করতেন।

(vii) **শিক্ষাগত নির্দেশনা ও পরামর্শদান :** তিনি শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশনা ও পরামর্শদানের কথা বলেছেন যাতে শিক্ষার্থীরা সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

(viii) **শৃঙ্খলা (Discipline) :** বিবেকানন্দ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষণ ও শিক্ষার্থী উভয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। কথায়, কাজে চিন্তাভাবনায় সব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা মেনে চললে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ সহজ হবে বলে মনে করেন।

3.6.4 নারীশিক্ষা, ভাষাশিক্ষা, শারীর শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, জনশিক্ষা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (Woman Education, Language education, Physical Education, Relegious Education, Mass Education and Removal of Untouchability)

নারীশিক্ষা (Woman Education) : বিবেকানন্দ মনে করতেন পুরুষের মতো নারীদেরও শিক্ষার সমান সুযোগ থাকা দরকার। জ্ঞানপিপাসা উভয়েরই সমান। মেয়ে পুরুষ বাহ্য ভেদ থাকলেও স্বরূপত কোনো ভেদ নেই। অতএব পুরুষ যদি ব্রযুক্ত হতে পারে তা মেয়েরা তা হলে পারবে না কেন? তাই স্বামীজী মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলেছেন। মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তানসন্ততি দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে—বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে। মেয়েদের তিনি ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, রান্না, সেলাই এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে বলেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণ সম্পর্কে বলেছেন—

"Educate your women first and leave to themselves; then they will tell you what reofrms are necessary for them."

"Woman will work out their own destinies, much better too, that men ever do for them. All the mischief to women has come because men undertook to shape the destiny of women."

ভাষাশিক্ষা (Language Education) : পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও বিবেকানন্দ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রভাণ্ডারে যেসব সুগভীর তত্ত্ব সঞ্চিত আছে তিনি সেগুলি সর্বসাধারণের বোধগম্য করতে চেয়েছেন। কারণ তাঁর মতে, সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলি উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগবে। শুধু তাই নয়, এমন একটা মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করতে হবে। অনুসমুদয় ভাষা যার সম্প্রতি স্বরূপ, সংস্কৃতই সেই ভাষা। এটাই ভাষা সমস্যার একমাত্র সমাধান।

শারীর শিক্ষা (Physical Education) : তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শারীরিক সুস্থতা সমগ্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক উপাদান। এজন্য তিনি বলেছেন যে, আমাদের দেশের প্রয়োজন এমন মানুষ যাদের মাংসপেশি সৌহসদৃশ, স্নায়ু ইস্পাততুল্য এবং ইচ্ছাশক্তি এমনই দৃঢ় যার বিচলন সম্ভব নয়।" তিনি শরীরশিক্ষাকে পাঠক্রমে প্রয়োজনীয় মর্যাদা দিয়ে রেখেছেন। সেই যুগে তাঁর মন্তব্য—গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলাকে আমি শ্রেয় বলে মনে করি। এথেকে উপলব্ধি করা যাচ্ছে বিবেকানন্দ খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কতখানি গুরুত্ব দিতেন।

ধর্মীয় শিক্ষা (Religions Education) : স্বামীজীর মতে সকল শিক্ষার ভিত্তি হবে ধর্মশিক্ষা। তিনি যে ধর্মের কথা বলেছেন তা হল সর্বমানবের ধর্ম ও সার্বজনীন ধর্ম। প্রচারিত সব ধর্মই মূলত

জাতীয় জীবন উন্নতির প্রচেষ্টা করছে এবং সকলেই মানুষের দেবত্বের কথা বলে গেছে। তাই শ্রদ্ধা দিয়ে, হৃদয় দিয়ে সব ধর্মকেই স্বাকীর করে নিতে হবে। ধর্মের স্বরূপ বুঝতে বিবেকানন্দ বলেছেন—ধর্ম হল অনুভূতি বা উপলব্ধি। ধর্ম কথার কথা নয় বা এটা কোনো মতবাদ নয়। কোন উৎসব অনুষ্ঠানের দরকার নেই কোনো প্রতীক অথবা মন্দির বা গির্জা অথবা পুস্তক এসব হল ধর্মের সহায়ক বিশেষ। এগুলি মানুষকে ধর্মীয় পথে চালিত করার প্রথম সোপান মাত্র।

জনশিক্ষা (Mass Education) : স্বামীজী স্বদেশের দরিদ্র ও নিপীড়িত জনগণের দুঃখে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, যতদিন পর্যন্ত দেশের হাজার হাজার মানুষ দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকবে ততদিন আমি বলব এদেশের শিক্ষিতরাই বিশ্বাসঘাতক। তারা অধঃপতিতদের উদ্ধার করার জন্য এতটুকুও চেষ্টা করেননি। আমাদের প্রধান জাতীয় পাপ হচ্ছে জনগণকে অবহেলা করা, এই অবহেলা হল আমাদের পতনের কারণ। রাজনীতি দিয়ে কোনো সুফলই পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ না ভারতের জনগণ সুশিক্ষিত হয়, তারা পেট ভরে খেতে পায়, মানুষ হবার অনুকূল অবস্থা ফিরে পায়।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (Removal of Untouchability) : বিবেকানন্দ অস্পৃশ্যতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অর্থাৎ ছুৎমার্গকে তিনি মানসিক ব্যাধি বলে মনে করতেন। তিনি সখেদে বলেছেন—"ছোঁব না বলেই এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি, এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে, বলতে হবে তোমরাও আমাদের মতো মানুষ, তোমাদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে। স্বামীজী তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও কাল নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার উত্তরণ ও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক হিতসাধনে ব্রতী হন।

ভারতকে তিনি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার দ্বারা একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করতে চান। স্বামীজীর আশা ভারত বিশ্বকে শান্তির পথ দেখাবে। স্বামীজীর সে-আশা আজও বাস্তবতা পায়নি। তাঁর শিক্ষাদর্শন কার্যকর করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ যেমন প্রয়োজন তেমনি আন্তরিক প্রয়াসও প্রয়োজন। আমাদের সকলের উচিত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সেই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দেওয়া—"Arise, awake and stop not till the goal is reached"।

3.7 সারাংশ (Summary)

স্বামী বিবেকানন্দ একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক এবং সর্বোপরী ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি উত্তর কলকাতার সিমলাপাড়ায় 1863 খ্রিস্টাব্দের 12 জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্ধিহান ছিলেন এবং অনেকের কাছে প্রশ্ন করতেন তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন কিনা। ছোটবেলা থেকেই তিনি খুব চিন্তাশীল ছিলেন, কিন্তু প্রথাগত পড়াশুনায় খুবই অমনযোগী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ 1884 খ্রিস্টাব্দে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে বি.এ. পাশ করেন।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ছিল। যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতে তাঁর পারদর্শিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান ছিল প্রবল। সে কারণেই তিনি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সংস্পর্শে আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তিনি অধ্যাতিকতায় আকৃষ্ট হন। 1886 খ্রিস্টাব্দের 16 আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াণের পর স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং গৃহত্যাগ করেন। তিনি পরিব্রাজক রূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি বেনারস, অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন, ঋষিকেশ, নৈনিতাল, আলমোড়া, শ্রীনগর, হরিদ্বার, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, খেতরি প্রভৃতি ভারতের অনেক জায়গায় ভ্রমণ করে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হন। তিনি বিভিন্ন পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত ও দর্শন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছেন।

মহীশূরের মহারাজা, রামনাদের রাজা ও খেতরির মহারাজা স্বামী বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্য ও অধ্যাত্মবোধে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্বগ্রহণ করেন। এই সমস্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে প্রথম ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে 1893 খ্রিস্টাব্দের 1 মে মুম্বাই ত্যাগ করেন। চীন, জাপান ও কানাডা হয়ে তিনি 30 জুলাই শিকাগো পৌঁছান। স্বামী বিবেকানন্দ হলেন ইতিহাসে প্রথম সন্ন্যাসী যিনি সমুদ্র পেরিয়ে পাশ্চাত্য দেশে পৌঁছান। 1893 খ্রিস্টাব্দের 11 সেপ্টেম্বর তিনি শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসম্মেলনে “Sisters and Brothers of America” বলে সমস্ত আমেরিকা বাসীর মন জয় করেছিলেন। 11 সেপ্টেম্বর থেকে 27 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি 6 দিন বক্তৃতা করেছিলেন। এই বক্তৃতার মাধ্যমে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতি বহির্বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশও ভ্রমণ করেন প্রায় সাড়ে তিন বছর তিনি পাশ্চাত্য ভ্রমণ করে এবং হিন্দুধর্মের ও মানবতার আদর্শ প্রচার করে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। 1897 খ্রিস্টাব্দের 1 মে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, যার প্রধান কার্যালয় বেলুড় মঠে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দর্শন বিশ্বজনীনতা, অধ্যাত্মবাদ ও মানবতাবাদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে সমস্ত বিশ্ববাসী হল আপনজন। তাদের উন্নতি, শিক্ষা, সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। প্রত্যেকের আত্মাই পরমাত্মার অংশবিশেষ। স্বামীজী আত্মার বিশুদ্ধতার উপর জোর দিয়েছেন। স্বামীজীর মতে মানবতাই বড় ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে দৈহিক, মানসিক ও চরিত্রের বিকাশের কথা বলেছেন। তিনি বৃত্তি শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, আত্মবিশ্বাস, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ ও আত্মোপলব্ধি শিক্ষার চরম লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি পাঠক্রম হিসেবে বিজ্ঞান, বেদান্ত, দেশভক্তি, দৈহিক শিক্ষা, ভাষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং মানবিক বিদ্যার অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন পুরুষের মত নারীদেরও শিক্ষার সমান সুযোগ থাকা দরকার। নারীরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হলেই তো সন্তান সন্ততির শিক্ষা উপযুক্ত হবে। তিনি পুরুষদেরকে, নারীদেরকে শিক্ষিত

করার সুযোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। নারীরাই ঠিক করবেন তাদের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ শারীর শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা ও জনশিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

3.8 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. স্বামী বিবেকানন্দ কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তাঁর বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার পরিচয় দিন।
2. স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আকৃষ্ঠ হয়েছিলেন এবং কখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন?
3. স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক হিসেবে ভারত ভ্রমণ ও বিদেশ ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
4. স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদান করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন?
5. স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিয়ে বিখ্যাত হন?
6. বিশ্বজনীনতা, অধ্যাত্মবাদ ও মানবতার উপর ভিত্তি করে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দর্শন আলোচনা করুন।
7. স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার আপাত লক্ষ্য ও শিক্ষার চরম লক্ষ্য উল্লেখ করুন।
8. স্বামী বিবেকানন্দের মতানুসারে পাঠক্রম কি প্রকার হওয়া উচিৎ?
9. স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতি উল্লেখ করুন।
10. স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ অনুযায়ী নারীশিক্ষা, ভাষাশিক্ষা, শারীর শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, জনশিক্ষা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

3.9 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- The Sannyasi's Siblings. https://hritambhara.com/2024/03/07 Retrieved on 23.11.2023
- Biography of Swami Vivekananda./rkmath.org/wp-content/uploads/2021/07 Retrieved on 24.11.2023
- Swami Nikhilananda, 1953. Vivekananda Biography/uploads 27.11.2023.
- স্বামী বিবেকানন্দ উইকিপিডিয়া, sm.m.wikipedia.org Retrieved on 13.01.2024

- 1893 Chicago Parliament of the World's Religions, https://parliament of religions.org. Retrieved on 24.01.2024
- শংকর ২০১৪, আমি বিবেকানন্দ বলছি, সাহিত্যম, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
- Swami Vivekananda and His 1893 speech : The Art Institute of Chicago. https://www.artic.edu>swami-vivekananda. Retrieved on 26.01.2024
- স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ১৯৭৭, চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা-৭০০ ০২৯

Module – 2

Indian Thinkers–II

একক 4 ❑ মহাত্মা গান্ধী (Mahatma Gandhi)

গঠন

4.1 উদ্দেশ্য **(Objectives)**

4.2 ভূমিকা **(Introduction)**

4.3 মহাত্মা গান্ধীর পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও মূলনীতি **(Family Life, Education and Principles of Manatma Gandhi)**

4.3.1 মহাত্মা গান্ধীর পারিবারিক জীবন **(Family Life of Mahatma Gandhi)**

4.3.2 মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা **(Education of Mahatma Gandhi)**

4.3.3 মহাত্মা গান্ধীর মূলনীতি **(Principles of Mahatma Gandhi)**

4.4 ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা **(Role of Mahatma Gandhi in Independence Movement of India)**

4.4.1 অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলন **(Non-cooperation and Non-violence Movement)**

4.4.2 স্বরাজ ও লবণ সত্যাগ্রহ **(Swaraj and Salt Satyagraha)**

4.4.3 ভারত ছাড়ো আন্দোলন **(Quit India Movement)**

4.5 মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা চিন্তা **(Educational Thoughts of Mahatma Gandhi)**

4.5.1 গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শন, শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা **(Gandhiji's Educational Philosophy, Aims of Education, Curriculum, Teaching Methods and Teachers Role)**

4.5.2 গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা **(Gandhiji's Basic Education)**

4.7 সারাংশ **(Summary)**

4.8 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

4.8 গ্রন্থপুঞ্জ **(Bibliography)**

4.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- মহাত্মা গান্ধীর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মহাত্মা গান্ধীর মূলনীতিগুলি জানতে পারবেন।
- মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলন, স্বরাজ ও লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা দর্শন, শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

4.2 ভূমিকা (Introduction)

মহাত্মা গান্ধী বা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতের গুজরাতের পোরবন্দরে 2 অক্টোবর 1869 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী এবং ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জাতীয় নেতা হয়েছিলেন। তাই তিনি 'জাতির পিতা' হিসেবে বিবেচিত হন। প্রতি বছর 2 অক্টোবর ভারতে গান্ধী জয়ন্তী হিসেবে যথাযোগ্য মর্যদায় পালিত হয়। 2007 খ্রিস্টাব্দের 15 জুন জাতিসংঘের সাধারণ সভায় 2 অক্টোবরকে "আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

18 বছর বয়সে 1888 খ্রিস্টাব্দের 4 সেপ্টেম্বর গান্ধীজী ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য "ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে" যান। 1891 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে গান্ধীজী ভারতে ফিরে আসেন। তিনি বোম্বের একটি আদালতে যুক্ত হয়েছিলেন। 1893 খ্রিস্টাব্দে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার একটি প্রদেশ 'নাটালের' একটি ভারতীয় ফার্মের কাছ থেকে এক বছরের চুক্তির একটি অফার গ্রহণ করে সেখানে যান। শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে দুই দশকেরও বেশি সময় কাটান। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচলিত জাতিগত বৈষম্যের শিকার হন। ডারবানের একটি আদালতে ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে পাগড়ী খুলে ফেলতে বলেছিলেন। তিনি সে নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন এবং আদালত কক্ষ ছেড়ে চলে যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে 1914 খ্রিস্টাব্দে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিছুদিন লন্ডনে থেকে গান্ধীজী পরিবারসহ 1915 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

গান্ধীজী তখন ব্রিটিশ রাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রয়োজন অনুভব করেন এবং সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ডাক দেন, যা 1919 খিস্টাব্দে উপমহাদেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। 1920 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গান্ধীজী রাজনৈতিক মঞ্চে প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করা। 1922 খ্রিস্টাব্দের 10 মার্চ তিনি গ্রেপ্তার হন এবং 1924 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে তিনি মুক্তি পান। ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস পার্টীর সভাপতি মনোনীত হন এবং এক বছর ঐ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ক্রমান্বয়ে গান্ধীজী কংগ্রেস পার্টির প্রধান কণ্ঠস্বর হিসেবে স্বীকৃত হন। 1930 খ্রিস্টাব্দের মার্চে তিনি লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তখন তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডনে 'গোলটেবিল সম্মেলনে' যোগ দিতে সম্মত হন। 1932 খ্রিস্টাব্দে বন্দী থাকাকালীন তিনি অনশন শুরু করেন। 1942 খ্রিস্টাব্দে তিনি অবিলম্বে ব্রিটিশদের প্রত্যাহারের দাবিতে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন গড়ে তোলেন। 1945 থেকে 1947 খ্রিস্টাব্দ ছিল গান্ধীজীর জীবনের বড় হতাশাব্যঞ্জক সময়। ভারতীয় ঐক্য ছাড়াই ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক দেশ গঠনের মাধ্যমে 1947 এর 15 আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে 1948 খ্রিস্টাব্দের 30 জানুয়ারী, যখন তিনি দিল্লীতে তাঁর সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় যাচ্ছিলেন, তখন নাথুরাম গডসে নামক এক তরুণ হিন্দু ধর্মান্ধ তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা চিন্তা তাঁর জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষা দর্শন ছিল ভাববাদী, প্রকৃতিবাদী ও প্রয়োগবাদী। তাঁর শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল বৃত্তিমূলক শিক্ষা। গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠক্রম হিসেবে সুতো কাটা, তাঁত বোনা, কৃষি কাজ, কাঠের কাজ, কাগজের কাজ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাঁর শিক্ষা দর্শন অনুযায়ী, শিক্ষক হবেন আদর্শ ও অনন্ত জ্ঞানের আধার এবং ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত।

4.3 মহাত্মা গান্ধীর পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও মূলনীতি (Family Life, Education and Principles of Mahatma Gandhi)

4.3.1 মহাত্মা গান্ধীর পারিবারিক জীবন (Family Life of Mahatma Gandhi)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতের গুজরাতের পোরবন্দরে 1869 খ্রিস্টাব্দের 2 অক্টোবর হিন্দু মোধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন পোরবন্দরের দেওয়ান এবং মা পুতলিবাই করমচাঁদের চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন। করমচাঁদের প্রথম দুই স্ত্রীর প্রত্যেকেই একটি করে কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন এবং তাদের মৃত্যু হয়েছিল। পরবর্তীতে নিঃসন্তান তৃতীয় স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে করমচাঁদ পুতলিবাইকে বিবাহ করেছিলেন।

1883 খ্রিস্টাব্দে মাত্র 13 বছর বয়সে মোহনদাস তাঁর বাবা-মায়ের পছন্দে 13 বছর বয়েসেরই

কস্তুরবা বা কস্তুবাঈ মাখাঞ্জীকে বিয়ে করেন। তাঁদের চার পুত্র সন্তান জন্মায় যাদের নাম হরিলাল (1888), মণিলাল (1892), রামদাস (1897) এবং দেবদাস (1900)। গান্ধীজীর প্রথম পুত্র জন্মানোর পর 1888 খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে আইন অধ্যয়নের জন্য তাঁর স্ত্রী ও পরিবারকে ছেড়ে এত দূরে যাওয়া নিয়ে তাঁর মায়ের আপত্তি ছিল। তাঁর স্ত্রী ও মাকে রাজি করাতে, গান্ধীজী মায়ের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি মাংস, মাছ, মদ ও মহিলাদের থেকে বিরত থাকবেন। তখন পুতলিবাই তাঁর অনুমতি দিয়েছিলেন ও আশীর্বাদ করেছিলেন।

4.3.2 মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা (Education of Mahatma Gandhi)

মোহনদাসের বয়স যখন 9 বছর তখন তিনি রাজকোটের একটি স্থানীয় স্কুলে যান এবং পাটিগণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং ভাষার মৌলিক বিষয়গুলি অধ্যয়ন করেন। 11 বছর বয়সে তিনি রাজকোটের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। 1883 খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিয়ের কারণে অন্তত এক বছর তাঁর লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে এবং পরে তিনি আবার বিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং স্কুলে পড়াশুনা শেষ করেন। 1888 খ্রিস্টাব্দে তিনি গুজরাটের ভাবনগরের সামলদাস কলেজে যোগ দেন এবং সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি সামলদাস কলেজে পড়াশুনায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তখন গান্ধীজীর এক পারিবারিক বন্ধুর পরামর্শে লন্ডনে আইন পড়তে যাওয়ায় আগ্রহী হন।

1888 খ্রিস্টাব্দের 4 সেপ্টেম্বর আইন অধ্যয়নের জন্য তিনি 18 বছর বয়সে লন্ডনে যান। তিনি তখন 'ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে' আইন অধ্যয়নের জন্য যোগ দেন। 1891 খ্রিস্টাব্দে তিনি আইন পড়া সমাপ্ত করে ভারতে ফিরে আসেন। লন্ডনে থাকাকালীন তিনি "নিরামিষভোজী সংঘে' যোগ দেন। এই সংঘের সদস্যরা আবার থিওসোফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society) -এর সদস্য ছিলেন। সেখানে গান্ধীকে ভগবত গীতা পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছিল। আগে ধর্ম বিষয়ে তেমন কোন আগ্রহ না থাকলেও, গান্ধীজী হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, ইসলামসহ অন্যান্য ধর্ম এবং বিভিন্ন রীতি সম্পর্কে পড়াশুনা করেন।

4.3.3 মহাত্মা গান্ধীর মূলনীতি (Principles of Mahatma Gandhi)

গান্ধীজীর জীবনে যে সমস্ত নীতি অনুসরণ করেছিলেন সেগুলি হল :

সত্য : গান্ধীজী তাঁর জীবনকে সত্য অনুসন্ধানের বৃহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীর নাম দিয়েছিলেন "দি স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ" যার অর্থ হলো সত্যকে নিয়ে আমার নিরীক্ষার গল্প। গান্ধীজী তাঁর বিশ্বাসকে সংক্ষিপ্ত করে বলেন, "ঈশ্বর হল সত্য"। পরবর্তীতে তিনি তাঁর মত বদল করে বলেন, "সত্য হলো ঈশ্বর"। এর অর্থ, সত্যই হল ঈশ্বর—এটাই গান্ধীজীর দর্শন।

অহিংসা : গান্ধীজী তাঁর জীবনীতে অহিংসা সম্পর্কে বলেন, "যখন আমি হতাশ হই, আমি স্মরণ

করি সমগ্র ইতিহাসেই সত্য ও ভালবাসার জয় হয়েছে। দুঃশাসক হত্যাকারীদের কখনো অপরাজেয় মনে হলেও তাদের পতন ঘটে মনে রাখবেন সর্বদাই”।

নিরামিষ ভোজন : নিরামিষ ভোজনের ধারণা হিন্দু ও জৈন ধর্মে গভীরভাবে বিদ্যমান এবং তাঁর রাজ্য গুজরাতে বেশির ভাগ হিন্দুই ছিলেন নিরামিষ ভোজী। গান্ধী পরিবারও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি নিরামিষ ভোজনের উপর “The moral basis of vegeterianism” বইটির পাশাপাশি এই বিষয়ের উপর বেশ কিছু নিবন্ধ লেখেন।

বিশ্বাস : গান্ধীজী সকল ধর্মকে সমানভাবে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁকে এই ধারণা থেকে বিচ্যুত করার সব প্রচেষ্টা প্রতিহত করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি ধর্মের মূলে আছে সত্য ও প্রেম (করুণা ও অহিংসা)। তিনি একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন এবং সব ধর্মের গুন্ডামি, অপকর্ম ও অন্ধবিশ্বাসের বিপক্ষে ছিলেন।

সরলতা : গান্ধীজী মনে করতেন যে, সামাজিক কাজে নিয়োজিত একজন ব্যক্তি অবশ্যই সাধারণ জীবন যাপন করবে। তাঁর সরলতার সূচনা ঘটে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাপিত পশ্চিমা জীবনাচরণ ত্যাগ করার মাধ্যমে। তিনি এটাকে “শূন্যে নেমে যাওয়া” হিসেবে আখ্যায়িত করেন, যার মধ্যে ছিল অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে ফেলা, সাদামাটা জীবন যাপন করা এবং নিজের কাপড় নিজে ধোয়া।

4.4 ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা (Role of Mahatma Gandhi in Independence Movement of India)

4.4.1 অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলন (Non-cooperation and Non-violence Movement)

গান্ধীজী 1893 থেকে 1914 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আইনজীবী হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটানোর পর 1915 খ্রিস্টাব্দের 9 জানুয়ারী ভারতে ফিরে আসেন। এইজন্য ঐ দিনটিকে “প্রবাসী ভারতীয় দিবস” হিসেবে পালন করা হয়। অতঃপর একজন সম্মানিত কংগ্রেস নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলের মাধ্যমে গান্ধীজীর ভারতীয় রাজনীতির সাথে পরিচয় ঘটে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অস্ত্র ছিল অসহযোগ এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ। 1921 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী হন। গান্ধীজী তাঁর অহিংস নীতির সাথে স্বদেশি নীতি যোগ করেন। স্বদেশি নীতি অনুযায়ী সকল বিদেশী পণ্য বিশেষত ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আহ্বান জানান। এর মাধ্যমে তিনি সকল ভারতীয়কে ব্রিটিশ পোশাকের বদলে খাদি পরার আহ্বান জানান। তাছাড়াও ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের পাশাপাশি গান্ধীজী জনগণকে ব্রিটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালত বর্জনের, সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ এবং ব্রিটিশ উপাধি বর্জনেরও ডাক দেন। অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও সাফল্য লাভ করে। তবে আন্দোলনটি চরমে পৌঁছানো মাত্র অপ্রত্যাশিত

ভাবে উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় তীব্র সংঘর্ষের ফলে এর সমাপ্তি ঘটে। আন্দোলন সহিংসতার দিকে মোড় নিতে দেখে গান্ধীজী গণ অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। গান্ধীজীকে গ্রেফতার করে 1922 খ্রিস্টাব্দের 10 মার্চ তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ছয় বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। কিন্তু দুই বছর পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে এরই মধ্যে অহিংস আন্দোলন চলাকালীন হিন্দু ও মুসলমানদের সৌহার্দ্যে ভাঙন ধরে। গান্ধীজী এসব বিরোধ মিটিয়ে সেতুবন্ধের কাজ করার চেষ্টা করেন এবং এই জন্যে 1924 খ্রিস্টাব্দে তিনি তিন সপ্তাহের অনশন করেন। তবে তাঁর এই প্রচেষ্টায় বেশি সফলতা আসেনি।

4.4.2 স্বরাজ ও লবণ সত্যাগ্রহ (Swaraj and Salt Satyagraha)

গান্ধীজী 1920 এর দশকের বেশির ভাগ সময় নীরব থাকেন। এই সময়ে তিনি স্বরাজ পার্টি এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাঝে বাধা দূর করার চেষ্টা করেন। 1928 খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার সামনে এগিয়ে আসেন। গান্ধীজী কলকাতা কংগ্রেসে 1928 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতকে 'ডোমিনিয়নের' মর্যাদা দেবার দাবি জানান, অন্যথায় পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের হুমকি দেন। গান্ধীজী এর মাধ্যমে তরুণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং জওহরলাল নেহেরুর দর্শন সঞ্চালন করেন, যাঁরা অবিলম্বে স্বাধীনতার পক্ষপাতী হয়েছিলেন। 1929 খ্রিস্টাব্দের 31 ডিসেম্বর লাহোরে ভারতীয় পতাকা উন্মোচিত হয়। 1930 খ্রিস্টাব্দের 26 জানুয়ারী লাহোরে মিলিত হয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দিনটিকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে।

অতঃপর গান্ধীজী লবণের উপর কর আরোপের বিরুদ্ধে নতুন সত্যাগ্রহ অভিযান শুরু করেন। 1930 খ্রিস্টাব্দের মার্চে তিনি ডান্ডির উদ্দেশ্যে লবণ কুচকাওয়াজ আয়োজন করেন এবং নিজের হাতে লবণ তৈরীর জন্য 12 মার্চ থেকে 6 এপ্রিল পর্যন্ত 400 কিলোমিটার হেঁটে এলাহাবাদ থেকে ডান্ডিতে পৌঁছান। হাজার হাজার ভারতীয় তাঁর সাথে হেঁটে সাগরের তীরে পৌঁছান। ব্রিটিশ সরকার এর প্রতিশোধ নিতে 60,000 ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। সরকার গান্ধীজীর সাথে সমঝোতা করতে লর্ড এডওয়ার্ড আরউইনকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে। গান্ধী আরউইন সমঝোতা হয় 1941 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। সরকার সকল আন্দোলন বন্ধের বিনিময়ে সকল বন্দিদের মুক্তি দিতে রাজী হয়। তাছাড়াও গান্ধীজীকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য লন্ডনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে তিনি একাই কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন। লর্ড আরউইনের স্থলাভিষিক্ত লর্ড উইলিংডন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। গান্ধীজী পুনরায় গ্রেপ্তার হন।

4.4.3 ভারত ছাড়ো আন্দোলন (Quit India Movement)

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের দাবিতে জাতীয় কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 1942 খ্রিস্টাব্দের 8 আগস্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' শুরু হয়েছিল। আন্দোলনটি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসেবে

বিবেচিত হয়। আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অহিংস পদ্ধতিতে জনসাধারণকে একত্রিত করা এবং স্বাধীনতার দাবিতে সমর্থনের ভিত্তি তৈরী করা। আন্দোলনটি গতি অর্জন করতে থাকে এবং 1943 খ্রিস্টাব্দে এটি একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় বিক্ষোভ, ধর্মঘট এবং আইন অমান্যতে অংশগ্রহণ করে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ—

● মুম্বাইতে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে একটি বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। সেখানে গান্ধীজী তাঁর বিখ্যাত ভাষণে "ডু অর ডাই" বলে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই ভাষণটি লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেগে উঠতে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং আন্দোলন দ্রুত গতি লাভ করে।

● সারা ভারতে শহর ও গ্রামে ব্যাপক বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের মাধ্যমে আন্দোলনটি ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মহাত্মা গান্ধীসহ গণ গ্রেফতার এবং বিক্ষোভকারীদের উপর নৃশংস দমনসহ কঠোর ব্যবস্থা নেয়।

● ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গণআন্দোলন এবং ইহা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের টার্নিং পয়েন্ট চিহ্নিত করে এবং 1947 খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়।

● ভারত ছাড়ো আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শাসনকেও দুর্বল করে দেয়, কারণ এটি সরকারী পরিসেবা, যোগাযোগ এবং পরিবহণ ব্যাহত করেছিল। অবশেষে, ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল যে ভারত দীর্ঘদিন অশাসনযোগ্য হয়ে উঠেছিল এবং যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির জন্য তাদের কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল, কীভাবে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রস্থান করা যায়।

4.5 মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা চিন্তা (Educational Thoughts of Mahatma Gandhi)

4.5.1 গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শন, শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা (Gandhiji's Educational Philosophy, Aims of Education, Curriculum, Teaching Methods and Teachers. Role)

গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শন (Educational Philosophy of Gandhiji)

গান্ধীজীর বলিষ্ঠ শিক্ষা দর্শন তাঁর জীবন দর্শন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা চিন্তা তাঁর জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষা দর্শন প্রধানত তিনটি নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত :

(i) ভাববাদী শিক্ষা দর্শন হিসেবে শিক্ষার লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হয়েছে।

(ii) প্রকৃতিবাদী শিক্ষা দর্শন হিসেবে শিক্ষার পাঠক্রম নির্দ্ধারিত হয়েছে।

(iii) প্রয়োগবাদী শিক্ষা দর্শন হিসেবে শিক্ষণ পদ্ধতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education)

গান্ধীজীর মতানুসারে শিক্ষার লক্ষ্য দুই প্রকার—

(i) শিক্ষার চরম লক্ষ্য : গান্ধীজীর মতানুসারে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হলো ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিশুর দেহ, মন ও আত্মার পরিবূর্ণ বিকাশ সাধন করা।

(ii) শিক্ষার আপাত লক্ষ্য : শিক্ষার আপাত লক্ষ্য সম্পর্কে গান্ধীজী বলেছেন—এই লক্ষ্য বহুবিধ যেগুলি জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার আপাত লক্ষ্যগুলি হলো—

- ব্যক্তির চারিত্রিক বিকাশ সাধন
- বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান বা স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা
- কৃষ্টিমূলক বা সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন
- সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষা, যার মাধ্যমে ব্যক্তির উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

পাঠক্রম (Curriculum)

গান্ধীজী শিক্ষার পাঠক্রম সম্পর্কে বাস্তবমুখী বা ব্যবহারিক পাঠক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন—পাঠক্রম হবে শিক্ষার্থীদের সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার উপযুক্ত। তাই তিনি বুনিয়াদি শিক্ষা চিন্তায় হস্তশিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাছাড়া পাঠক্রমে যে সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন, সেগুলি হল—

- ভাষা শিক্ষা
- গণিত
- সমাজ বিজ্ঞান (ইতিহাস, ভূগোল, পৌর বিজ্ঞান, অর্থনীতি)
- সাধারণ বিজ্ঞান (প্রকৃতি পাঠ, জীববিদ্যা, শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান)
- সংগীত
- চারুশিল্প
- শরীরচর্চা

তাছাড়া বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রম হিসেবে সুতো কাটা, তাঁত বোনা, কৃষিকাজ, কাঠের কাজ, কাগজের কাজ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Method)

শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসেবে গান্ধীজী বুনিয়াদি শিক্ষার পদ্ধতির কথা বলেছেন। 1937 খ্রিস্টাব্দে তিনি বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষাদান করার কথা বলেন। অর্থাৎ তিনি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ভাবনার বাস্তব উপযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে শিশুদের শিক্ষার জন্য কর্মকেন্দ্রিক ও শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছেন।

শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teachers)

গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শনে শিক্ষকের ভূমিকা হবে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। শিক্ষক হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। তাছাড়া শিক্ষকের ভূমিকা হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশ সাধন করা। তাই শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন—শিক্ষক হবেন আদর্শ, অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী ও ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁর আদর্শ চরিত্র শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশ, ভক্তি ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতাবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করবে।

4.5.2 গান্ধীজীর বুনিয়াদিশিক্ষা (Basic Education of Gandhiji)

বুনিয়াদি শিক্ষা (Basic Education) হল গান্ধীজী প্রবর্তিত একটি নতুন শিক্ষানীতি যার মাধ্যমে হাতে-কলমে কাজ করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠতে পারে। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে গান্ধীজী সর্বপ্রথম বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তনের কথা বলেন। 1935 থেকে 1937 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে গান্ধীজীর 'হরিজন পত্রিকা'-তে বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা নামক আলোচনা প্রকাশিত হয়। তখন থেকে এই বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা 'নঈতালিম' নামে অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Basic Education)

গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়সি ছেলেমেয়েদের জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।

(ii) এই শিক্ষাব্যবস্থা কোন নির্দিষ্ট শিল্পকে কেন্দ্র করে গঠিত হবে, যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা কর্মজগতে প্রবেশ করতে পারবে।

(iii) এই শিক্ষা শিশুর আবশ্যিক প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে গণ্য হবে।

(iv) বুনিয়াদি শিক্ষা হবে উৎপাদনমুখী, অর্থাৎ এই শিক্ষার মাধ্যমে উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

(v) এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্ক যুক্ত হবে।

(vi) বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা মাতৃভাষার উপর ভিত্তিকরে হবে।

(vii) এই শিক্ষা কেবলমাত্র শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এই শিক্ষায় পিতা-মাতার শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হবে।

(viii) বুনিয়াদি শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান করা।

বুনিয়াদি শিক্ষার কাঠামো (Structure of Basic Education)

বুনিয়াদি শিক্ষার কাঠামো চারটি ভাগে বিভক্ত—

- প্রাক্-বুনিয়াদি শিক্ষাস্তর (7 বছরের আগে)
- বুনিয়াদি শিক্ষাস্তর (7–10 বছর)
- উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষাস্তর (11–14 বছর)
- প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষাস্তর (14 বছরের পর)

বুনিয়াদি শিক্ষার সুবিধা (Advantages of Basic Education)

(i) সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষা : গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(ii) শ্রমের প্রতি মর্যাদা দান : এই শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে কায়িক পরিশ্রমের উপর করে সম্পন্ন হয়, তাই শিক্ষার্থীরা শ্রমের প্রতি মর্যাদা দান করতে সক্ষম হয়।

(iii) শিক্ষার্থীদের নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ : এই শিক্ষার পাঠক্রম সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।

(iv) বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ : বুনিয়াদি শিক্ষার মূল ভিত্তি হল এর বৃত্তিমুখীনতা। তাই এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাই এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সৃষ্টি হয়।

(v) সৃজনশীলতার বিকাশ সাধন : হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। তাই সৃজনশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রকার শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

বুনিয়াদি শিক্ষার অসুবিধা (Disadvantages of Basic Education)

(i) গ্রামভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা : গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষার প্রধান অসুবিধা হল, এই শিক্ষা

গ্রামকে কেন্দ্র করে সম্পন্ন হয়। শহরে শিক্ষার্থীরা কিভাবে এই শিক্ষা গ্রহণ করবে তা গান্ধীজী কিছু উল্লেখ করেননি।

(ii) **প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব** : গান্ধীজী বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব এই শিক্ষার প্রধান অসুবিধা।

(iii) **শিল্পের প্রতি অতি সক্রিয়তা** : এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্পের প্রতি অতি সক্রিয়তার ফলে শিক্ষার্থীরা অন্য বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

(iv) **আর্থিক স্বনির্ভরতার ব্যাঘাত** : শিক্ষার্থীদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা কম থাকায়, তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা অনেকটা ব্যহত হয়।

(v) **সঠিক পরিকল্পনার অভাব** : বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনার অভাব ছিল। তাই এই শিক্ষা সুদূরপ্রসারী হতে ব্যর্থ হয়েছে।

4.6 সারাংশ Summary)

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন এক অভিনব ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গীও অনন্য। স্বাধীনতার অর্থও তাঁর কাছে সঙ্কুচিত ছিল না, ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এছাড়াও যে সত্য ও স্বরাজ ব্যবস্থাকে আদর্শ করে তিনি সারাজীবন প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করে এক অভূতপূর্ব কর্মসাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, তার মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল যতখানি সম্ভব ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সেই তুলনায় যথেষ্ট কম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। বস্তত: মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মূলত বিদেশী শাসকের অপসারণ এবং স্থায়ী স্বাধীন দেশ গঠনের প্রচেষ্টা বা দেশের মানুষকে এক নতুন সমাজের জন্য তৈরী করার প্রচেষ্টা। এটা সত্যিই অনন্য ও অভূতপূর্ব যা ইতিহাসে কখনও কোথাও এমন ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। এই আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো ‘‘জন জাগরণ’’—যা গান্ধী আন্দোলনের অন্যতম ও অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত।

লক্ষ লক্ষ ভারতীয়দের চোখে, গান্ধী ছিলেন মহাত্মা (‘‘মহান আত্মা’’)। নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1915 খ্রিস্টাদে তাঁর আত্মজীবনী লেখার সময় গান্ধীজীকে ‘মহাত্মা’ উপাধি দিয়েছিলেন। ভারতীয় শিক্ষাবিদ হিসেবে মহাত্মা গান্ধী বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর শিক্ষাদর্শন শিক্ষাক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর শিক্ষা দর্শনের অন্যতম দিক হল ‘বুনিয়াদি শিক্ষা যা শিক্ষা জগতে বিশেষ প্রসংসা অর্জন করেছে।

4.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. মহাত্মা গান্ধীর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে লিখুন।
2. মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
3. মহাত্মা গান্ধীর মূলনীতিগুলি কি কি?
4. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও অহিংসা আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
5. মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ ও লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে লিখুন।
6. মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
7. মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা লিখুন।
8. গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

4.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- Purkait, B.R. (1995), Great Educators and their Philosophies, New Central Book Agency (P) Limited., Kolkata
- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, Wikipedia.https://bm.m.wikipedia.org, Retrieved on 29.02.2024
- মহাত্মা গান্ধী-উইকিপিডিয়া, https://en.wikipedia.org, Retriered on 29.02.2024
- গান্ধী ই-বুকস, www.gandhiheritageportal.org, Retrieved on 01.03.204
- The story of my Experiments with Truth, https://www.mkgandhi.org, Retrieved on 01.03.2024
- গান্ধী ও রচিত বই (ই-বুক), https://www.gandhiashramsevagram.org, Retrieved on 02.03.204
- মহাত্মা গান্ধী জীবনী : পরিবার, শিক্ষা, ইতিহাস, আন্দোলন এবং ঘটনা (2024), Jagran Josh, https://www.jagranjosh.com, Retrieved on 02.03.2024
- মহাত্মা গান্ধী : জীবনী, জীবনযাত্রা, রাজনৈতিক ক্যারিয়ার (2024), Vedantu, https://www.vedantu.com, Retrieved on 02.03.2024
- মহাত্মা গান্ধী ও স্বাধীনতা আন্দোলন : একটি অন্য বিশ্লেষণ, https://www.gandhimuseum.in, Retrieved on 02.03.2024

একক 5 ❑ শ্রী অরবিন্দ (Sri Aurobindo)

গঠন

5.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

5.2 ভূমিকা (Introduction)

5.3 শ্রী অরবিন্দের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবন (Family Life, Education and Service Life of Sri Aurobindo)

5.3.1 শ্রী অরবিন্দের পারিবারিক জীবন (Family Life of Sri Aurobindo)

5.3.2 শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা (Education of Sri Aurobindo)

5.3.3 শ্রী অরবিন্দের কর্মজীবন (Service Life of Sri Aurobindo)

5.4 শ্রী অরবিন্দের জীবন দর্শন (Sri Aurobindo's Philosophy of Life)

5.4.1 শ্রী অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন (Political Life of Sri Aurobindo)

5.4.2 শ্রী অরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবন (Spiritual Life of Sri Aurobindo)

5.5 শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন (Educational Philosophy of Sri Aurobindo)

5.5.1 শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠক্রম (Aims of Education and Curriculum)

5.5.2 মূল্যবোধের শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং শরীর শিক্ষা (Value Education, Education through Mother tongue and Physical Education)

5.5.3 শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা (Teaching Method and Role of Teachers)

5.6 সারাংশ (Summary)

5.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

5.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

5.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- শ্রী অরবিন্দের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

- শ্রী অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শ্রী অরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শ্রী অরবিন্দের মতানুসারে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শ্রী অরবিন্দের মতানুসারে মূল্যবোধের শিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শ্রী অরবিন্দের মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

5.2 ভূমিকা (Introduction)

শ্রী অরবিন্দ (15 আগস্ট 1872 — 5 ডিসেম্বর 1950) ছিলেন একজন ভারতীয় দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, যোগী ও জাতীয়তাবাদী। সাংবাদিক হিসেবে তিনি 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন। 1910 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে এক প্রভাবশালী নেতা। তিনি ভারতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি একজন আধ্যাত্মিক সংস্কারকে পরিণত হন এবং মানব-প্রগতি ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির কথা প্রচার করেন।

শ্রী অরবিন্দের পিতা ড. কৃষ্ণধন ঘোষ 1897 খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 7 বছর বয়সে দুই সহোদর সহ বিলেতে ইউরোপীয় শিক্ষা লাভের জন্য ম্যাঞ্চেস্টারে পাঠান। 1889 খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কিংস কলেজের বৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি ICS পরীক্ষায় 250 জনের মধ্যে 11তম স্থান অধিকার করে পাশ করেন। 1893 খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ ভারতে ফিরে আসেন।

ভারতে ফিরে এসে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন এবং বরোদা কলেজে উপাধক্ষের পদও অলংকৃত করেন। অতপর তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি বহুবার গ্রেফতার হয়েছেন। জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় শ্রী অরবিন্দ অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। মুক্তি লাভের পর তিনি পণ্ডিচেরি চলে যান এবং রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করেন।

5.3 শ্রী অরবিন্দের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবন (Family Life, Education and Service Life of Sri Aurobindo)

5.3.1 শ্রী অরবিন্দের পারিবারিক জীবন (Family Life of Sri Aurobindo)

অরবিন্দ ঘোষ ভারতের বেঙ্গাল প্রেসিডেন্সি কলকাতায় 1872 খ্রিস্টাব্দের 15 আগস্ট একটি বাঙালী

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোন্নগর গ্রামে। তাঁর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ তৎকালীন বাংলার রংপুরের সহকারী সার্জন এবং পরে খুলনার সিভিল সার্জন ছিলেন, যিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রী অর্জন করেন। শ্রী অরবিন্দের মা স্বর্ণলতা দেবীর পিতা রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্মের জন্য তাঁর মাকে কলকাতার ভাল পরিবেশে পাঠানো হয়েছিল। শ্রী অরবিন্দের দুই দাদা বিনয়ভূষণ ও মনমোহন, ছোট বোন সরজিনী এবং ছোট ভাই বারীন্দ্র কুমার।

শ্রী অরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ দুই দাদাসহ অরবিন্দকে 7 বছর বয়সে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সপরিবারে লন্ডনে যান। 1893 খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ ICS পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ছেলেকে নেওয়ার জন্য বম্বে অপেক্ষা করছিলেন। তার এজেন্টের কাছে যখন ভুল তথ্য শুনেছিলেন যে অরবিন্দ যে জাহাজে করে আসছিলেন সেটি পর্তুগালের উপকূলে ডুবে গিয়েছে। তখন ঐ খবর শুনেই তার পিতা মারা যান। 1906 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রী অরবিন্দ বরোদার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। এরই মধ্যে 1901 খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় এসে সিংহলের একজন উচ্চপদস্থ বিলাত ফেরত সরকারী কর্মকর্তা ভূপাল চন্দ্র বসুর কন্যা 14 বছর বয়সী মৃণালিনী দেবীকে বিয়ে করেন। মৃণালিনী দেবী তখন ক্যালকাটা ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে পড়তেন। মৃণালিনীর বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিরিশ চন্দ্র বোস কোলকাতায় মৃণালিনীকে দেখাশোনা করতেন। গিরিশ চন্দ্র বোসই শ্রী অরবিন্দের সাথে মৃণালিনীর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। শ্রী অরবিন্দের বয়স তখন 28 বছর। হিন্দু নিয়মে মৃণালিনী দেবীর সাথে শ্রী অরবিন্দের বিবাহ হয়। বিয়েতে জগদীশ চন্দ্র বোস, লর্ড সিন্হা প্রভৃতি বিখ্যাত মানুষ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শ্রী অরবিন্দের পিতৃকূল ও মাতৃকুলের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। কারণ তাঁর মাতৃকুলের পরিবার ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের। মৃণালিনী দেবীর বিবাহিত জীবনের 17 বছর প্রায় একাকীত্বেই কাটে। যদিও শ্রী অরবিন্দ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে প্রথমের দিকে দেওঘরে মামা বাড়িতে ছিলেন কিছুদিন। তারপর তাঁরা নৈনিতাল ও বরোদায় ছিলেন। এক বছর পর মৃণালিনী তাঁর পিতার কাছে থাকতেন ও মাঝে মধ্যে বরোদায় শ্রী অরবিন্দের কাছে আসতেন। কখনও কখনও তিনি শ্রী অরবিন্দের মামাবাড়ি দেওঘরে থাকতেন। 1906 খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বরোদা ত্যাগ করেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং পরবর্তীতে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন। মৃণালিনী দেবীর বাকি জীবনে কদাচিত শ্রী অরবিন্দের সাথে দেখা হয়েছিল। 17 বছর বিবাহিত জীবনের পর 1918 খ্রিস্টাব্দের 17 ডিসেম্বর মৃণালিনী দেবী 31 বছর বয়সে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে মারা যান।

5.3.2 শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা (Education of Sri Aurobindo)

শ্রী অরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ অরবিন্দ ও তাঁর দুই দাদাকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর জন্য দার্জিলিং-এর লরেটো হাউস বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। দার্জিলিং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের একটা কেন্দ্র ছিল এবং স্কুলটি আইরিস নানদের দ্বারা পরিচালিত হত, যার ফলে শ্রী অরবিন্দ ও তাঁর দুই দাদা খ্রিস্টান ধর্মীয় শিক্ষার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। তবে সেখানে বেশিদিন পড়াশুনা করেন নি। অরবিন্দের পিতা

চেয়েছিলেন, তাঁর ছেলেরা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করুক এবং এই কারণে তাঁর ছেলেদেরকে ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করানোর জন্য তিন ছেলে সহ পুরো পরিবার 1879 খ্রিস্টাব্দে সেখানে চলে যান। তখন অরবিন্দের বয়স মাত্র 7 বছর। ভাল ইংরেজী স্কুলে ভর্তির জন্য একটা পূর্বশর্ত ছিল লাতিন ভাষা জানা। অরবিন্দের পিতার পূর্বপরিচিত রেভারেন্ড ডব্লিউ এইচ ড্রুয়েটের তত্ত্বাবধানে তিন পুত্রকে রেখেছিলেন। ড্রুয়েট এবং তার স্ত্রী তাঁদের লাতিন ভাষা শিখিয়েছিলেন। দুই বছর পর 1881 খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ এবং তাঁর দুই দাদা ম্যানচেস্টার গ্রামার স্কুলে ভর্তি হন। অরবিন্দ ড্রুয়েটসের কাছে ইতিহাস, ফরাসি, ভূগোল ও পাটিগণিত শিখেছিলেন। ড্রুয়েটসকে বলা হয়েছিল ধর্ম না শেখানোর জন্য। কিন্তু ছেলেরা অবশ্যম্ভাবীভাবে খ্রিস্টান ধর্ম শিখেছিলেন, যাতে অরবিন্দ বিরক্ত বোধ করেছিলেন। 1884 খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দ ও দাদা মনমোহন সেন্টপল্‌স্ স্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি গ্রীক, লাতিন এবং শেষ তিন বছর ইংরেজি কবিতা অধ্যয়ন করেন। 1889 খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কিংস কলেজের বৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করেন এবং কিংস কলেজে দুই বছর অধ্যয়ন করেন। শ্রী অরবিন্দের পিতা চেয়েছিলেন, ছেলেরা সম্মানসূচক ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করবেন। কিন্তু একমাত্র শ্রী অরবিন্দই তাঁর পিতার ইচ্ছে পূরণ করতে পেরেছিলেন। আই সি এস কর্মকর্তা হওয়ার জন্য ছাত্রদেরকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করতে হত এবং ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছর অধ্যয়নের অভিজ্ঞতাও প্রয়োজন ছিল। শ্রী অরবিন্দ 1891 খ্রিস্টাব্দে আই সি এস এর লিখিত পরীক্ষায় 250 জন প্রতিযোগীর মধ্যে 11তম স্থান অধিকার করেন। অতপর দুই বছর প্রবেশনের শেষে ICS পরীক্ষার অংশ হিসেবে অশ্বারোহণ পরীক্ষায় হাজির না হয়ে অকৃতকার্য হন, কারণ তিনি নিশ্চিত হন যে ব্রিটিশদের সেবা করার ইচ্ছে তার নেই। 1893 খ্রিস্টাব্দে তিনি ফিরে আসেন।

5.3.3 শ্রী অরবিন্দের কর্মজীবন (Service Life of Sri Aurobindo)

1893 খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ বিলেত থেকে দেশে ফিরে গুজরাতের বরোদায় স্টেট সার্ভিস এন্ড সেটলমেন্ট বিভাগে চাকুরীতে যোগ দেন। পরে তিনি রাজস্ববিভাগে এবং তারপর সচিবালয়ে চাকুরী করেন। গায়কোয়াড়ের মহারাজার জন্য ব্যাকরণ শেখানো ও বক্তৃতা লেখায় সহায়তা করার মত কাজও শ্রী অরবিন্দ 1897 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত করেন। পরে তাঁর দক্ষতা ও পারদর্শিতার জন্য তাঁকে বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করা হয়। শ্রী অরবিন্দ প্রায়শই বরোদা থেকে বাংলায় আসতেন এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। প্রেসিডেন্সি জুড়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে শ্রী অরবিন্দ তার সাথেও সংযোগ রক্ষা করতেন। 1906 খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পরই তিনি বরোদা ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। ঐ বছরই তিনি মাত্র 34 বছর বয়সে কলকাতার বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ও ভারতীয় যুবকদের জাতীয় শিক্ষা দিতে শুরু করেন। বেঙ্গাল ন্যাশানাল কলেজটি পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। শ্রী অরবিন্দ ভারতের স্বাধীনতা সংগামে সরাসরি অংশগ্রহণ জন্য 1907 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করেন ও তাঁর 14 বছরের কর্মজীবন সমাপ্ত হয়।

5.4 শ্রী অরবিন্দের জীবন দর্শন (Sri Aurobindo's Philosophy of Life)

5.4.1 শ্রী অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন (Political Life of Sri Aurobindo)

শ্রী অরবিন্দের বরোদায় 13 বছর কর্মজীবনের শেষের দিকের একটি বড় অংশ ছুটিতে থাকাকালীন নীরবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সংযুক্ত করেছিলেন। বেঙ্গাল ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করে তিনি প্রত্যক্ষভাবে 1906 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি জাতীয়তাবাদী দলের একজন নেতা হয়ে ওঠেন এবং দৈনিক বন্দে মাতরম পত্রিকায় তাঁর সম্পদকীয়গুলি তাঁকে সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। চার বছরেরও কম সময়ে তিনি কংগ্রেস পার্টির মধ্যপন্থী ও অকার্যকার অবস্থানে বিপ্লব ঘটান, জাতীয় চেতনায় পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য স্থির করেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে একটি নতুন দিক নির্দেশনা দেন। ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য এবং 1908 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে একটি বোমা বিস্ফোরণে দুইজন ব্রিটিশ মহিলার মৃত্যুতে তাঁকে সন্দেহবশতঃ আলিপুর জেলে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। 1909 খ্রিস্টাব্দের 6 মে পর্যন্ত এক বছর তিনি কারাবরণ করেন। পুলিশের সন্দেহ ছিল যে, ক্রমবর্ধমান সহিংসতার পিছনে তাঁর মস্তিষ্ক ছিল। সহিংস কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার প্রমাণের অভাবে তিনি খালাস পান। শ্রী অরবিন্দ তাঁর গ্রেপ্তার এবং বছর ব্যাপী কারাবাসকে তাঁর অভ্যন্তরীণ ও অধ্যাত্মিক সাধনায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা আরোপিত সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি কলকাতায় আরও কিছুদিন ছিলেন। তিনি এতক্ষণে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা কেবল সময়ের অপেক্ষা। এরপর তিনি আধ্যাত্মিক জগতে মনোনিবেশ করেন।

5.4.2 শ্রী অরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবন (Spiritual Life of Sri Aurobindo)

1908 খ্রিস্টাব্দে এক বোমা বিস্ফোরণে ব্যারিস্টার প্রিঙ্গাল কেনেডির স্ত্রী এবং কন্যা এই দুই ব্রিটিশ মহিলার মৃত্যু হওয়ার সন্দেহবশত শ্রী অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এক বছরকাল তিনি আলিপুর জেলে নির্জন কারাগারে বন্দী ছিলেন। ঐ সময় কারাবাসের সময়কালে তাঁর অদ্ভুত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কারণে জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়। শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন যে, আলিপুর জেলে ধ্যানের মধ্যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন এবং বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন।

1910 খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন এবং চন্দননগরে মতিলাল রায়ের বাড়িতে আত্মগোপন করেন। ঐ বছরেই তিনি পণ্ডিচেরি চলে যান। সেখানে তিনি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। চার বছর নির্জন যোগসাধনার পর 1914 খ্রিস্টাব্দে তিনি "আর্য" নামে একটি মাসিক দার্শনিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। 1921 খ্রিস্টাব্দে ঐ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রকাশনা থেকে উদ্ভূত কয়েকটি বইয়ের সিরিজ হল দ্য লাইফ ডিভাইন,

দ্য সিক্রেট অফ দ্য বেদ, হিমস্ টু দ্য মিস্টিক ফায়ার, যুদ্ধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ, দ্য হিউম্যান সাইক্‌ল্, দ্য আইডিয়াল অফ হিউম্যান ইউনিটি, ইত্যাদি।

পণ্ডিচেরিতে তাঁর অবস্থানের প্রথম দিকে কম অনুসারী ছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, যার ফলে 1926 খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ আশ্রম গঠিত হয়। ঐ বছর থেকেই তিনি নিজেকে শ্রী অরবিন্দ হিসেবে স্বাক্ষর করতে শুরু করেন। তখন থেকে শুরু করে 1930-এর দশকে তাঁর শিষ্যদের কাছে লেখা কয়েক হাজার চিঠিতে তাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের উপদেশ পাওয়া যায়। 1930-এর দশকের শেষের দিকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হল প্রায় 24,000 লাইনের একটি আধ্যাত্মিক মহাকাব্য, 'সাবিত্রী'।

শ্রী অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সহযোগী, মিররা আলকাসা দ্য মাদার (মা) নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন একজন ফরাসি নাগরিক, যিনি 1878 খ্রিস্টাব্দের 21 ফেব্রুয়ারী প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রী অরবিন্দ তাঁকে আধ্যাত্মিক সমকক্ষ এবং সহযোগী বলে মনে করেন। 1926 খ্রিস্টাব্দের 24 নভেম্বর শ্রী অরবিন্দ যখন নির্জনে অবসর গ্রহণ করেন, তখন তিনি আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব মায়ের উপর ন্যস্ত করেন।

শ্রী অরবিন্দের অখণ্ড যোগের ধারণা তাঁর বই 'যোগের সংশ্লেষণ' এবং 'দ্য লাইফ ডিভাইন' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। শ্রী অরবিন্দ যুক্তি দেন যে, ঐশ্বরিক ব্রহ্মলীলা বা ঐশ্বরিক খেলার মাধ্যমে অভিজ্ঞতামূলক বাস্তবতা প্রকাশ পায়। শ্রী অরবিন্দের মতে বিশ্ব বিবর্তিত হতে পারে এবং মানব প্রজাতির থেকে উন্নত নতুন প্রজাতি নতুন বিশ্বে সৃষ্টি হতে পারে। শ্রী অরবিন্দের মেটাফিজিকাল তন্ত্রের কেন্দ্রে রয়েছে 'সুপারমাইন্ড' বা অপ্রকাশিত ব্রহ্ম, যা উদ্ভাসিত বিশ্বের মধ্যে একটি মধ্যস্থতাকারী শক্তি।

শ্রী অরবিন্দ 1950 খ্রিস্টাব্দের 5 ডিসেম্বর ইউরেমিয়া রোগে মারা যান। প্রায় 60,000 মানুষ তাঁর শেষকৃত্যে উপস্থিত হয়েছিল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

5.5 শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন (Educational Philosophy of Sri Aurobindo)

5.5.1 শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠক্রম (Aims of Education and Curriculum)

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ তাঁর সময়ের প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি মনে করেন যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে যা শিশুদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা ও জাতির চাহিদা অনুসারে নয়। শ্রী অরবিন্দের মতে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি হলো—

(i) **শারীরিক উন্নয়ন ও বিশুদ্ধতা :** শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হলো একটি শিশুর সম্পূর্ণ শারীরিক ও বিশুদ্ধ বিকাশ অর্জন করা। দৈহিক বিকাশ ও পরিশোধন হলো দুটি ভিত্তি যা আধ্যাত্মিক বিকাশের ভিত্তি তৈরী করে।

(ii) **ইন্দ্রিয়ের উন্নয়ন :** শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো শ্রবণ, কথা বলা এবং শোনা, স্পর্শ করা, সুগন্ধি এবং স্বাদ গ্রহণ করা প্রভৃতির জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রশিক্ষণ করা। শ্রী অরবিন্দের মতে স্নায়ু ও মন বিশুদ্ধ হলে ইন্দ্রিয়গুলিও সম্পূর্ণরূপে প্রশিক্ষিত হতে পারে।

(iii) **মানসিক উন্নয়ন :** শিক্ষার তৃতীয় লক্ষ্য হলো শিশুর মানসিক বিকাশ অর্জন করা। মানসিক বিকাশের অর্থ হলো সকল প্রকার মানসিক অনুষঙ্গের যেমন স্মরণ, চিন্তন, যুক্তি, কল্পনা এবং গ্রহণযোগ্য বৈষম্যের বিকাশ।

(iv) **নৈতিকতার উন্নয়ন :** শ্রী অরবিন্দের মতে নৈতিক ও মানসিক বিকাশ ছাড়া মানব অগ্রগতি সম্ভব নয়। শিশুর আবেগ, অভ্যাস এবং প্রকৃতি নৈতিক বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষকের আদর্শ এত উচ্চতর হওয়া উচিত যাতে শিশু কেবলমাত্র তাঁর অনুকরণের মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

(v) **বিবেকের বিকাশ :** শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো বিবেকের বিকাশ ঘটানো। তাঁর মতে শিক্ষক শিশুর চিত্ত, মানস, অনুসন্ধান ও জ্ঞান—এই চার প্রকার স্তরের সমন্বিত বিকাশ সাধনের জন্য সচেষ্ট হবেন।

(vi) **আধ্যাত্মিক উন্নয়ন :** শ্রী অরবিন্দ জোর দিয়েছিলেন যে, শিক্ষার মূল লক্ষ্য শিশুর আধ্যাত্মিক বিকাশে উৎসাহিত করা। তাঁর মতে—"শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ক্রমবিকশিত আত্মাকে এমনভাবে তৈরী করতে সাহায্য করা যে, এটি সর্বোত্তম এবং একটি মহৎ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত হয়।"

(vii) **পাঠক্রম (Curriculum) :** শ্রী অরবিন্দ পাঠক্রমে ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও দর্শনের সাথে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি পাঠক্রমে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও গণিতের সাথে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যকেও অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন।

5.5.2 মূল্যবোধের শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং শরীর শিক্ষা (Value Education, Education through Mother tongue and Physical Education)

মূল্যবোধের শিক্ষা (Value Education) : সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে চলেছে। ক্রমশঃ পুরোনো মূল্যবোধগুলি নতুন মূল্যবোধ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। শ্রী অরবিন্দের মত সর্বাপেক্ষা উচ্চ মূল্যবোধ হলো ঐক্য। ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলির চর্চার মাধ্যমে এদের বিকাশ সাধন প্রয়োজন। সবচেয়ে উচ্চতর মূল্যবোধ হলো সাধুতা। শ্রী অরবিন্দের মতে, শিক্ষার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা (Education through mother tongue) : শ্রী অরবিন্দ মাতৃভাষার

মাধ্যমে শিক্ষাদানকে প্রকৃত শিক্ষা বলে মনে করতেন। তাঁর মতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ হলেই অন্যভাষা শিক্ষার প্রশ্ন আসে। এই বিষয়টি সেই সময়কার শিক্ষা জগতের সকল দার্শনিকরা গ্রহণ করেছিলেন।

শারীর শিক্ষা (Physical Education) : শ্রী অরবিন্দ শারীর শিক্ষার উপরন্তু গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে সুস্থ দেহ সুস্থ মনের পরিচায়ক। তাঁর এই ধারণা তাঁর "The Supramental Manifestation" নামক গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা শরীরটিকে সার্থক জীবনের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। এর জন্যে তিনি নিয়মিত আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম ও খেলাধূলা করার কথা বলেছেন।

5.5.3 শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা (Teaching Method and Role of Teachers)

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দ তাঁর পুস্তকে "A system of National Education"-এ তিনটি মূলনীতির কথা বলেছেন—

(i) প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছুই শেখানো যায় না। তিনি বিবেকানন্দের মতোই শিক্ষকের সহায়কের ভূমিকায় গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে যে ঈশ্বরের অংশ আছে তাকে উদ্দীপ্ত করাই শিক্ষকের কাজ।

(ii) মানবমনকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে, কোন কিছুই তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। শিশুকে তার ভেতর থেকে উদ্দীপ্ত করতে হবে। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে তার ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(iii) শিক্ষণের তৃতীয় নীতি হলো শিক্ষার্থীকে নিকট থেকে দূরে, অর্থাৎ জানা থেকে অজানায় নিয়ে যেতেই হবে। অর্থ অভিজ্ঞতাই হবে শিখনের ভিত্তি। পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে ঘিরেই শিক্ষর্থী নতুন জ্ঞান অর্জন করবে। এই নীতি শিক্ষণ-শিখনে শ্রবণ, দর্শন ও শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার সমর্থন করে।

5.6 সারাংশ (Summary)

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ 1872 খ্রিস্টাব্দের 15 আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রী অর্জনকারী শ্রী কৃষ্ণধন ঘোষ এবং তাঁর মাতা ছিলেন তদানিন্তন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতা দেবী। শ্রী অরবিন্দের দুই দাদা বিনয়ভূষণ ও মনমোহন, ছোটো বোন সরজীনী এবং ছোট ভাই বারীন্দ্র কুমার। শ্রী অরবিন্দের পিতা তাঁকে তার দুই দাদাসহ তার পাঁচ বছর বয়সে দার্জিলিঙে কনভেন্ট স্কুলে পাঠিয়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষার জন্য। ছেলেদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করতে শ্রী অরবিন্দকে 1879

খ্রিস্টাব্দে মাত্র 7 বছর বয়সে তার দুই দাদাসহ সপরিবারে লন্ডনে পাঠান। সেখানে দুটি স্কুলে এবং পরে কিংস কলেজে পড়াশুনা করেন। শ্রী অরবিন্দের পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি ICS পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। 250 জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শ্রী অরবিন্দ 11তম স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু অশ্বারোহনের ব্যবহারিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অকৃতকার্য হয়েছিলেন। কারণ তিনি ICS পরীক্ষায় পাশ করে ব্রিটিশ সরকারের অধীন কর্মচারী হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন।

1893 খ্রিস্টাব্দে 21 বছর বয়সে তিনি ভারতে ফিরে এসে বরদায় শ্রী অরবিন্দ প্রথমে রাজস্ব বিভাগে এবং পরে সচিবালয়ে চাকুরী করেন। পরে তিনি বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ হন। ইতিমধ্যেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি উদ্বুদ্ধ হন এবং মাঝে মধ্যে কলকাতায় যাওয়া-আসা করতেন। 1901 খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ 28 বছর বয়সে কলকাতার বিলেত ফেরত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ভূপাল চন্দ্র বসুর কন্যা 14 বছরের মৃণালিনী দেবীকে বিয়ে করেন। প্রথম দিকে মৃণালিনী দেবী শ্রী অরবিন্দের সাথে কিছুদিন বরোদায় ছিলেন। তারপরই শুরু মৃণালিনী দেবীর একাকীত্বে থাকা। তিনি প্রায়ই শ্রী অরবিন্দের মামার বাড়ী ও নিজের পিতৃলয়ে কাটাতেন। 1906 খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ বরোদা ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন এবং মাত্র 34 বছর বয়সে বেঙ্গাল ন্যাশনাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। পরবর্তীতে ঐ কলেজটি বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। 1907 খ্রিস্টাব্দে তিনি অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং তাঁর 14 বছরের কর্মজীবন শেষ হয়। তিনি তারপর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করেন। 1908 খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় দুইজন ব্রিটিশ মহিলা বোমা বিস্ফোরণে মারা যায়। সন্দেহবশত পুলিশ শ্রী অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে। এক বছর আলিপুর জেলে নির্জন কারাবাসের পর প্রমাণের অভাবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

একবছর জেলে থাকা অবস্থায় তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘটে এবং জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হয়। তিনি 1910 খ্রিস্টাব্দে সবকিছু ত্যাগ করে পণ্ডিচেরী চলে যান এবং অধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী 17 বছরের বিবাহিত জীবনের পর 1918 খ্রিস্টাব্দে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে মারা যান।

1926 খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে "অরবিন্দ আশ্রম" গঠন করেন এবং তাঁর অগণিত অনুসারীদের উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা গড়ে তোলার জন্য শ্রী অরবিন্দ অনেক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রী অরবিন্দ যখন নির্জনে অবসর নিতে চাইলেন, তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সহযোগী ফরাসী নাগরিক মিররা আলফাসা দ্য মাদার বা 'মা'-এর উপর অরবিন্দ আশ্রম পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব অর্পন করেন। শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা দর্শনের মূল বিষয় হলো শিশুর শারীরিক, মানষিক ও নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করা। শ্রী অরবিন্দ 1950 খ্রিস্টাব্দের 5 ডিসেম্বর ইউরেমিয়া রোগে মারা যান।

5.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. শ্রী অরবিন্দের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
2. শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
3. শ্রী অরবিন্দের কর্ম জীবনের পরিচয় দিন।
4. শ্রী অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় দিন।
5. শ্রী অরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
6. শ্রী অরবিন্দের মতানুসারে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি কী কী?
7. শ্রী অরবিন্দের মতানুসারে পাঠক্রম, মূল্যবোধের শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও শারীরশিক্ষার পরিচয় দিন।
8. শ্রী অরবিন্দের মতানুসারে শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?

5.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- Sri Aurobindo, Wikipedia, https://en. wikipedia.org. Retrieved on 20.03.2024
- অরবিন্দ ঘোষ উইকিপিডিয়া, https://bn.m.wikipedia.org Retrieved on 21.03.2024
- শ্রী অরবিন্দ : জীবনী ও তথ্য, Britannica, https://www.britanica.com. Retrieved on 22.03.2024
- শ্রী অরবিন্দ (1908), https://parthasarthipatrika.com, Retrieved on 23.03.2024
- 150th Birth Anniversary of Sri Aurobindo : অরবিন্দ অ্যাক্রয়েড ঘোষ থেকে শ্রী অরবিন্দ : এক অনন্য আলোকমাত্রা, zeenews.inotia.com, Retrieved on 24.03.2024
- শ্রী অরবিন্দ ঘোষের শিক্ষাদর্শন, https://m.facebook.com, Retrieved on 25.03.2024
- Sri Aurobindo : The story of His life (1972) (adapted from the Gujarati Sri Arobindayan), Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry.

একক 6 ❑ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (Sarvepalli Radhakrishnan)

গঠন

6.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

6.2 ভূমিকা (Introduction)

6.3 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা জীবন (Family Life, Education Life of Sarvepalli Radhakrishnan)

6.3.1 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের পারিবারিক জীবন (Family Life of Sarvepalli Radhakrishnan)

6.3.2 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের শিক্ষা জীবন (Education of Sarvepalli Radhakrishnan)

6.4 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কর্মজীবন ও রাজনৈতিক জীবন (Service Life and Political Life of Sarvepalli Radhakrishnan)

6.4.1 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কর্মজীবন (Service of Sarvepalli Radhakrishnan)

6.4.2 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের রাজনৈতিক জীবন (Political Life of Sarvepalli Radhakrishnan)

6.5 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দর্শন ও শিক্ষাচিন্তা (Philosophy and Educational Thoughts of Sarvepalli Radhakrishnan)

6.5.1 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের দর্শন (Philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan)

6.5.2 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের শিক্ষাচিন্তা (Educational Thoughts of Sarvepalli Radhakrishnan)

6.6 সারাংশ (Summary)

6.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

6.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

6.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের শিক্ষা জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কর্মজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দর্শন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

6.2 ভূমিকা (Introduction)

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি একজন মহান দার্শনিক ও আদর্শ শিক্ষক। তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর কারণে ভারত সরকার 1954 খ্রিস্টাব্দে তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান "ভারতরত্ন" দিয়ে সম্মানিত করে। এই মহান ব্যক্তিত্বের জন্মদিন 5 সেপ্টেম্বর সারা দেশে "শিক্ষক দিবস" হিসেবে পালিত হয়। তিনি দার্শনিক হিসেবে পাশ্চাত্য আদর্শবাদী দার্শনিকদের চিন্তাকে ভারতীয় চিন্তায় প্রবর্তন করেছিলেন।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তামিলনাড়ুর তিরুত্তানি গ্রামে (মাদ্রাজ) ব্রাহ্মণ পরিবারে 1888 খ্রিস্টাব্দের 5 সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা সর্বপল্লী নামের একটি শহরে বাস করতেন। তাই তাঁর পরিবারের সমস্ত সদস্য তাদের নামের আগে সর্বপল্লী কথাটি ব্যবহার করতেন।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন হিন্দু দর্শনের উপর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতাগুলিকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তীক্ষ্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে ভারতীয় দর্শন পাশ্চাত্য দর্শন থেকে কোন অংশে কম নয়। বিশ্বের দরবারে তিনি জনপ্রিয় দার্শনিক অধ্যাপক হিসেবে পরিচিত হন। 1931 খ্রিস্টাব্দে তাঁকে British Knighthood-এ সম্মানিত করা হয়।

1975 খ্রিস্টাব্দের 17 এপ্রিল ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মৃত্যু হয়।

6.3 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের পারিবাকি জীবন ও শিক্ষা জীবন (Family Life, Education Life of Sarvepalli Radhakrishnan)

6.3.1 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের পারিবারিক জীবন (Family Life of Sarvepalli Radhakrishnan)

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 1888 খ্রিস্টাব্দের 5 সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর তিরুত্তানি গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সর্বপল্লী বীরস্বামী এবং মাতার নাম সীতাম্মা। তাঁর পূর্বপুরুষেরা 'সর্বপল্লী' নামে একটি গ্রামে বাস করতেন। তাই তাঁদের পরিবারের সমস্ত সদস্য নামের আগে সর্বপল্লী কথাটি ব্যবহার করতেন। রাধাকৃষ্ণনের চার ভাই ও এক বোন ছিলেন।

ষোল বছর বয়সে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন দশ বছর বয়সের শিবকামুকে বিয়ে করেন। তাঁদের বিবাহিত জীবন 53 বছরেরও বেশি সময় ধরে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শান্তিতে কাটে। তাঁদের পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে ছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে তাঁর ছেলে সর্বপল্লী গোপাল একজন বিখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসবিদ এবং লেখক হয়ে ওঠেন, যিনি পিতা রাধাকৃষ্ণনের এবং জহরলাল নেহেরু জীবনী লেখার জন্য সুপরচিত ছিলেন। তাঁর পাঁচ কন্যার নাম ছিল পদ্মাবতী, রুক্মিণী, সুশীলা, সুন্দরী এবং শকুন্তলা। রাধাকৃষ্ণনের অনেক নাতি-নাতনিসহ পরিবারের সদস্যরা সারা বিশ্বে একাডেমিয়া, পাবলিক পলিসি, মেডিসিন, আইন, ব্যাঙ্কিং, প্রকাশনা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর স্ত্রী শিবকামু দেবী 1956 খ্রিস্টাব্দের 26 নভেম্বর মারা যান। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি, দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি এবং দেশে ও বিদেশে অধ্যাপক, উপাচার্য, রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে 1975 খ্রিস্টাব্দের 17 এপ্রিল 86 বছর বয়সে মারা যান।

6.3.2 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের শিক্ষা জীবন (Education of Sarvepalli Radhakrishnan)

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তিরুত্তানির কে.ভি. হাইস্কুল, তিরুপতির হারম্যানসবার্গ ইভানজেলিকাল লুথেরান মিশন স্কুল এবং ওয়ালজাপেটের সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। রাধাকৃষ্ণন তাঁর শিক্ষাজীবন জুড়ে বৃত্তি পেয়েছিলেন। রাধাকৃষ্ণন ভেলোরের ভুরহিস কলেজ থেকে এফ.এ. (ফার্স্টস আর্টস) পাশ করার পর 16 বছর বয়সে মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে 1907 খ্রিস্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং একই কলেজ থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও অর্জন করেন।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর স্নাতকের অংশ হিসেবে থিসিস লিখেছিলেন "বেদান্তের নীতিশাস্ত্র এবং তার অধিবিদ্যাগত অনুমান" (The Ethics of the Vedanta and its Metaphisical Presuppositions) এর উপর। তাঁর দুইজন অধ্যাপক রেভারেন্ড উইলিয়াম মেস্টন এবং ডঃ আলফ্রেড জর্জ হগ তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রশাংসা করেছিলেন। তাঁর থিসিস প্রকাশিত হয়েছিল, যখন তাঁর বয়স মাত্র 20 বছর। এই ঘটনা তাঁকে ভারতীয় দর্শন এবং ধর্মের সমালোচনামূলক অধ্যয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একই সময়ে রাধাকৃষ্ণন প্রফেসর হগকে "আমার বিশিষ্ট শিক্ষক" এবং "ভারতে আমাদের শ্রেষ্ঠ খ্রিস্টান চিন্তাবিদদের একজন" বলে প্রশংসা করেন। তাছাড়াও প্রফেসর উইলিয়াম স্কিনার, যিনি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি একটি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন যে, "সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের পাওয়া সেরা পুরুষদের মধ্যে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একজন", যা তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম চাকুরী পেতে সাহায্য করেছিল। প্রতিদান হিসেবে, রাধাকৃষ্ণন তাঁর প্রথম বইগুলোর মধ্যে একটি উইলিয়াম স্কিনারকে উৎসর্গ করেন।

6.4 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কর্মজীবন ও রাজনৈতিক জীবন (Service Life and Political Life of Sarvepalli Radhakrishnan)

6.4.1 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কর্মজীবন (Service Life of Sarvepalli Radhakrishnan)

1909 খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাত্র 20 বছর বয়সে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। তারপর 1918 খ্রিস্টাব্দে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে মহীশূর মহারাজা কলেজে অধ্যাপনা করেন। সেই সময়ের মধ্যে তিনি The Quest, Journal of Philosophy এবং International Journal of Ethics-এর মতো বিখ্যাত জার্নালগুলির জন্য অনেক নিবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম বই "The Philosophy of Rabindranath Tagore" লেখাও ঐ সময় শেষ করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শনকে "ভারতীয় চেতনার প্রকৃত প্রকাশ" বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর দ্বিতীয় বই "The Reign of Religion in Contemporary Philosophy" 1920 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

1921 খ্রিস্টাব্দে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসিক ও নৈতিক বিজ্ঞানের রাজা পঞ্চম জর্জ চেয়ারে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি 1926 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কংগ্রেসে এবং ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। ঐ সময়ে তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল জীবনের আদর্শ-এর উপর "হিবার্ট বক্তৃতা" দেওয়ার আমন্ত্রণ। তিনি 1929 খ্রিস্টাব্দে 'জীবন' সম্পর্কে অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজে বক্তৃতা দেন যা পরবর্তীকালে একটি 'আদর্শবাদী জীবন' (An Idealist view of Life) হিসেবে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

1929 খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণনকে ম্যানচেস্টার কলেজে অধ্যক্ষ J. Estlim Carpenter-এর শূন্যপদে নিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এটি তাঁকে তুলনামূলক ধর্মের উপর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা করার সুযোগ দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে 1931 খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্মদিনের সম্মানে পঞ্চম জর্জ কর্তৃক 'নাইট' (Knight) উপাধি দেওয়া হয় এবং 1932 খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারতের গভর্নর জেনারেল, উইলিংডনের আর্ল (Earl of Willingdon) কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে সম্মান প্রদান করা হয়। তিনি ভারতের স্বাধীনতার পর 'নাইট' বা 'স্যার' উপাধি ব্যবহার করা বন্ধ করে দেন, পরিবর্তে 'ডক্টর' উপাধিটি পছন্দ করেন।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 1931 থেকে 1938 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 1936 খ্রিস্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Eastern Religion and Ethics-এর Spalding Professor হিসেবে মনোনীত হন এবং অল্ সোলস কলেজের (All Souls College) ফেলো নির্বাচিত হন। 1939 খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত মদন মোহন মালাভিয়া তাঁকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের

(BHU) উপাচার্য হিসেবে আমন্ত্রণ জানান। তিনি 1948 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী পর্যন্ত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন।

6.4.2 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের রাজনৈতিক জীবন (Political Life of Sarvepalli Radhakrishnan)

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর সফল কর্মজীবনের পর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। 1947 খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীন হলে, তিনি 1952 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউনেস্কোতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। 1949 থেকে 1952 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতের গণপরিষদেও নির্বাচিত হন। রাধাকৃষ্ণন 1952 খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং 1962 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন। 1962 থেকে 1967 খ্রিস্টাব্দ পর্যত তিনি ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন। রাধাকৃষ্ণনের কংগ্রেস পার্টিতে সরাসরি কোন ভূমিকা ছিল না বা তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গর্ব এবং "অজ্ঞাত পশ্চিমা সমালোচনার" বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মের প্রতিরক্ষায় তাঁর প্রেরণা নিহিত ছিল। 1962 খ্রিস্টাব্দে ড. সর্বপল্লী রাধকৃষ্ণন যখন রাষ্ট্রপতি হন, তখন তাঁর কিছু ছাত্র ও বন্ধু তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে তারা 5 সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে চান। তাদের অনুরোধের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

"আমার জন্মদিন পালন না করে 5 সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস" হিসেবে পালন করা হলে তা হবে আমার গর্বের বিষয়। তখন থেকে 5সেপ্টেম্বর ভারতে "শিক্ষক দিবস" হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

6.5 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দর্শন ও শিক্ষাচিন্তা (Philosophy and Educational Thoughts of Sarvepalli Radhakrishnan)

6.5.1 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দর্শন (Philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan)

রাধাকৃষ্ণন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে সেতুবন্ধন করার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু ধর্মকে "অজ্ঞাত পশ্চিমা সমালোচনার" বিরুদ্ধে রক্ষা করেছিলেন। তবে পশ্চিমা দার্শনিক ও চিন্তাধারাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

অদ্বৈত বেদান্ত : রাধাকৃষ্ণন নব্য-বেদান্তের অন্যতম প্রধান মুখপাত্র ছিলেন। তাঁর অধিবিদ্যা অদ্বৈত বেদান্তের উপর ভিত্তি করেছিল, কিন্তু তিনি সমসাময়িক বোঝার জন্য অদ্বৈত বেদান্তের পুনর্ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি অভিজ্ঞতার জগতের বাস্তবতা এবং বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেছেন, যা তিনি পরম ব্রহ্ম দ্বারা সমর্থিত হিসেবে দেখেছিলেন।

অন্তর্দৃষ্টি এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতা : "অন্তর্দৃষ্টি"কে সমার্থকভাবে "ধর্মীয় অভিজ্ঞতা" বলা হয়। অভিজ্ঞতার প্রতি তাঁর সুনির্দিষ্ট আগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় খুঁজে পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণনের মতে "অন্তর্দৃষ্টি" হল একটি স্ব-প্রমাণ মুক্ত চরিত্র (স্বতসিদ্ধ), স্ব-প্রমাণকারী চরিত্র (স্বসমবেদ্য) এবং

স্ব-উজ্জ্বল (স্বয়ম প্রকাশ)। তাঁর বই "An Idealist View of Life"-এ তিনি সম্পূর্ণ রূপে বুদ্ধিবিত্তিক চিন্তাধারার বিপরীতে স্বজ্ঞাত চিন্তার গুরুত্বের জন্য একটি শক্তিশালী ধারণা তৈরী করেছেন। রাধাকৃষ্ণনের মতে, সমস্ত ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। রাধাকৃষ্ণন আট ধরনের অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন : (1) জ্ঞানীয় অভিজ্ঞতা (2) অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা (3) আলোচনামূলক অভিজ্ঞতা (4) স্বজ্ঞাত আশংকা (5) মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা (6) নান্দনৈতিক অভিজ্ঞতা (7) নৈতিক অভিজ্ঞতা (8) ধর্মীয় অভিজ্ঞতা।

রাধাকৃষ্ণন হিন্দুধর্মকে সত্যের ভিত্তিতে একটি বৈজ্ঞানিক ধর্ম হিসেবে দেখেছিলেন, যা অন্তর্দৃষ্টি বা ধর্মীয় অভিজ্ঞতর মাধ্যমে ধরা হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণনের মতে, "যদি ধর্মের দর্শনকে বৈজ্ঞানিক হতে হয়, তবে তা অবশ্যই অভিজ্ঞতামূলক হয়ে উঠতে হবে এবং নিজেকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে খুঁজে পেতে হবে"।

রাধাকৃষ্ণনের কাছে, অদ্বৈত বেদান্ত হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং ইহা প্রত্যক্ষ স্বজ্ঞাত অভিজ্ঞতা ও অভ্যন্তরীণ উপলব্ধি প্রদান করে যা বেদান্তকে সর্বোচ্চ রূপ দেয়। যদিও রাধাকৃষ্ণন পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং দর্শনের সাথে ভালভাবে পরিচিত ছিলেন, তবে তিনি তাদের সমালোচনাও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে পশ্চিমা দার্শনিকরা, বস্তু নিষ্ঠতার সমস্ত দাবি সত্বেও, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধর্মতাত্ত্বিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। পশ্চিমা বিশ্বে হিন্দু ঐতিহ্যের রাধাকৃষ্ণনের ব্যাখ্যা এবং "আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা"-এর উপর জোর দেওয়া, হিন্দু ধর্মকে পশ্চিমা শ্রোতাদের জন্য আরও সহজলভ্য করে তোলে এবং আধুনিক আধ্যাত্মিকতার উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব স্বীকৃত হয়।

6.5.2 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের শিক্ষাচিন্তা (Educational thought of Sarvepalli Radhakrishnan)

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতে শিক্ষা এবং দর্শন পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কিত। রাধাকৃষ্ণনের শিক্ষাচিন্তার বিভিন্ন দিক নিম্নরূপ :

- **শিক্ষার লক্ষ্য :** শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেন—

(i) শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন, যার ফলে ব্যক্তি ও সমাজের উভয়ের কল্যাণ সাধন সম্ভবপর হয়।

(ii) শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য, শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্ম সংযমের বিকাশ সাধন করা, অর্থাৎ ধৈর্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের বিকাশে সহায়তা করা।

(iii) শিক্ষার লক্ষ্য হবে স্বাধীনতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকে বিকশিত করে।

- **পাঠক্রম :** পাঠক্রম সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন গুরুত্বপূর্ণ মতামত পোষণ করেন। রাধাকৃষ্ণন শিক্ষার পাঠক্রমকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন :

(i) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : যে বিষয় শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির জ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে।

(ii) সামাজিক বিজ্ঞান : সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল—সমাজবিদ্যা, শিক্ষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি।

(iii) দর্শন, শিল্প ও স্থাপত্য : ইহা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দিক নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিচিতি ঘটে।

(iv) ধর্ম ও নীতিশিক্ষা : রাধাকৃষ্ণন পাঠক্রমের মধ্যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা দান করা প্রয়োজন, তবে ধর্মের গোঁড়ামি একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়।

- **শিক্ষকের ভূমিকা :** রাধাকৃষ্ণন বলেন, শিক্ষক হবেন আদর্শ এবং গুণমান সম্পন্ন। শিক্ষকের ভূমিকা হল সহানুভূতিশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের চাহিদাকে পুরণ করা। তাছাড়া শিক্ষকদের দায়-দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

- **শিক্ষার মাধ্যম :** সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের শিক্ষাদর্শনে শিক্ষার মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন বলেছেন—

(i) বিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠন চলবে। পাশাপাশি ইংরেজির মাধ্যমেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে।

(ii) হিন্দি ভাষার উন্নতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

(iii) উচ্চশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য থাকবে।

- **নারী শিক্ষা :** ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন নারীশিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন—শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের প্রগতি দান করা হলো জাতীয় কর্তব্য। তিনি নারীশিক্ষার জন্য বেশি সংখ্যায় বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করে নারীশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। তাই তিনি "উচ্চশিক্ষা কমিশনের" সুপারিশে নারীশিক্ষা বিস্তারের উপর বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন।

সর্বোপরি বলা যায়, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সুপারিশে তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। উচ্চশিক্ষার বিস্তারে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। তিনি বলেন—ভারতের প্রতিটি

নাগরিক যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার ও ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগ পায়, তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

6.6 সারাংশ (Summary)

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 1888 খ্রিস্টাব্দের 5 সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর তিরুত্তানিতে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্থানীয় জমিদার বাড়িতে স্বল্প বেতনের চাকুরি করতেন। তিনি কখনই চাননি যে তাঁর ছেলে ইংরেজি শিখুক, বরং তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে পূজারি হোক। মেধাবী ছাত্র হওয়ার কারণে জীবনে বহু বৃত্তি পেয়েছিলেন যার সাহায্যে তিনি নিজের পড়াশুনা চালিয়েছিলেন। তিনি মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন এবং ঐ কলেজ থেকেই তিনি দর্শনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। 20 বছর বয়সেই বেদান্ত দর্শনের উপর তাঁর গবেষণা প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণার জন্য তাঁর অধ্যাপক ড. এ. জি. হগ অত্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন।

16 বছর বয়সে দূর সম্পর্কের আত্মীয় শিবকামুকে বিয়ে করেন তিনি। তাঁদের পাঁচ কন্যা এবং একপুত্র ছিলেন। উল্লেখ্য যে তাঁদের পুত্র সর্বপল্লী গোপাল একজন বিখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসবিদ ছিলেন। 1956 খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণনের স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

1909 খ্রিস্টাব্দে মাত্র 20 বছর বয়সে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। এরপর তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থ "The Philosophy of Rabindranath Tagore" লেখেন। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ "The Reign of Religion in Contemporary Philosophy" প্রকাশিত হয় 1920 খ্রিস্টাব্দে। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতার পর 1952 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইউনেস্কোতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। 1949 থেকে 1952 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণন সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। 1952 থেকে 1962 পর্যন্ত তিনি ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন। 1962 থেকে 1967 পর্যন্ত তিনি ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর ছাত্ররা তাঁর জন্মদিন পালন করতে চাইলে তিনি বলেন, "জন্মদিনের পরিবর্তে 5 সেপ্টেম্বর যদি 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয় তবে আমি বিশেষরূপে গর্বিত হব"। তখন থেকে 5 সেপ্টেম্বর ভারতে 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়।

বিশ্বের দরবারে রাধাকৃষ্ণন অতি জনপ্রিয় দার্শনিক অধ্যাপক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দর্শনের মূল বিষয় হল, অদ্বৈত বেদান্ত, অন্তর্দৃষ্টি ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা। 1975 খ্রিস্টাব্দের 17 এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

6.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
2. রাধাকৃষ্ণনের শিক্ষাজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
3. রাধাকৃষ্ণনের কর্ম জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
4. রাধাকৃষ্ণনের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
5. ভারতের জাতীয় শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য্য লিখুন।
6. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দর্শন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
7. রাধাকৃষ্ণনের মতানুসারে শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষকের ভূমিকা, শিক্ষার মাধ্যম এবং নারীশিক্ষা সম্পর্কে লিখুন।

6.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- Sarvepalli Radhakrishnan, Wikipedia, https://en.m. wikipedia.org. Retrieved on 28.03.2024
- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন উইকিপিডিয়া, https://bn.m.wikipedia.org Retrieved on 28.03.2024
- Radhakrishnan, Sarvepalli. Internet Encyclopedia of Philosophy, https://iep.utm.end, Retrieved on 29.03.2024
- Sarvepalli Radhakrishnan, Britannica, https://www.britannica.com, Retrieved on 29.03.2024
- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, Boldsky Bengali, https://bengali.boldsky.com, Retrieved on 30.03.2024
- Sarvepalli Radhakrishnan Biography, Vedantu, https://www/vedemti/com, Retrieved on 30.03.2024
- Sarvepalli Radhakrishnan : The Teacher who became a celebrated icon-know why, Times of India, https://timesofindia.indiatimes.com, Retrieved on 31.03.24.

Module – 3
Western Thinkers–I

একক 7 ❑ জ্যাঁ জ্যাক রুশো (Jean Jacques Rousseau)

গঠন

7.1 উদ্দেশ্য **(Objectives)**

7.2 ভূমিকা **(Introduction)**

7.3 রুশোর পারিবারিক জীবন এবং শিক্ষা ও কর্মজীবন **(Family Life and Education & Service Life of Rousseau)**

7.3.1 রুশোর পারিবারিক জীবন **(Family Life of Rousseau)**

7.3.2 রুশোর শিক্ষা ও কর্মজীবন **(Education & Service Life of Rousseau)**

7.4 রুশোর দর্শন **(Philosophy of Rousseau)**

7.4.1 রুশোর দৃষ্টিতে মানুষ ও সভ্যতা **(Man and Civilization in the Eyes of Rousseau)**

7.4.2 রুশোর দৃষ্টিতে সমাজ ও রাষ্ট্র **(Society and State in the view of Rousseau)**

7.4.3 ফরাসি বিপ্লবে রুশোর অবদান **(Rousseau's Contribution to the French Revolution)**

7.5 রুশোর শিক্ষা চিন্তা **(Educational Thoughts of Rousseau)**

7.5.1 রুশোর শিশুকেন্দ্রিকতা ও শিক্ষাতত্ত্বের মূল নীতি **(Rousseau's Child-centredness and Principles of Education)**

7.5.2 শিক্ষায় রুশোর প্রকৃতিবাদী প্রভাব **(Rousseau's Naturilistic Influence on Education)**

7.5.3 'Emile'-এর শিক্ষার পর্যায় **(Stages of Education of 'Emile')**

7.5.4 শিক্ষায় রুশোর আধুনিকতার প্রভাব **(Influence of Rousseau's Modernism on Education)**

7.5.5 রুশোর নেতিবাচক শিক্ষা **(Negative Education of Rousseau)**

7.6 সারাংশ **(Summary)**

7.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

7.8 গ্রন্থপুঞ্জ **(Bibliography)**

7.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- রুশোর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রুশোর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রুশোর দৃষ্টিতে মানুষ ও সভ্যতার পরিচয় পাবেন।
- রুশোর দৃষ্টিতে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ফরাসি বিপ্লবে রুশোর অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রুশোর শিশুকেন্দ্রিকতা ও শিক্ষাতত্ত্বের মূল নীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শিক্ষায় রুশোর প্রকৃতিবাদী প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- 'Emile'-এর শিক্ষার পর্যায় সম্পর্কে রুশোর মতবাদ জানতে পারবেন।
- শিক্ষায় রুশোর আধুনিকতার প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রুশোর 'নেতিবাচক শিক্ষা' সম্পর্কে জানতে পারবেন।

7.2 ভূমিকা (Introduction)

জ্যাঁ জ্যাক রুশো ফ্রান্সের জেনেভা শহরে 1712 সালে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সময় তাঁর মা মারা যান। তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে বড়ো হন। পিতার কাছ থেকে রোমাঞ্চকর কাহিনি শুনে তার প্রতি রুশোর ঝোঁক দেখা যায়। এই সকল কাহিনী রুশোর মনে বৈপ্লবিক মনোভাব জাগরিত করে। তিনি বসি নামে এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠ নিতে যান। এই বিদ্যালয়ে সামান্যতম অপরাধে তাঁকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হয়। রুশো অভিমানে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে ভবঘুরে জীবন যাপন শুরু করেন। নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা গ্রহণ করতে তিনি পারেননি, কিন্তু তিনি নানা জ্ঞান আহরণের সুযোগ পেয়েছিলেন। মধ্যবয়সে সাহিত্য ও রাজনীতির প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। তিনি এই সময় 'Discourse of Equality' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি 1762 সালে 'The Social Contact' and 'Emile' নামে আরও দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আধুনিক যুগের সফল চিন্তাধারার একটা বলিষ্ঠ প্রকাশনা রুশোর Emile গ্রন্থটি। তাঁকে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের বিশেষভাবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক বলা যেতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের ইতিহাসে যার কীর্তি কাহিনি ভাস্বর হয়ে আছে, যার বিপ্লবী চিন্তাধারা

মানুষের চিন্তাকর্মের জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে মানবসভ্যতাকে নব নব অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে আছে সেই স্বনামধন্য মনীষী হলেন শিক্ষাবিদ রুশো।

7.3 রুশোর পারিবারিক জীবন এবং শিক্ষা ও কর্মজীবন (Family Life and Education & Service Life of Rousseau)

7.3.1 রুশোর পারিবারিক জীবন (Family Life of Rousseau)

জ্যাঁ জ্যাক রুশো 1712 খ্রিস্টাব্দের 28 জুন জেনেভা শহরে (বর্তমানে সুইজারল্যান্ডের একটি ক্যান্টন) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন আইজ্যাক রুশো, যিনি ছিলেন সুশিক্ষিত, সঙ্গীত প্রেমী ও একজন দক্ষ ঘড়ি প্রস্তুতকারক ব্যবসায়ী। রুশোর মা ছিলেন উচ্চবিত্ত পরিবারের সুজান বার্নার্ড রুশো। জ্যাঁ জ্যাক রুশোর জন্মের নয় দিন পর তা মা পিউর্পেরাল জ্বরে (প্রসবোত্তর ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ জনিত জ্বর) মারা যান, যাকে তিনি পরে ''আমার দুর্ভাগ্যের প্রথম'' বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, ''আমি প্রায় মৃত অবস্থায় জন্মেছিলাম, তাঁদের আমাকে বাঁচানোর আশা কম ছিল''। তিনি ও তাঁর বড় ভাই ফ্রাঙ্কোইস তাঁদের পিতা ও পিসীর কাছে বড় হয়েছিলেন।

রুশোর বয়স যখন দশ বছর তাঁর বাবা একজন ধনী জমির মালিকের সাথে আইনি বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। আদালতে নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে তাঁর বাবা বার্ন অঞ্চলে চলে যান এবং আবার বিয়ে করেন। জ্যাঁ জ্যাক রুশোকে তখন তাঁর মামার কাছে রেখেছিলেন। সেই সময় থেকে তিনি তাঁর বাবাকে খুব কমই দেখেছিলেন। 16 বছর বয়সে রুশো বাড়ী থেকে পালিয়ে যান।

রুশো তাঁর কৈশোর ও যৌবনকালে ধর্মীয় চিন্তাদ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ঐ সময়ে তিনি একজন রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন যিনি তাঁকে ফ্রাঙ্কোইস-লুইস ডি ওয়ারেন্সের (Francoise-Louise de Warens) সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তখন ওয়ারেন্সের বয়স 29 বছর। রুশো যখন 20 বছর বয়সে পৌঁছান, ডি ওয়ারেন্সকে তাঁর প্রেমিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। রুশো সর্বদা ডি ওয়ারেন্সকে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম বলে মনে করতেন। 1735 থেকে 1736 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রুশো ও ডি ওয়ারেন্স একসাথে থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে ডি ওয়ারেন্স ছিলেন রুশোর উপপত্নী।

প্যারিসে 1745 খ্রিস্টাব্দে 33 বছরের রুশোর সাথে বন্ধুত্ব হয় 24 বছরের থেরেসে লেভাসিউরের, যিনি রুশোর প্রেমিকা হয়ে ওঠেন। রুশো থেরেসে ও তার মায়ের সাথে একসাথে থাকতেন। তাঁর 'স্বীকারোক্তি'-তে তিনি বলেছেন তাঁদের একটি পুত্র ও চারটি কন্যা সন্তান হয়। কিন্তু তাদের ভরণ পোষণের মত তাঁদের আর্থিক ক্ষমতা ছিল না। তাই সবকটি সন্তানকেই এতিমখানাতে পাঠিয়েছিলেন। রুশো এবং থেরেসে 1768 খ্রিস্টাব্দে বিয়ে করেন।

1778 খ্রিস্টাব্দের 2 জুলাই রুশো 66 বছর বয়সে সেরিব্রাল স্ট্রোকে মারা যান। 1801 খ্রিস্টাব্দে 80 বছর বয়সে থেরেসে লেভাসিউরের মৃত্যু হয়।

7.3.2 রুশোর শিক্ষা ও কর্মজীবন (Education & Service Life of Rousseau)

রুশোর লেখাপড়ার তেমন কোন স্মৃতি ছিল না, কিন্তু তিনি মনে রেখেছিলেন, কিভাবে তাঁর পিতা আইজ্যাক তার বাল্যকাল থেকে শেখানোর জন্য খেয়াল রাখতেন এবং রুশোকে ক্ল্যাসিকাল গ্রীক এবং রোমান সাহিত্য পড়তে বাধ্য করেছিলেন। প্রত্যেক রাতে, খাবারের পর, রুশোর পিতা ও রুশো একসাথে রোমান্সের একটি ছোট গল্পের কিছু অংশ পড়তেন। কখনো কখনো পুরো রাত কোন বই শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পর্যায়ক্রমে একসাথে পড়তেন। রুশো তাঁর বই 'Confesions'-এ বলেছেন, ''আমার পিতা এবং আমার মধ্যে কথোপকথনের ফলে আমার মধ্যে স্বাধীন ও প্রজাতন্ত্রী চেতনা তৈরী হয়েছে''। রুশো একজন উদাসীন ছাত্র ছিলেন, কিন্তু নিজেকে দর্শন, গণিত এবং সঙ্গীত অধ্যয়নের জন্য আন্তরিকভাবে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন।

জ্যাঁ জ্যাক রুশো 15 থেকে 25 বছর বয়সের মধ্যে একজন খোদাইকারী ও সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে অর্থ উপার্জন করেছিলেন। 1742 খ্রিস্টাব্দে তিনি প্যারিসে চলে যান একজন সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুরকার হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য। প্যারিসে তিনি ডিডেরোটের সাথে বন্ধুত্ব করেন, যিনি রুশোকে এনসাইক্লোপিডির জন্য বেশিরভাগ প্রবন্ধ বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক এবং সেইসঙ্গে রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। 1743 থেকে 1744 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রুশো ভেনিসে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সচীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। 1742 থেকে 1777 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রুশোর জীবনের সুদীর্ঘ সময় ধরে তিনি রাজনীতি, শিক্ষানীতি, দর্শন, স্বাধীনতা, রোমান্টিসিজম ও আত্মজীবনী বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অনেকগুলি উপন্যাসও রচনা করেন। এইভাবে তিনি বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সেরা সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদগণের একজন হিসেবে স্বীকৃত হন। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে কয়েকটি হলো—Discourse on Inrequality, The Social Contract, Emile, Reveries of the Solitary Walker, Age of Sensibility, Confessions of Jean Jacques Rousseau, ইত্যাদি।

7.4 রুশোর দর্শন (Philosophy of Rousseau)

7.4.1 রুশোর দৃষ্টিতে মানুষ ও সভ্যতা (Man and Civilization in the Eyes of Rousseau)

রুশোর মতে, প্রকৃতি মানুষকে যেভাবে ও যে উদ্দেশ্যে গড়ে, সমাজের দোষে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। ললিতকলা ও বিজ্ঞানের বেদীমূলে সৃষ্ট সভ্যতার উপর তার কোন আস্থা ছিল না। মানব উৎকর্ষের সাথে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বিকাশ সম্পর্কিত রেনেসাঁস ও আলোকময়তা মতবাদের সাথে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করে রুশো বলেন :

''সমাজ ও সমাজের বিলাসিতা থেকেই জন্ম নেয় মানববিদ্যা, প্রযুক্তি, ব্যবসাবাণিজ্য, পাণ্ডিত্য এবং

সেই সব বাহুল্য যা শিল্পের বিকাশ ঘটায় কিন্তু একই সাথে সমাজকে সমৃদ্ধ ও ধ্বংস করে...বিখ্যাত জাতিসমূহের প্রাচুর্য তাদেরকে যে ক্লেদাক্ত দুঃখ-দুর্দশার দিকে ঠেলে দেয় এই হচ্ছে তার কারণ। একদিকে শিল্প ও মানববিদ্যা যতই উন্নতি লাভ করে, অন্যদিকে করের বোঝায় জর্জরিত শ্রমে-ক্ষুধায় কাতর অনাদৃত কৃষক ততই রুজির সন্ধানে শহরমুখী হয়। আমাদের নগরগুলি যতই দৃষ্টিনন্দন হয় ততই গ্রামাঞ্চল ফাঁকা হতে থাকে। অনাবাদী জমির পরিমাণ বাড়ে। নাগরিক হয় ভিখারি বা ডাকাত, আর ওদের জীবনের ইতি হয় ফাঁসির মঞ্চে বা আবর্জনস্তুপে। এভাবে রাষ্ট্র একদিকে ফুলেফেঁপে ধনী হয়, অন্যদিকে হয় জনবিরল। প্রবল প্রতাপ, সাম্রাজ্য এভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তোলে সমৃদ্ধির সৌধ আর ডেকে আনে জনজীবনে অবলুপ্তি"।

রুশো "আদি পাপে" (Original sin) বিশ্বাস করতেন না। তার মতে মানুষের দুর্দশা ও দুর্বলতার কারণ আদি পাপ নয়, বরং এটা হয়েছে তার আপন প্রকৃতির সাথে পরিবেশের দ্বন্দ্ব এবং অসঙ্গতির ফলে। মানুষ জন্মসূত্রে যে সম্ভাবনা নিয়ে আসে, তা অর্জনের প্রয়াস থেকেই তার মাঝে দেখা দেয় চাহিদা ও উচ্চাকাঙ্খা। অন্তহীন সে চাহিদা পূরণে অন্যের সাথে সে নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সমকালীন সমাজ কাঠামো ব্যক্তির বিকাশের পথে অন্তরায়, যা মানুষকে মানুষের মুখোমুখি করে দেয়, তাকে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। আদিম মানুষ ছিল স্বাচ্ছন্দ্য, সুখী ও আত্মসমাহিত। সঞ্চিত রাখার মতো সম্পদ ছিল না বলেই আদিম মানুষের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না।

7.4.2 রুশোর দৃষ্টিতে সমাজ ও রাষ্ট্র (Society and State in the view of Rousseau)

রুশোর মতবাদ : প্রকৃতি সাম্য ধারণার উপর নির্ভরশীল, যেখানে মানুষ মাত্রই সমান, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তৃপ্ত। প্রকৃতির সেই সুখী ও সৎ মানুষকে সমাজ ব্যবস্থা দুর্নীতিপ্রবণ ও দুর্দশাগ্রস্ত করেছে। রুশো সেই সমাজ ব্যবস্থার একাধারে সমালোচক এবং সমাধানে প্রয়াসী। সমাধান হবে ব্যক্তি ও সমাজের যৌথ পরিবর্তনের দ্বারা। ব্যক্তির উদ্ধার হবে শিক্ষায়, যার বিবরণী আছে 'এমিল' বইটিতে। আর সমাজের উদ্ধারসাধন সম্ভব যদি মানুষ সমাজবন্ধনের গোড়ার কথা মনে রাখে। যার আলোচনা আছে 'সমাজ চুক্তি' গ্রন্থে। ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বাধীনতা খানিকটা বিসর্জন দেয় রাষ্ট্র-সমাজ গঠনে, কিন্তু সে কারো গোলাম নয়। রুশোর মতে, মানবিক জ্ঞানের উন্নতি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে শ্রমের শ্রেণীবিভক্তি সূচিত হয় এবং মানবজাতির প্রাকৃতিক সুখকর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে ধনী-দরিদ্র বিভাজন সৃষ্টি করে, যার পরিণতিতে রাষ্ট্রীয় সমাজ অত্যাবশ্যক হয়ে যায়। এ সমাজ সংগঠন তথা রাষ্ট্র মানুষের কৃত্রিম জীবনের ফল।

যে পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাজের সৃষ্টি হয়েছে তা হচ্ছে একটি "সামাজিক চুক্তি" (Social Contract)। এ চুক্তি কোনো নিরঙ্কুশ শাসক তৈরি করে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমস্ত অধিকারকে সামাজিক চুক্তির দ্বারা সমষ্টির নিকট সমুদয়ভাবে সমর্পণ করে। আবার সকল নাগরিক একটা সার্বভৌম কাঠামোর সমান অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অধীনে তা পুনরায় লাভ করে। প্রত্যেক নিজেদেরকে

সমর্পণ করবে অথচ ব্যক্তিগতভাবে কারো কাছে নত হবে না। ক্ষমতা এখানে ব্যক্তিবিশেষের নয়, পরস্পরের। এভাবে একক ব্যক্তির ইচ্ছা সামষ্টিকভাবে একটি "সাধারণ ইচ্ছায়" (General will) পালিত হয়। এই সাধারণ ইচ্ছাই রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের নিয়ামক। রাষ্ট্র হচ্ছে পূর্ণ রাজনৈতিক সংস্থা, সর্বোচ্চ এবং সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ, আর সরকার হচ্ছে সাধারণ ইচ্ছাকে কার্যকরী করার জন্য সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্বাচিত লোকের সমষ্টি।

7.4.3 ফরাসি বিপ্লবে রুশোর অবদান (Rousseau's Contribution to the French Revolution)

রুশোকে ফরাসি বিপ্লবের মূল কারিগর মনে করা হয়। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জাগ্রত করতে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন, "মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু সমাজ তাকে শৃঙ্খলিত করে"। (Man is born free but everywhere he is in chains)। তিনি উল্লেখ করেন পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীন ছিল। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানার ধারণা সৃষ্টি হলে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রতারণা ও অতৃপ্ত বাসনা মানুষের জীবনের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। তাই মানুষ ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সামগ্রিক ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে। এভাবেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। তাই জনতার অধিকার রয়েছে বিপ্লবের দ্বারা রাজতন্ত্রের পতন ঘটাবার। "লা কন্তা সোসিয়াল" গ্রন্থে উল্লেখিত এই বাণী ফরাসি জনগণকে বিপ্লবে অনুপ্রাণিত করে। তাই রুশোকে ফরাসি বিপ্লবের মূল প্রবক্তা বলা হয়।

7.5 রুশোর শিক্ষা চিন্তা (Educational Thoughts of Rousseau)

7.5.1 রুশোর শিশুকেন্দ্রিকতা ও শিক্ষাতত্ত্বের মূল নীতি (Rousseau's Child-centredness and Principles of Education)

শিশুকেন্দ্রিকতা (Child Centredness) : রুশোর আগে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান বস্তু ছিল শিক্ষক, শিশু ছিল অবজ্ঞেয়। তার স্বাভাবিক শক্তি আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের বিষয় বিবেচনা করা হত না। বয়স্কদের কর্মদারা, চিন্তাধারা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হত। সে যেন বয়স্ক মানুষের ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাই কৃত্রিম শিশু নিপীড়ন শিক্ষার বিরুদ্ধে রুশো উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন প্রকৃতির ইচ্ছা যে বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ হবার পূর্বে শিশুরা শিশুই থাকবে। শিশু প্রকৃতিকে অবহেলা করে কৃত্রিমভাবে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সার্থক শিক্ষাদানের আশা বাতুলতা মাত্র।

রুশোকে আধুনিক শিক্ষার জনক বলে অভিহিত করা হয়েছে কারণ তার শিশু চিন্তাধারা "এমিল" গ্রন্থের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। শিক্ষার ইতিহাসে তার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। তাঁর মতে শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিমুখী, শিশুর স্বাধীনতা, শিশুর চাহিদা পাঠ্যবিষয়ের প্রবর্তন সবকিছুই শিশুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। তাই তাঁর শিক্ষা দর্শন শিশু কেন্দ্রিকতার প্রতিফলন।

শিক্ষাতত্ত্বের মূল নীতি : রুশোর শিক্ষাচিন্তায় শিক্ষাতত্ত্বের মূল নীতি হল —

(i) শিক্ষা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থা নয়।

(ii) শিক্ষা হল অন্তঃজাত আত্মবিকাশ, বহিঃপ্রযুক্ত জ্ঞান আহরণ বিষয় নয়।

(iii) শিক্ষা হল স্বাভাবিক শক্তির বিস্তার, তথ্য সংগ্রহের কাজ নয়।

(iv) শিক্ষা হল জীবনযাপন প্রস্তুতি, ভবিষ্যৎ অবস্থার জন্য প্রস্তুতি নয়।

(v) আত্মসক্রিয়তা ও ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তির বিরামহীন স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশই হল শিক্ষা।

(vi) সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুর চাহিদা ও অনুরাগের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

7.5.2 শিক্ষায় রুশোর প্রকৃতিবাদী প্রভাব (Rousseau's Naturilistic Influence on Education)

প্রকৃতিবাদী প্রভাব : রুশোর প্রকৃতি হল মুক্ত প্রকৃতির মাধ্যমে শিক্ষাদান। প্রকৃতিকে অনুসরণ করে শিক্ষালাভের নীতি তার দার্শনিক চিন্তার মূল বিষয়। তিনি প্রকৃতিকে তিনটি অর্থে ব্যবহার করেছেন,—

(i) সামাজিক অর্থে (In the social sense)

(ii) মনোবৈজ্ঞানিক (In the psychological sense)

(iii) বস্তুজাগতিক অর্থে (In the phenomenal sense)

মানব হস্তক্ষর বর্জিত উদারমুক্ত নিসর্গ জগৎ এর সঙ্গো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশের নামই শিক্ষা। শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের সরল সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

প্রকৃতিভিত্তিক শিক্ষা : রুশো ঘোষণা করেন শিক্ষা একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, কোনোরূপ কৃত্রিম পদ্ধতি নয়। বাইরে থেকে জ্ঞান আহরণ শিক্ষা নয়। স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ, প্রকৃতিলব্ধ প্রযুক্তি ও প্রবণতার ক্রিয়াশীলতাকে অবলম্বন করে শিক্ষা সংগঠিত হয়। শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা। স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকর্মকে আশ্রয় করে স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষ জীবনে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সর্বপ্রকার কৃত্রিমতার বন্ধনমুক্ত স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশই প্রকৃতি শিক্ষার রূপ।

প্রকৃতিকে অনুসরণ করে শিক্ষাবিধান : "প্রকৃতিকে অনুসরণ করে প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যাও" —এই ছিল রুশোর বাণী। তিনি বলেন যে, প্রকৃতিকে অনুসরণ করে শিক্ষাবিধান করতে হবে। তিনি 'এমিল' গ্রন্থের প্রথমেই ঘোষণা করেন যে প্রকৃতির স্রষ্টার হাত থেকে যা কিছু আনে তা সর্ব সত্য, মঙ্গালময়। কিন্তু মানুষের হাতে পড়ে প্রত্যেকটি বিষয়ের বিকৃতি ও অধঃগতি হয়।

7.5.3 'Emile'-এর শিক্ষার পর্যায় (Stages of Education of 'Emile')

'Emile'-এর শিক্ষাধারা : তার শিক্ষা চিন্তায় ছোট্ট শিশু Emile-এর বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারা প্রকাশ

পেয়েছে। গ্রন্থটি শিক্ষাজগতে এক নবযুগের প্রবর্তন করেছে। কোনো বিশেষ শিক্ষানীতি বা শিক্ষাপদ্ধতির জন্য এই গ্রন্থ মূল্যবান নয়। শিক্ষার স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থটির মধ্যে যে সামগ্রিক ও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তি হয়ে উঠেছে, নব ভাবধারা অভিব্যক্তি লাভ করেছে। নবযুগের প্রবর্তন হচ্ছে। রুশোর Emile গ্রন্থটিকে শিক্ষার সর্বাধিক ধারার মানস সরোবর বলা যায়।

শিক্ষার স্তর ও শিক্ষাক্রম

রুশোর কল্পিত শিশু এমিলের শিক্ষাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে প্রত্যেকটি স্তরের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। নিচে তা উল্লেখ করা হল :

১. এক থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিক্ষা

এ স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর শারিরীক বিকাশ সাধনা। এ সময়ে শিশুকে চলাফেরা অবাধ সুযোগ দিতে হবে। দৈহিক চাহিদা পূরণে তৎপরতা দেখাতে হবে। শিশুকে যেমন অধিক প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না তেমনি তাকে নিরুৎসাহিতও করা যাবে না। শিশুকে সাধারণ খাবার দিতে হবে এবং বেশি কাপড়চোপড় পরিধান করতে দেওয়া যাবে না। তার খেলার সামগ্রী হবে ফুল, পাতা, গাছের ডাল ইত্যাদি। কোন দামী খেলনা সে ব্যবহার করবে না।

২. পাঁচ থেকে বার বছর বয়সের শিক্ষা

এ স্তর শিশুকে নেতিবাচক শিক্ষায় শিক্ষিত করার স্তর। ইন্দ্রিয়সমূহের বিকাশ সাধন এ স্তরের লক্ষ্য। শিশুর কোন কিছু করার ইচ্ছা এবং করতে পারার ক্ষমতার ভারসাম্যের মধ্যেই শিক্ষার মূল বিষয়টি নিহিত। ছেলে-শিশু রুশোর মতে "noble savage" স্বরূপ। এ "noble savage" এর প্রকৃতি হবে আদিম ও সহজ সরল। প্রাক-সামাজিক এই স্তরে শিশুর একজন শিক্ষক থাকবেন। তিনি কিছুই শিক্ষা দেবেন না। তবে দেখবেন যে শিশু তার আগ্রহ ও চাহিদা অনুসারে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিখছে। শিশুকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে সমাজের ভুল ও খারাপ জিনিসগুলো থেকে আড়াল করে রাখতে হবে। বইপুস্তক শিশুর জন্য ক্ষতিকর, যতদূর সম্ভব তাকে কম বাচনিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। বাচনিক শিক্ষা বলতে তিনি আদেশ-উপদেশ ও নির্দেশকে বুঝিয়েছেন।

৩. বার থেকে পনের বছর বয়সের শিক্ষা

রুশোর মতে শিশুর এ স্তরটি মনোযোগ বৃদ্ধি এবং কাজ করার তাগিদ সৃষ্টির স্তর। এ পর্যায়ে শিশু তথ্য বর্ণনা করতে পারে। সে তার চারপাশে যে সকল ঘটনা ঘটে তার কারণ এবং ঘটনাগুলোর তুলনা করতে পারে। ক্রমে ক্রমে সে দূরদৃষ্টি অর্জন ও ভবিষ্যৎ দর্শনে সক্ষম হয়ে ওঠে। এখনো তাকে কোন নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যাবে না। কারণ তার সৌন্দর্যানুভূতি, নৈতিক দৃষ্টি এবং সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তবে তার জন্য যে সকল কাজ তার উপযোগী তা হাতে-কলমে

শিখবে এবং যে সকল সমস্যা দেখা দেবে নিজে করে তা থেকে শিখবে। এ সময় বিজ্ঞান, হস্তশিল্প ও বৃত্তি সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যাবে। কিন্তু একমাত্র রবিনসন ক্রুশো ছাড়া আর কোন পুস্তক তাকে পাঠ করতে দেওয়া যাবে না।

৪. পনের থেকে বিশ বছর বয়সের শিক্ষা

এতদিন ছেলে-শিশু এমিলের শিক্ষা ছিল আত্মকেন্দ্রিক। এ পর্যন্ত তার যে শিক্ষা হয়েছে তা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের বৃদ্ধি সম্পর্কিত। এবার শুরু হবে তার হৃদয়বৃত্তি বিকাশের শিক্ষা এবং সমাজের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনের শিক্ষা। এ স্তরে ইতিহাস শিক্ষাদানের সূচনা হবে এবং বিভিন্ন ধর্মমতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত সাধারণ বিষয়াদির সঙ্গে তাকে পরিচিত করতে হবে। সমাজকর্ম, সাহিত্যকর্ম এবং নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে সে সমাজ ও পরিবারে নিজের স্থান করে নেবে। পরিবারের প্রধান হিসেবে তার কর্তব্য সম্পর্কে সে শিক্ষালাভ করবে। ক্রমে ক্রমে সে বয়স্কদের মধ্যে স্থান করে নেবে এবং সততা ও নৈতিকতার আদর্শে তার নিজ দায়িত্ব অতি উত্তমভাবে পালন করতে থাকবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রুশো ছেলে ও মেয়েকে এক করে দেখেন নি। তাঁর মতে মেয়েদের শরীরের গঠন ও প্রকৃতি ভিন্ন এবং তাদের কাজও আলাদা। তাই তাঁর নারীর আদর্শ সোফি'র (Sophie) শিক্ষা এমিল (Emile) থেকে আলাদা। নারীকে তাই পুরুষের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে হবে, তার কাজে আসতে হবে এবং তাকে খুশী করতে শিখতে হবে। নারীকে শিশুর যত্ন ও লালন পালনের কৌশল জানতে হবে, নিজেকে সমাজের জন্য গ্রহণীয় করে তুলতে হবে। সোফি তার মায়ের কাছ থেকে ধর্মজ্ঞান লাভ করবে, মায়ের কাছ থেকেই প্রশিক্ষণ নিয়ে সুনিপুণা হবে এবং সব সময় হাসিখুশী থাকবে, নিজেকে যেন সুন্দর দেখায় সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। তাঁর মতে স্বাভাবিক নারী তার স্বাভাবিক পুরুষ প্রভুর উপযোগী হয়ে গড়ে উঠবে।

রুশোর শিক্ষার সর্বশেষ পাঠ হলো ছেলে ও মেয়ে সকলকেই যৌন শিক্ষা প্রদান। এক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক, বৈবাহিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কেও শিক্ষাদান করতে হবে।

7.5.4 শিক্ষায় রুশোর আধুনিকতার প্রভাব (Influence of Rousseau's Modernism on Education)

শিক্ষায় আধুনিকতার প্রভাব : রুশোর শিক্ষা চিন্তার সমস্ত দিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে তার শিক্ষা চেতনার মধ্যে কতকগুলি আধুনিকতার রূপ প্রতীয়মান। সেগুলি হল—

(i) শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের ধারা : শিশুর প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে শিক্ষাব্যবস্থা সংগঠিত করতে হবে। তাই রুশোর শিক্ষানীতি হবে শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের ধারা প্রচলন।

(ii) সমাজবিজ্ঞানের প্রভাব : শিক্ষায় সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা, গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শন, রুশোর ভাবধারা থেকে অঙ্কুরিত হয়েছে।

(iii) বিজ্ঞান প্রবণতার ধারা : নৈস্বর্গিক প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের যে কথা রুশো বলেছিলেন তা থেকেই একদিকে প্রকৃতি প্রবণতা ও অপরদিকে বিজ্ঞান প্রবণতার ধারা অগ্রসর হয়েছে।

(iv) ভাববাদী ধারা : মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির পবিত্রতা এবং অন্তর ও বাহিরে যে সামঞ্জস্যের কথা রুশো বলেছেন তা থেকেই ভাববাদীরা পরিস্ফুট হয়েছে।

(v) প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা : প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা চেতনা থেকেই প্রকৃতিবাদে অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এর থেকে সৃষ্টি হয়েছে মুক্ত প্রকৃতিধারা।

(vi) বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবণতা : রুশো এমিলকে যে উদ্দেশ্যে একটি মৌলিক হস্তশিল্প শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবণতার উৎস।

(vii) **শিশুকেন্দ্রিকতা :** রুশো যেভাবে শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে বসিয়েছিলেন তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে শিশুকেন্দ্রিকতা।

(viii) যুক্তিবাদীর প্রভাব : তার যুক্তিবাদী ধারণা থেকে আধুনিক অবাধ শৃঙ্খলার ধারণাটি জন্মলাভ করেছে।

কিন্ডারগার্ডেন প্রণালী, মন্তেস্বরি পদ্ধতি, উইনেকটার প্রণালী, ওয়ার্ধা পরিকল্পনা প্রভৃতি যে সকল নববিধান আধুনিক শিক্ষাজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তাদের সবগুলি শিশুকেন্দ্রিক এবং সর্বত্রই রুশোর প্রভাব বিদ্যমান। বয়স্কদের নিকট থেকে শিক্ষার কেন্দ্রকে স্থানান্তরিত করে শিশুকে কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলেই রুশোকে শিক্ষাজগতের কোপারনিকাশ বলা হয়। এ সকল কারণে রুশোকে আমরা আধুনিক শিক্ষার জনক বলে অভিহিত করতে পারি। তিনি আধুনিক শিক্ষার পথপ্রদর্শক।

রুশোর চিন্তাভাবনা প্রগতিশীল হলেও তিনি নারীশিক্ষার বিরোধী ও নেতিবাচক শিক্ষার সমর্থক। তা সত্ত্বেও তাকে আধুনিক শিক্ষার জনক বলা আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। কারণ তিনি পুরাতন থেকে নতুনের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন যাত্রাপথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুতরাং, এই সিদ্ধান্তে আসা অযৌক্তিক নয় যে, রুশো আধুনিক শিক্ষা চেতনার বিভিন্নমুখী ধারার উৎস ও আধুনিক শিক্ষার জনক। "Rousseau is rightly regarded as the father of modern education."

7.5.5 রুশোর নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education of Rousseau)

রুশোকে নেতিবাচক শিক্ষাধারা (Negative Education) : রুশো তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষাকে সকলপ্রকার সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত করে রাখার কথা বলেছেন। শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি অনুযায়ী কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্র, সমাজ বা শিক্ষকের প্রভাবই বেশি। এই ধরনের শিক্ষা শিশুর স্বাধীনতাকে হরণ করে, তার প্রকৃতিকে অস্বীকার করে। এই শিক্ষার দ্বারা সমাজের বয়স্করা শিশুর জীবনে তারা অভিরুচি অনুসারে কৃত্রিম পরিবর্তন সাধন করেন। এই স্থলে শিশুর ক্ষেত্রে তিনি নেতিবাচক শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন।

নেতিবাচক শিক্ষার অর্থ এই নয় যে, শিশুর কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন নেই। আমাদের তথাকথিত গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা অনুশীলন থেকে পৃথক এক শিক্ষাব্যবস্থা হল নেতিবাচক শিক্ষা। গতানুগতিক প্রাচীন শিক্ষায় বিশ্বাস করা হত যে, শিশু জন্মানোর সময় কতকগুলি পাপ প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়, অর্থাৎ শিশুরা আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায় যা বর্বর প্রকৃতির। তাই কঠোর শাসন শৃঙ্খলার দ্বারা তার চরিত্র ও আচরণকে শোধন করে নিতে হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুর আদিম প্রবৃত্তিকে সংযত করা। কিন্তু রুশো এই ধরনের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে শিশুর আদিম প্রবৃত্তি মহৎ। সমাজের সংস্পর্শে এসে তা কলুষিত হয়ে যায়।

নেতিবাচক শিক্ষার সঙ্গা : রুশো বলেন, "প্রথমে শিক্ষা বিশুদ্ধ নেতিবাচক হবে কারণ শিশুর স্বভাব মূলত সৎ। যে শিক্ষা মূলত জ্ঞানদানের পূর্বে জ্ঞানার্জনের যন্ত্রস্বরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মানসিক বৃত্তিকে উৎকর্ষ সাধন করে যা ইন্দ্রিয়গুলির উপযুক্ত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ প্রশস্থ করে, তাই হল নেতিবাচক শিক্ষা।"

নেতিবাচক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Negative Education) : রুশোর নেতিবাচক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা। শিশু তার নিজস্ব চাহিদা মতো কাজ করবে। কোনো বাধা তাকে দেওয়া যাবে না, কোনো কৃত্রিম উপায়ের সাহায্যে তাকে কিছু শেখানো হবে না। নিজের পছন্দমতো জিনিস শেখায় তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। শিশুকে জোর করে শেখানোর চেষ্টা করলে তার মধ্যে হিংসা, বিরক্তি, রাগ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সৃষ্টি হবে।

নেতিবাচক শিক্ষার পদ্ধতি (Teaching Methods of Negative Education) : রুশোর মতে শিক্ষাপদ্ধতি দু-ধরনের হবে—নেতিবাচক ও ইতিবাচক। রুশোর সময় দেশে যে ইতিবাচক শিক্ষা প্রচলিত ছিল তিনি তার চরম বিরোধী ছিলেন। তখন দৈহিক ও নৈতিক শিক্ষার পরিবর্তে বৌদ্ধিক বিকাশের ওপর প্রচলিত শিক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দিত। এই শিক্ষা ছিল মনঃস্তত্ত্বের বিরোধী। এই শিক্ষা শিশুর বর্তমানকে উপেক্ষা করে ভবিষ্যৎ-এর অনিশ্চিত সুখের আশা দেয় এবং শিশুজীবনকে নানা বাধায় ভারাক্রান্ত করে তোলে। রুশো তার বিরোধিতা করেন। এই জন্য তাঁর মতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উপযুক্ত বিপরীত কাজই হল নেতিবাচক শিক্ষা।

তিনি প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং এক নতুন নেতিবাচক শিক্ষা প্রবর্তন করেছেন। তাঁর মতে শিশুর প্রকৃতি হল শুদ্ধ ও পবিত্র। তাই তার প্রথম জীবনের শিক্ষা হবে নেতিবাচক শিক্ষা। এই সময়ে তাড়াতাড়ি তাকে কিছু সদাচার শিক্ষা দিতে হবে না। দেরি হলেও সবকিছু তাকে স্বাভাবিক আগ্রহের বাধাহীনভাবে শিখতে দিতে হবে। শিশুকে শিক্ষা দেবার একমাত্র উপায় হল তাকে কিছু না শেখানো। নেতিবাচক শিক্ষার মূল কথাই হল শিশুকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দান। সে তার নিজস্ব চাহিদামতো কাজ করবে এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সবকিছু শিখবে।

নেতিবাচক শিক্ষার মাধ্যমে শিশু কোনো মিথ্যা বিষয়কে গ্রহণ করবে না। যখন যে বড়ো হবে তখন তা ইন্দ্রিয় পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এবং সে সত্য ও মহৎকে নিজে থেকে চিনে নিতে পারবে। রুশোর মতে শৈশব হল শিশুর ঘুমন্ত অবস্থা। বুদ্ধি হল ইন্দ্রিয়ভিত্তিক সুতরাং ইন্দ্রিয় পরিচর্চার মাধ্যমে শিশু মনে আপনা-আপনি বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হবে। যদিও কোনো ভাষাকে শিক্ষা বা বুদ্ধির অনুশীলন নেতিবাচক শিক্ষায় নেই।

নেতিবাচক শিক্ষায় অবদান (Contribution of Negative Education) : রুশোর নেতিবাচক শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে —

(i) **শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রে :** শিশুকে মুক্ত আলো বাতাস দ্বারা খোলাধুলায় সুযোগ দান করলে তার শরীর ও মন ভালো থাকে। তার খাদ্য হবে সাধারণ। পোষাক হবে হাল্কা যা শরীরকে সুনিয়ন্ত্রিত করে।

(ii) **বৌদ্ধিক শিক্ষার ক্ষেত্রে :** রুশোর নির্দেশিত নেতিবাচক শিক্ষায় মৌখিক শিক্ষার বিশেষ কোনো স্থান নেই। শিক্ষার্থীর নিজ নিজ কলা-কৌশল, আদব-কায়দা এই শিক্ষায় স্থান পেয়েছে।

(iii) **নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে :** রুশোর নেতিবাচক শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকবোধ সৃষ্টি করা যায়। শিশুরা তাদের নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

নেতিবাচক শিক্ষায় শিশুর সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা দেওয়া হয়। মাতাপিতা, অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজ সবকিছুর প্রভাব থেকে শিশু তখন মুক্ত, শিশুর চাহিদা ও আগ্রহ প্রধান। তার স্বাধীন আচরণের কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না। নেতিবাচক শিক্ষা কোনো সংগুণ প্রদান করে না বটে কিন্তু মন্দ গুণ থেকে রক্ষা করে। শিশুর যখন বোঝার মতো বয়স হয় তখন যাতে সত্যকে নিজেই লাভ করতে পারে সেই পথেই তাকে এগিয়ে দেয়। শিশু যখন সংকে চেনবার ও ভালোবাসার ক্ষমতা লাভ করে তখন যাতে নিজেই ভালো গুণ লাভ করতে পারে সেই পথেই তাকে এগিয়ে দেয়।

রুশো তার নেতিবাচক শিক্ষানীতিতে সমস্ত শাসন ও সংযমের বিরুদ্ধে বিরূপতা, সমাজের অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ, রূপরস গন্ধময় নৈস্বর্গিক সৌন্দর্যের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং নিপীড়িত ও শৃঙ্খলিত শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতিবোধ দেখিয়েছেন। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এবং শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে, "We are always looking for the man in the child without thinking what he is before he becomes a man"।

7.6 সারাংশ (Summary)

জ্যাঁ জ্যাক রুশো 1712 খ্রিস্টাব্দে জেনেভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের মাত্র কয়েকদিন পরই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। শৈশবে তিনি তাঁর পিতার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। 10 বছর বয়সে তাঁকে

একজন শিক্ষকের কাছে ন্যস্ত করা হয়। কোন স্কুলের শিক্ষা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। এরপর শুরু হয় তাঁর ভবঘুরে জীবন। ঐ সময় তিনি ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ঘুরে বেড়ান। তিনি কোন পেশাতেই বেশি দিন লেগে থাকতে পারেননি। মেধাবী, সুতীক্ষ্ণ, অনুভূতিসম্পন্ন ও যুক্তিবাদী রুশো সেসময় ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনা করেন। এতে তাঁর জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। 1750 খ্রিস্টাব্দে "Discourse on Arts and Sciences" নামক গ্রন্থ রচনার জন্য প্যারিসের একাডেমী অব ডিজন তাঁকে সম্মানিত করে। এরপর তাঁর লেখা আর থামেনি। তাঁর বৈপ্লবিক ও মৌলিক চেতনাসমৃদ্ধ লেখা সমকালীন সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এজন্য তাঁকে দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। তাঁর রচিত 'The Social Contract' রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কিত এবং 'Emile' শিক্ষাতত্ত্বে সমৃদ্ধ গ্রন্থ। তাঁর চিন্তা-চেতনার জন্য তাঁকে ফরাসি বিপ্লবের জনক এবং আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ বলা হয়। রুশো দেখিয়েছেন যে, আদর্শ রাষ্ট্রেই আদর্শ শিক্ষা সম্ভব। সে রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবণতা ও সুনাগরিকত্বের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় না। 'Confession' বা 'স্বীকারোক্তি' তার শেষ জীবনের লেখা। 1778 খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

রুশো মূলত ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্বাভাবিক গুণাবলীর বিকাশের মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জনের ওপরই তিনি জোর দিয়েছেন। রুশোর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'Emile'-এর প্রথম বাক্যটি হলো—

"Everything is good as it comes from the hands of Creator of things :
everything degenerates in the hands of man."

রুশোর দর্শনকে বুঝতে হলে আমাদের তাঁর প্রতিবাদী মন ও বিশৃঙ্খল জীবনের প্রতি অবশ্যই নজর দিতে হবে। বস্তুত তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শনের মধ্য দিয়ে যে বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন তা হলো : ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হবে যাতে করে তার সহজাত সুপ্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে।

রুশোর মতে শিক্ষার উৎস তিনটি : প্রকৃতি, মানুষ ও বস্তুজগৎ। শিক্ষার এই তিনটি উৎসের মধ্যে যদি পূর্ণ সমন্বয় না ঘটে, তবে শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। এক্ষেত্রে তিনি নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education) এবং প্রাকৃতিক ফলাফল ভিত্তিক শিক্ষার (Education through natural consequences) ধারণা দেন। রুশোর প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব অনুসারে মুক্ত প্রকৃতির বুকে অবাধ বিচরণের মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষা লাভ করবে। প্রথাগত ভাবে তাকে নৈতিক বা মানসিক কোন শিক্ষাই দেওয়া যাবে না। তাঁর মতে, মুক্ত পরিবেশেই কেবল শিশুর সহজাত ও সুপ্ত গুণগুলির বিকাশ ঘটে।

7.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. রুশোর পারিবারিক জীবন, শিক্ষা জীবন ও কর্মজীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
2. রুশোর দৃষ্টিতে 'মানুষ ও সভ্যতা' এবং 'সমাজ ও রাষ্ট্র' সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

3. ফরাসি বিপ্লবে রুশোর অবদান কী?
4. রুশোর মতবাদ অনুযায়ী “শিশু কেন্দ্রিকতা” বলতে কি বোঝেন?
5. রুশোর মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষাতত্ত্বের মূলনীতিগুলি কী কী?
6. শিক্ষায় রুশোর প্রকৃতিবাদী প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
7. ‘Emile’-এর শিক্ষার পর্যায়গুলির ব্যাখ্যা করুন।
8. শিক্ষায় রুশোর আধুনিকতার প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
9. রুশোর নেতিবাচক শিক্ষা ব্যাখ্যা করুন।

7.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- Jean Jacques Rousseau, Wikipedia, https://en.m. wikipedia.org. Retrieved on 08.04.2024
- জ্যঁ জ্যাক রুশো, উইকিপিডিয়া, https://bn.m. wikipedia.org, Retrieved on 08.04.2024
- Jean Jacques Rousseau, Biography, Education, Philosophy, Britannica, https://www.britannica.com. Retrieved on 09.04.2024
- ইউনিট ৫, শিক্ষা দার্শনিক (২), BoU E-Book, https://www.ebookbou, edn.bd, Retrieved on 09.04.2024
- Jean Jacques Rousseau-Philosophy, Oxford Bibliographies, https://www. oxfordbibliographies.com. Retrieved on 10.04.2024
- The Confessions of Jean Jacques Rousseau, Project Gntenberg, https://www. getenberg.org. Retrieved on 10.04.2024

একক 8 ❑ জোহান হাইনরিখ পেস্তালৎসি (Johann Heinrich Pestalozzi)

গঠন

8.1 উদ্দেশ্য **(Objectives)**

8.2 ভূমিকা **(Introduction)**

8.3 পেস্তালৎসির পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা **(Family Life, Education of Pestalozzi)**

8.3.1 পেস্তালৎসির পারিবারিক জীবন **(Family Life of Pestalozzi)**

8.3.2 পেস্তালৎসির শিক্ষা **(Education of Pestalozzi)**

8.4 শিক্ষাক্ষেত্রে পেস্তালৎসির অবদান **(Contribution of Pestalozzi in the field of Education)**

8.4.1 'মাথা', 'হৃৎপিণ্ড' ও 'হাতের' বিকাশের তত্ত্ব **(Theory of Development of Head, Heart and Hands)**

8.4.2 পেস্তালৎসি কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন **(Establishment of different Institutes by Pestalozzi)**

8.5 পেস্তালৎসির শিক্ষা চিন্তা **(Educational Thoughts of Pestalozzi)**

8.5.1 শিশুর সুসম বিকাশে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি **(Psychological basis of balanced development of the Child)**

8.5.2 শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষণ পদ্ধতি **(Objectives of Education and Teaching Method)**

8.6 সারাংশ **(Summary)**

8.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

8.8 গ্রন্থপুঞ্জ **(Bibliography)**

8.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- পেস্তালৎসির পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মাথা, হৃৎপিণ্ড ও হাতের বিকাশের তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন বিদ্যালয় স্থাপনে পেস্তালৎসির অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শিশুর সুসম বিকাশে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে পেস্তালৎসির মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে পেস্তালৎসির মতামত জানতে পারবেন।
- পেস্তালৎসির 'দলগত খেলার ধারণা' জানতে পারবেন।

8.2 ভূমিকা (Introduction)

জোহান হাইনরিখ পেস্তালৎসি সুইজারল্যান্ডের জুরিখে 1746 খ্রিস্টাব্দের 12 জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সুইস সমাজ সংস্কারক এবং তাঁকে আধুনিক শিক্ষার জনক বলা হয়। তিনি রাজনীতি এবং জ্ঞানের অন্যান্য স্বীকৃত ক্ষেত্রগুলির পাশাপাশি শিক্ষাকে জ্ঞানের একটি একটি পৃথক শাখায় পরিণত করেছিলেন।

পেস্তালৎসি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে 'মাথা', 'হার্ট' এবং 'হাত'-এর ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো উচিত। এর ফলে এমন ব্যক্তি তৈরী হবে, যারা সঠিক ও ভুল নির্ণয় করতে পারবে এবং প্রকৃত জ্ঞান অনুসারে কাজ করতে সক্ষম হবে। এইভাবে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরী হতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষমতায়ন সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন, তথা বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা ঘটানো সম্ভব।

পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শন তাঁর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ফসল। প্রকৃতবাদী রুশোর নেতিবাচক ও ফলাফল ভিত্তিক শিক্ষাকে তিনি পুরোপুরি সমর্থন করেননি। তিনি শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর মনস্তত্ত্বের উপর সমাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে শিক্ষা হল শিশুর শক্তি, সামর্থ ও মানসিক বৃত্তিগুলোর স্বাভাবিক ও সুসম বিকাশ সাধন।

জোহান হাইনরিখ পেস্তালৎসি 1827 খ্রিস্টাব্দের 17 ফেব্রুয়ারী সুইজারল্যান্ডের ব্রুগে (Brugg) 81 বছর বয়সে মারা যান।

8.3 পেস্তালৎসির পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা (Family Life and Education of Pestalozzi)

8.3.1 পেস্তালৎসির পারিবারিক জীবন (Family Life of Pestalozzi)

জোহান হাইনরিখ পেস্তালৎসি 1746 খ্রিস্টাব্দের 12 জানুয়ারি সুইজারল্যান্ডের জুরিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জোহান ব্যাপটিস্ট পেস্তালৎসি এবং মাতার নাম সুজানা হটজে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন চক্ষু সার্জন, যিনি 33 বছর বয়সে মারা যান। তখন হাইনরিখ পেস্তালৎসির বয়স মাত্র 5 বছর এবং তিনি মাতা-পিতার দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। তাঁদের পরিবার প্রোটেস্ট্যান্টে বিশ্বাসী হওয়ায় তাঁদের বসবাসের স্থান লোকার্নো থেকে অন্যত্র পালিয়ে যেতে হয়েছিল। তাঁদের পরিবারে একজন দাসী ছিল, যার নাম বারবারা স্মিড, ডাকনাম বাবেলি। পেস্তালৎসির মৃত্যুর পর বাবেলির সাহায্যেই তাঁর মা পরিবারের ভরণ-পোষণ করতেন।

1769 খ্রিস্টাব্দে 23 বছর বয়সে তিনি বাল্যবন্ধু আন্না শুলথেসকে বিয়ে করেন। তিনি জুরিখে একজন ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে জমি কিনে "নিউহফ" নামে একটি বাড়ি তৈরী করেন। পেস্তালৎসি-শুলথেস দম্পতির একটি পুত্র সন্তান হয়, যার নাম জ্যাঁ জ্যাক পেস্তালৎসি। তাঁদের ছেলের ডাকনাম ছিল 'শ্যাগেলি'। মাত্র 31 বছর বয়সেই তাঁদের ছেলে জ্যাঁ জ্যাক পেস্তালৎসি মারা যায়। তাঁর পুত্রবধূ এবং নাতি 'গটলিব' হাইনরিখের প্রতিষ্ঠিত বার্গডর্ফের ইনস্টিটিউটে বসবাস করার জন্য 'নিউহফ' থেকে চলে আসেন। 1815 খ্রিস্টাব্দে পেস্তালৎসির স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। 1825 খ্রিস্টাব্দে অর্থের অভাবে 'ইনস্টিটিউট' বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। পেস্তালৎসি তখন নিউহফে তাঁর পুরোনো বাড়িতে ফিরে আসেন। 1827 খ্রিস্টাব্দের 15 ফেব্রুয়ারী তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দুই দিন পর 17 ফেব্রুয়ারী ব্রুগে (Brngg) মারা যান।

8.3.2 পেস্তালৎসির শিক্ষা (Education of Pestalozzi)

1761 খ্রিস্টাব্দে পেস্তালৎসি জুরিখের 'জিমনেসিয়ামে' (কলেজিয়াম হিউম্যানিটাইটিস) যোগদান করেন। সেখানে শিক্ষাবিদ জোহান জ্যাকব বোডমার তাঁকে ইতিহাস ও রাজনীতি পড়াতেন এবং জোহান জ্যাকব ব্রেইটিংগার তাঁকে গ্রীক ও হিব্রু শেখাতেন। 'জিমনেসিয়াম' হলো ম্যাধ্যামিক বিদ্যালয়ের একটি সমার্থক শব্দ যা শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য তৈরি করে। পেস্তালৎসি কলেজিয়াম ক্যারোলিনাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা ও দর্শনে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন।

ছুটির দিন পেস্তালৎসি মাতামহের (হংগের একজন পাদ্রী) কাছে যেতেন। তাঁরা একসাথে স্কুলে এবং প্যারিসিয়দের বাড়ীতেও ভ্রমণ করতেন এবং দেশের কৃষকদের দারিদ্রতা সম্পর্কেও জানতে পারতেন। তিনি একজন পাদ্রী হওয়ার জন্য শিক্ষিত হয়েছিলেন। একজন ধর্মযাজক হিসেবে তিনি তাঁর শিক্ষাগত

ধারণা বাস্তবায়নের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়ার আশা করেছিলেন, কিন্তু দার্শনিক জ্যাক রুশোর প্রভাব তাঁকে আইন ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার গড়তে পরিচালিত করেছিল।

8.4 শিক্ষাক্ষেত্রে পেস্তালৎসির অবদান (Contribution of Pestalozzi in the field of Education)

8.4.1 'মাথা', 'হৃদয়' ও 'হাত'-এর বিকাশের মাধ্যমে শিখন (Learning through the development of 'Head', 'Heart' and 'Hands')

জোহান হাইনরিখ পেস্তালৎসি শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন অনেক কৃষক পড়তে ও লিখতে পারত না, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা সুইসদের সবার কাছে সাক্ষরতা আনতে অনুপ্রাণিত করেছিল। পেস্তালৎসি শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রমের প্রতি যত্নশীল ছিলেন না। তিনি 'মাথা', 'হৃদয়' ও 'হাত'-এর মাধ্যমে শেখার জন্য একটি সম্পূর্ণ শিশু পদ্ধতির প্রচার করেছিলেন। ইহা পাঠ্যক্রমের মধ্যে হ্যান্ড-অন, সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। পেস্তালৎসির মতে শিশুরা পাঠ্য বিষয় অধ্যয়নের পাশে মাঠে কাজ করবে এবং কারুশিল্প শিখবে।

শিক্ষা-সংস্কারে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা ছিল দরিদ্র কৃষক শিশুদের জন্য একটি স্কুল তৈরী করা যা Neuhof নামে পরিচিত। সংস্কারের এই প্রথম প্রচেষ্টাটি আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের উপায় হিসেবে পণ্য উৎপাদনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। Neuhof-এ শিশুরা তাদের নিজস্ব কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করত। পেস্তালৎসি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা শিশুদেরকে তাদের নিজস্ব টেক্সটাইল পণ্য তৈরী ও বিক্রি করতে শেখায় এবং দারিদ্রের কবল থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। তবে Neuhof এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু পেস্তালৎসি অবশেষে স্কুলে পড়াশুনার জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলেন যা "পেস্তালৎসি পদ্ধতি" নামে পরিচিত। পেস্তালৎসি পদ্ধতি হল একটি সম্পূর্ণ শিশু পদ্ধতি যা একজন ব্যক্তির 'মাথা', 'হৃদয়' ও 'হাত' সহ সমস্ত দিকগুলির বিকাশের উপর জোর দেয়। পেস্তালৎসি বিশ্বাস করতেন যে, এই পদ্ধতি এমন ব্যক্তি তৈরী করতে সাহায্য করবে যার বুদ্ধি দিয়ে ও হৃদয় দিয়ে সঠিক ও ভুল জানতে এবং এই জ্ঞান অনুসারে কাজ করতে সক্ষম হবে।

8.4.2 পেস্তালৎসি কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন (Establishment of different Institutes by Pestalozzi)

জোহান হাইনরিখ পেস্তালৎসি সুইজারল্যান্ডের জার্মান ভাষী এবং ফরাসি-ভাষী উভয় অঞ্চলে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

"নিউহফ"

বেশ কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে পেস্তালৎসি একজন কৃষক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই সময়ে জোহান রুডলফ শিফেলি পেস্তালৎসির ব্যবসায়িক মডেল সম্পর্কে ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। 1769 খ্রিস্টাব্দে পেস্তালৎসি জুরিখের আশেপাশে 15 একর চাষের অনুপযোগী জমি কিনেছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি জুরিখের একজন ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন। পেস্তালৎসি ঐ জমিতে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তার নাম দেন "নিউহফ" (Neuhof)। জমিটি অনাবাদী হওয়ায় তাঁর কৃষি উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। তখন তিনি "নিউহফ"কে একটি শিল্প বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 1777 খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি আবার ধ্বংসের মুখে পড়ে এবং 1779 খ্রিস্টাব্দে 'নিউহফ' বন্ধ হয়ে যায়। তবে তাঁর বন্ধুদের সাহায্যে তিনি নিজের ও পরিবারের বসবাসের জন্য Neuhof-এ বাড়িটি বাঁচাতে সক্ষম হন।

স্ট্যান্সের এতিমখানা

1798 খ্রিস্টাব্দে যখন সুইজারল্যান্ডে দাসত্ব বিলুপ্ত হয়, তখন পেস্তালৎসি শিক্ষাবিদ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একটি স্কুলের জন্য একটি পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করে ফিলিপ অ্যালবার্ট স্ট্যাফফারের কাছে জমা দেন, যিনি কলা ও বিজ্ঞানের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পেস্তালৎসির পরিকল্পনা অনুমোদন করেন, কিন্তু উপযুক্ত স্থান না পেয়ে তখনই বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হননি। ঐ বছরেই তখন ফরাসি সেনাবাহিনী 'স্ট্যান্স' শহরে আক্রমণ করেছিল, তখন অনেক শিশু গৃহহীন ও পরিবার হীন হয়েছিল। তখন সুইস সরকার একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য 1798 খ্রিস্টাব্দের 5 ডিসেম্বর পেস্তালৎসিকে নিয়োগ করে। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি বলেছিলেন যে শিশুদের শরীর ও মন উভয়ই ভয়ঙ্কর অবস্থায় ছিল। ঐ প্রতিষ্ঠানে তখন তাঁর শুধুমাত্র একজন সহকারী ছিলেন একজন গৃহকর্ম্মী। তাঁর লক্ষ্য ছিল ঐ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও শিল্পের সমন্বয় ঘটানো। তিনি মনের মৌলিক ক্রিয়াকলাপগুলি যেমন মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ এবং স্মৃতিশক্তি এগুলিকে শিল্পের আগে ভালভাবে তৈরী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 1799 খ্রিস্টাব্দের জুনে ফরাসি সেনাবাহিনী অস্ট্রিয়ানদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর স্ট্যান্সকে ফিরিয়ে নেয়। এতিমখানার স্বল্প সময়েও শিশুদের মঙ্গলের ক্ষেত্রে পেস্তালৎসির সাফল্য স্পষ্ট ছিল। তিনি ভবনগুলি সেনামুক্ত হলে এতিমখানায় ফিরে যাওয়ার আশা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

বার্গডর্ফ

বার্গডর্ফ (Burgdorf) সুইজারল্যান্ডের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর। পেস্তালৎসি ঐ শহরে সর্বনিম্ন স্কুলে শিক্ষকতার পদ পেয়েছিলেন। কিছুদিন পর তাঁকে একটি ভিন্ন স্কুলে স্থানান্তর করা হয়েছিল। 1800 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীতে একজন তরুণ শিক্ষক সহকারী, হারমান ক্রুসি, পেস্তালৎসিকে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত হন। আট মাস শিক্ষকতার পর, স্কুল কর্তৃপক্ষের দ্বারা পেস্তালৎসিকে মূল্যায়ন করা হয় এবং তাঁর

অগ্রগতির জন্য তাঁর প্রশংসা করা হয়। আট মাসে তিনি কেবল পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের নিখুঁতভাবে পড়তেই শেখাননি, লিখতে, অঙ্কন করতে ও পাটিগণিতও শিখিয়েছিলেন। স্কুল বোর্ড তাঁকে দ্বিতীয় ছেলেদের স্কুলে মাস্টারশিপে উন্নীত করে, যেখানে তিনি তাঁর শিক্ষকতা চালিয়ে যান। তাঁর সাফল্যের দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে, 1800 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে পেস্তালৎসি বার্গডর্ফ দুর্গে আর একটি স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেন, যার নাম "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিশুদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"। এখানে তাঁর সাথে দুই শিক্ষাবিদ যোগ দেন, জোহান জর্জ টোবলার এবং জোহান ক্রিস্টফ বুস। ঐ সময়ে পেস্তালৎসি একটি বই প্রকাশ করেন, যার নাম "How Gatrud teaches her children", যা চৌদ্দটি চিঠির আকারে লেখা। বইটিতে শিক্ষাসংক্রান্ত নির্দেশনা, শিক্ষাগত তত্ত্বের প্রতিফলন ও অভিজ্ঞতা এবং ধর্মীয় শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। এই সাহিত্যিক সাফল্যের কারণে, সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানীর সমস্ত অঞ্চল থেকে বার্গডর্ফের স্কুলটি দেখতে আসত। পেস্তালৎসি সুইস সরকারের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন ঐ স্কুলের জন্য আরও সুযোগ সুবিধে চেয়ে। প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাঁর কাজ তদন্ত করতে দুই কমিশনারকে পাঠানো হয় এবং তাঁদের অনুকূল রিপোর্টের জন্য সরকার পেস্তালৎসির স্কুলটিকে একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়। 1801 খ্রিস্টাব্দে পেস্তালৎসির পরিবার তাঁর প্রতিষ্ঠানে বসবাস করার জন্য "নিউহফ" থেকে 'বার্গডর্ফে' চলে আসেন। 1804 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে পেস্তালৎসি বার্গডর্ফের কাজ শেষ করে "মুনচেনবুচসি"-তে চলে আসেন। সেখানে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন, শেষ পর্যন্ত 1805 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটিকে 'ইভারডন'-এ (Yverdon) স্থানান্তর করেন।

ইভারডন

ইভারডনের স্কুলটি পেস্তালৎসির প্রচেষ্টার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ছিল। 1805 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ইভারডনে ইনস্টিটিউট খোলা হয় এবং ইহা সমগ্র ইউরোপ থেকে দর্শক ও ছাত্রদের আকর্ষণ করে। এই ইনস্টিটিউটের কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, যে কোন বয়সের ছাত্ররা এখানে ভূগোল, প্রাকৃতিক ইতিহাস, ইতিহাস, সাহিত্য, পাটিগণিত, জ্যামিতি, জরিপ, অঙ্কন এবং গানের পাশাপাশি জার্মান, ফরাসি, ল্যাটিন এবং গ্রীক শিখতে পারতেন। প্রতিষ্ঠানের খ্যাতির উচ্চতায় পেস্তালৎসি একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে এবং শিক্ষাগত সংস্কারে তাঁর কাজের জন্য অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির বহু উত্থান-পতনের পর 1825 খ্রিস্টাব্দে তহবিলের অভাবের কারণে ইনস্টিটিউটটি বন্ধ হয়ে যায়।

8.5 পেস্তালৎসির শিক্ষা চিন্তা (Educational Thoughts of Pestalozzi)

8.5.1 শিশুর সুসম বিকাশে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি (Psychological basis of balanced development of the Child)

পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শন তাঁর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ফসল। প্রকৃতিবাদী রুশোর নেতিবাচক শিক্ষা ও ফলাফল ভিত্তিক শিক্ষাকে তিনি পুরোপুরি সমর্থন করেন নি। তিনি শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর মনস্তত্ত্বের

ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে শিক্ষা হলো শিশুর শক্তি, সামর্থ ও মানসিক বৃত্তিগুলোর স্বাভাবিক ও সুসম বিকাশ সাধন। তাই শিশুর মানসিক প্রকৃতি ও সামর্থের দিকগুলোর সঙ্গে শিক্ষককে সম্যক ভাবে পরিচিত হতে হবে। শিক্ষার্থীর সহজাত মানসিক ক্ষমতা ও প্রবণতার ওপর ভিত্তি করে রচিত পাঠক্রম তাকে শিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। এর ফলে সত্যিকারের শিক্ষা সম্ভব হবে। মূলত তিনি শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করে বলেন—"I wish to psychologize education"—"আমি শিক্ষাকে মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চাই।" তিনি শিশুকে চারাগাছ এবং শিক্ষককে মালীর সাথে তুলনা করেছেন। শিক্ষকরূপী এই মালীর পরিচর্যায় শিশু চারাগাছের মতো বড় হয়ে ওঠে, বিকশিত হয়।

পেস্তালৎসি শিক্ষাকে নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান উপায় বলে মনে করেন। Leonard and Gertrude গ্রন্থে উল্লিখিত শিক্ষা পরিকল্পনায় তিনি দেখিয়েছেন যে, শিক্ষা কেবল শিক্ষার্থীর মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করে তাই নয়, সেইসঙ্গে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে অনুরূপ সংস্কার ও পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা পরিবেশের আমূল পরিবর্তন তার শিক্ষাদর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য। গতানুগতিক বিদ্যালয়ের কৃত্রিম, রুক্ষ ও বাধানিষেধপূর্ণ পরিবেশকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে তিনি সেখানে ভালবাসা ও সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করার কথা বলেন।

8.5.2 শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষণ পদ্ধতি (Objectives of Education and Teaching Method)

শিক্ষার উদ্দেশ্য

পেস্তালৎসির মতে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি হল—

- স্কুলের কৃতিত্বের পরিপূর্ণতা নয়, জীবনের জন্য সুস্থতা, অন্ধ আনুগত্য এবং নির্ধারিত পরিশ্রমের অভ্যাস অর্জন নয়, বরং পরস্পর নির্ভরশীল কর্মের প্রস্তুতি।
- জ্ঞান প্রদানের জন্য নয় বরং প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে লুকানো বা লুকিয়ে থাকা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকাশ করা।
- পেস্তালৎসি শিক্ষার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য প্রস্তাব করেন—ব্যক্তির বিকাশ ও সামাজিক উন্নতি। তিনি শিক্ষাকে সামাজিক অবস্থার উন্নতির কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে দেখেন।

শিক্ষণ পদ্ধতি

- শিক্ষণ পদ্ধতি হবে শিশুকেন্দ্রিক, পাঠক্রমকেন্দ্রিক নয়।
- শিক্ষক নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে পাঠদানের উপর জোর দেবেন না, বরং শিশুকে তার নিজে থেকে উত্তর আবিষ্কারের জন্য তাকে উৎসাহ দেবেন।

- পাঠ্যপুস্তকের উপর জোর না দিয়ে সরাসরি প্রকৃতি থেকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- পেস্তালৎসি আরোহ পদ্ধতিতে পাঠদানের মত প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ শিশু প্রথমে প্রত্যক্ষণ করবে, তার নিজের ত্রুটি সংশোধন করবে, বিশ্লেষণ করবে এবং তার অনুসন্ধানের বিষয় বর্ণনা করবে। শিশু তার সরল উদ্দেশ্য ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অধিক জটিল এবং বিমূর্ত বস্তু সম্পর্কে জানবে। এরপরেই শিশু বই ব্যবহার করবে।
- পেস্তালৎসি শিশুকে প্রকৃতি থেকে আরও অধিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তার প্রাথমিক পাঠক্রমকে প্রসারিত করে ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান, চারুকলা এবং সঙ্গীতকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন।
- পেস্তালৎসি তাঁর দীর্ঘ পরীক্ষণের ভিত্তিতে একটি নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তিনি এই পদ্ধতির নাম দেন "বস্তুভিত্তিক পাঠদান"। এই পদ্ধতির মূলনীতি হলো, নিছক ভাবের মাধ্যমে শিক্ষা না দিয়ে কোন মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে দেওয়া উচিৎ। এর ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান বাস্তবধর্মী ও স্থায়ী হবে। তাছাড়া শিশুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। পেস্তালৎসির বস্তুভিত্তিক পাঠদানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বাস্তব কাজ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তার সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তার সুসম বিকাশ ও উন্নতি সাধন ঘটবে। বিভিন্ন বিষয় শিক্ষণে পেস্তালৎসি তাঁর এই পদ্ধতিটি সফল ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন।

8.6 সারাংশ (Summary)

পেস্তালৎসির জীবনকাল 1746–1827 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যপ্ত। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্যেও তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে ধরে রেখেছিলেন। তিনি দার্শনিক রুশোর আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনের অবাস্তব দিকগুলো পরিহার করে তার আমূল সংস্কার সাধন করেন। তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাদর্শন শিশুশিক্ষার আধুনিক ভিত্তি রচনা করেন। শিক্ষায় মনস্তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর একটি যুগান্তকারী অবদান। শিক্ষাকে তিনি শিশুর চাহিদা এবং জীবনের চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বস্তুভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠদানের বিষয়বস্তু নির্বাচন— এ সবই তাঁর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার ফসল।

8.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. পেস্তালৎসির পারিবারিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

2. পেস্তালৎসির শিক্ষা সম্পর্কে লিখুন।
3. পেস্তালৎসির মতানুসারে 'Head', 'Heart' and 'Hands' বিকাশের মাধ্যমে শিখন তত্ত্ব আলোচনা করুন।
4. পেস্তালৎসি কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিবরণ দিন।
5. শিশুর সুসম বিকাশে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে পেস্তালৎসির মতবাদ লিখুন।
6. পেস্তালৎসির মতানুসারে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে লিখুন।

8.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- Johann Heinrich Pestalozzi, Wikipedia.https://en.m.wikipedia.org, Retrieved on 16.04.2024
- Johann Heinrich Pestalozzi,https"//wikipedia-org. translate,google, Retrieved on 16.04.2024
- Johann Heinrich Pestalozzi : Swies Educator & Social Reformer, Britannica, https://www.britannia.com, Retrieved on 17.04.2024
- Pestalozzi The Father of Modern Education, Pestalozzi World, https://pestolozziworld.com, Retrieved on 17.04.2024
- Johann Heinrich Pestalozzi, New World Encyctopedia,https://www.newworldencyctopedia.org, Retrieved on 18.04.2024
- ইউনিট ৫, শিক্ষা দার্শনিক (২), BOU E-Book, https://www.ebookbon, edu,bd, Retrieved on 19.04.2024

একক 9 ❑ ফ্রেডরিখ উইলহেম অগাস্ট ফ্রোবেল (Friedrich Wilhelm August Froebel)

গঠন

9.1 উদ্দেশ্য **(Objectives)**

9.2 ভূমিকা **(Introduction)**

9.3 ফ্রেডরিখ ফ্রোবেলের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা এবং কর্মজীবন **(Family Life, Education and Service life of Friedrich Froebel)**

9.3.1 ফ্রেডরিখ ফ্রোবেলের পারিবারিক জীবন **(Family Life of Friedrich Froebel)**

9.3.2 ফ্রেডরিখ ফ্রোবেলের শিক্ষা **(Education of Friedrich Froebel)**

9.3.3 ফ্রেডরিখ ফ্রোবেলের কর্মজীবন **(Service Life of Friedrich Froebel)**

9.4 ফ্রোবেলের 'কিন্ডারগার্টেন' ধারণা **("Kindergarten" Concept of Froebel)**

9.4.1 'কিন্ডারগার্টেন' শিক্ষার উৎপত্তি ও ধারণা **(Origin and Concept of Kindergarten Education)**

9.4.2 'কিন্ডারগার্টেন' শিক্ষার বিস্তার **(Expansion of Kindergarten Education)**

9.4.3 'ফ্রোবেল উপহার' নামক শিক্ষামূলক খেলার ধারণা **(Concept of Froebelian Gifts)**

9.5 শৈশব শিক্ষার জন্য ফ্রোবেলিয় পদ্ধতি **(Froebelian Approach to Early Childhood Education)**

9.5.1 শৈশব শিক্ষার জন্য ফ্রোবেলিয় নীতিমালা **(Froebelian Principles on Early Childhood Education)**

9.5.2 শৈশব শিক্ষার জন্য ফ্রোবেলিয় পদ্ধতির অনুশীলন **(Practicing the Frobelian Approach to Childhood Education)**

9.5.3 ফ্রোবেলিয় ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার পাঠক্রম **(Curriculum of Education according to Froebelian concept)**

9.6 সারাংশ **(Summary)**

9.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

9.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

9.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- ফ্রেডরিখ ফ্রোবেলের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- 'কিন্ডারগার্টেন' শিক্ষার উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- 'কিন্ডারগার্টেন' শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শৈশব শিক্ষার জন্য ফ্রোবেলিয় নীতিমালা জানতে পারবেন।
- শৈশব শিক্ষার জন্য ফ্রোবেলিয় পদ্ধতির অনুশীলন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

9.2 ভূমিকা (Introduction)

ফ্রেডরিখ উইলহেম অগাস্ট ফ্রোবেল (21 এপ্রিল 1782–21 জুন 1852) ছিলেন একজন জার্মান শিক্ষাবিদ যিনি জোহান হেনরিখ পেস্তালৎসির একজন ছাত্র ছিলেন। ফ্রেডরিখ ফ্রোবেল শিশুদের অনন্য চাহিদা এবং ক্ষমতার স্বীকৃতির ভিত্তিতে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি 'কিন্ডারগার্টেন' শব্দটি তৈরী করেন এবং কিন্ডারগার্টেনের ধারণা দেন, যা শীঘ্রই ইংরেজি ভাষায়ও প্রবেশ করে ও বিস্তার লাভ করে। তিনি "ফ্রোবেল উপহার" নামে পরিচিত শিক্ষামূলক খেলনারও ধারণা দেন। যেগুলি গান এবং সঙ্গীতের সাথে খেলার ক্রিয়াকলাপগুলির মাধ্যমে লেখার জন্য উদ্দীপ্ত কররা জন্য নকশা করা হয়েছিল। কিন্ডারগার্টেন এবং প্রিস্কুলের আধুনিক শিক্ষাগত কৌশলগুলি তাঁর কাছে ঋণী।

ফ্রোবেল বিশ্বাস করতেন যে শৈশবই খেলা শেখার মূল সময়। খেলার মাধ্যমে শিশুরা বিশ্ব সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি তৈরী করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। শিশুর প্রকৃতির মাধ্যমে শেখার বিষয়ে তাঁর ধারণা ও খেলার গুরুত্ব সারা বিশ্বে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলো। খেলার অধিকার জাতিসংঘের শিশু অধিকার কনভেনশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে শিশুদের খেলার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্কদের নির্দেশনা ছাড়াই শিশুরা যাতে নিজেদের উপভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করার গুরুত্ব এখন ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে।

9.3 ফ্রেডরিখ ফ্রোবেলের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা এবং কর্মজীবন (Family Life, Education and Service life of Friedrich Froebel)

9.3.1 ফ্রেডরিখ ফ্রোবেলের পারিবারিক জীবন (Family Life of Friedrich Froebel)

ফ্রেডরিখ ফ্রোবেল 1782 খ্রিস্টাব্দে 21 এপ্রিল ওবারওয়েইসবাখ, থুরিংগিয়ায় (বর্তমানে জার্মানী) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম Johann Jakob Froebel এবং মায়ের নাম Jakobine Eleonore Friederika Hoffmann। ফ্রোবেল ছিলেন তাঁর বাবা মায়ের পঞ্চম ও কনিষ্ঠতম সন্তান। তাঁর বয়স যখন মাত্র 9 মাস, তখন তাঁর মা মারা যান। তাঁর কাকা তাঁকে বড় করেন এবং একটা স্কুলে পাঠান। এর আগে তিনি তাঁর বাবার কাছে খুব অবহেলিত ছিলেন এবং সেটা চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তাঁর বাবা যখন 1785 খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বিবাহ করেন।

ফ্রেডরিখ ফ্রোবেল 10 বছর বয়সে তাঁর মামা, Herr Hoffmann-এর কাছে থাকার জন্য পার্শ্ববর্তী Stadtilm-এ যান। তাঁর মামা তাঁর বাবার তুলনায় অপেক্ষাকৃত দয়ালু ও নরম প্রকৃতির ছিলেন। তখন তিনি পিত্রালয়ের কঠোর অনুশাসনের থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন। তিনি তখন ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস দার্শনিক ভাববাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পঠনপাঠনগত নীতি ও ভিত্তি নির্ধারণে সাহায্য করে। 15 বছর বয়সে 1797 খ্রিস্টাব্দে ফ্রোবেল থুরিংগিয়া বনে Herr Witz নামক এক বন বিশারদের শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন, তখন তিনি জমি সমীক্ষা ও মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। 17 বছর বয়সে 1799 খ্রিস্টাব্দে University of Jena তে উচ্চশিক্ষার জন্য যান এবং দুই বছর পর বাড়ী ফিরে যান, তখন বাবা মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন। 1802 খ্রিস্টাব্দে তাঁর বাবা মারা যান, তখন ফ্রোবেল 20 বছর বয়সে চিরতরে জন্মস্থান ছেড়ে চলে যান।

1805 খ্রিস্টাব্দে ফ্রোবেল Franfurt-এ যান এবং বিখ্যাত সুইস শিক্ষক Johann Pestalozzi (1746–1827) সম্পর্কে অবগত হন। তিনি কিছুদিন পরই Frankfurt থেকে Yverdon-এ যান যেখানে Pestalozzi একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। 1806–1811 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত Baronvon Holzhansen এর তিনটি ছেলের গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। Froebel তাঁর তিন ছাত্রকে Yverdon-এ Pestalozzi-এর স্কুলে ভর্তি করান। Froebel তাঁর ছাত্রদের মা Caroline von Holzhansen এর সাথে প্রণয়াবদ্ধ হন এবং 1812 খ্রিস্টাব্দে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান Hector এর জন্ম হয়। 1816 খ্রিস্টাব্দে তাঁদের সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটে। ছেলেদের বাবা Baron ছেলেদের জন্য একটি জমি রেখে দিয়েছিলেন। ফ্রোবেল তাঁর ছাত্রদের ঐ জমিতে ফুলের বাগান তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন এবং ঐ বাগানটির নাম দিয়েছিলেন যুগান্তরী 'Kindergarten', যার অর্থ শিশুদের বাগান বা 'Children-garden'.

1818 খ্রিস্টাব্দে ফ্রোবেল Wilhelmine Henriette Hoffmeister কে বিবাহ করেন, যার সাথে

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচয় হয়েছিল। Wilhelmine সিভিল সার্ভিসের মহিলা ছিলেন এবং ফ্রোবেলের থেকে দুই বছরের বড় ছিলেন। 1836 খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর স্ত্রী 'হেনরিয়েট' সুইস পাহাড়ের খারাপ আবহাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন, ফ্রোবেল হেন্‌রিয়েটকে নিয়ে জার্মানিতে চলে আসেন। 1839 খ্রিস্টাব্দে হেনরিয়েটের মৃত্যু হয়। অতঃপর ফ্রোবেল বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন স্কুল পরিচালনা করেন। 1851 খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার বিয়ে করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম লুইস লেভিন। ফ্রোবেল 1852 খ্রিস্টাব্দের 21 জুন 70 বছর বয়সে থুরিংগিয়ার ম্যারিয়েনথালে মারা যান।

9.3.2 ফ্রেডরিখ ফ্লোবেলের শিক্ষা (Education of Friedrich Froebel)

ফ্রোবেলের জন্মের 9 মাস পর তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। তারপর তাঁর বাবার কাছে শৈশব খুব দুঃখের মধ্যে কাটে। সেই সময়টা তাঁর বাড়ীর চারিপার্শ্বে বিভিন্ন বাগান ও বনে খেলা করতেন যার মাধ্যমে তাঁর প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা তৈরী হয় এবং ইহা তাঁর সারা জীবনব্যাপী বিদ্যমান ছিল। তাঁর বাবার অনুরোধে তিনি ওবারওয়েইসবাচে একটা মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। 1793 থেকে 1798 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি স্ট্যাডইলমে তাঁর মামা হফম্যানের সাথে থাকতেন। যখন তিনি স্থানীয় শহরের একটা স্কুলে পড়াশুনা করতেন।

15 বছর বয়সে ফ্রোবেল একজন ফরেস্টারের শিক্ষানবিস হয়েছিলেন। 1799 খ্রিস্টাব্দে তিনি শিক্ষানবিশ ত্যাগ করেন এবং 1800–1802 পর্যন্ত তিনি গণিত ও উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। 1805 খ্রিস্টাব্দে ফ্রোবেল Frunkfurt-এ স্থাপত্য বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এরপর Frankfurt Model School-এর প্রধান শিক্ষক অ্যান্টন গ্রুয়েনার তাঁকে একজন শিক্ষক হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য Yverdon-এ জোহান হেনরিখ পেস্তালৎসির সাথে একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স করার ব্যবস্থা করেন। ফ্রোবেল বিশ্বাস করতেন যে শিশুদের মর্যাদার প্রতি পেস্তালৎসির সম্মান এবং মানসিক নিরাপত্তার শিক্ষার পরিবেশ তৈরী করা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষাগত উপাদান যা তিনি তাঁর নিজের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি পেস্তালৎসির ফর্ম, সংখ্যা ও নামের পাঠ দ্বারাও আগ্রহী হয়েছিলেন, যা কিন্ডারগার্টেন উপহারগুলির তাঁর পরবর্তী নকশার ভিত্তি করবে।

1810 থেকে 1812 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গটিংজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। 1812 থেকে 1816 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে খনিজবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন।

9.3.3 ফ্রেডরিখ ফ্রোবেলের কর্মজীবন (Service Life of Friedrich Froebel)

ফ্রেডরিখ ফ্রোবেল কর্মজীবনের শুরুতে 1804 থেকে 1805 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত Gut Gross Miltzow-এ Otto Uttrich von Dewitz-এর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 1805 খ্রিস্টাব্দে তিনি Frankfurt-এর Pestalozze Model School-এ একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে কাজ শুরু করেন। 1806 থেকে 1811 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কফুটের সম্ভ্রান্ত ভন হোলজাউসেন পরিবারের তিন ছেলের

গৃহ শিক্ষক ছিলেন। 1813 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ফ্রিকর্পসে তিনি গ্রোসগর্শেনের যুদ্ধে অংশ নেন। 1814 খ্রিস্টাব্দে তিনি বার্লিনের খনিজবিদ্যা ইনস্টিটিউট এবং মিউজিয়ামে ওয়েইসের একজন সহকারী হন। এরপর তিনি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।

1837 খ্রিস্টাব্দে ফ্রোবেল থুরিঙ্গিয়ায় ফিরে আসেন এবং নিজেকে একচেটিয়াভাবে প্রি-স্কুল বয়সের শিশুদের শিক্ষিত করার জন্য নিবেদিত করেন। সেখানে শিক্ষাবিদ হিসেবে ছোট শিশুদের জন্য একটি "যত্ন, খেলা এবং কার্যকলাপ কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করেন। 1838 থেকে 1840 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের জন্য Ein Sonntagsblatt পত্রিকা প্রকাশ করেন। 1842 খ্রিস্টাব্দে ব্ল্যাঙ্কেনবার্গে Kindergarten শিক্ষক কোর্স শুরু করেন। ইডা সিলে (Ida Seele) তাঁর প্রথম ছাত্রদের একজন যিনি পরবর্তীতে তাঁর Kindergarten ধারণাকে সমর্থন করেছিলেন। 'ইডা' বিশ্বের প্রথম কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হন। পরের দশ বছরকাল ফ্রোবেল তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত Kindergarten শিক্ষার প্রসার ও চিন্তাভাবনা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন।

9.4 ফ্রোবেলের 'কিন্ডারগার্টেন' ধারণা ("Kindergarten" Concept of Froebel)

9.4.1 'কিন্ডারগার্টেন' শিক্ষার উৎপত্তি (Origin of Kindergarten Education)

ফ্রোবেল 1806 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে Baron Von Holzhansen এর তিনটি ছেলেকে ব্যক্তিগত শিক্ষক হিসেবে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে পড়ানোর জন্য একটি কাজ পেলেন। যদিও এটা দীর্ঘস্থায়ী কাজ নয়, তবুও তখন শিক্ষিত যুবকদের গৃহশিক্ষক হিসেবে কাজ করার প্রচলন ছিল। ফ্রোবেল মডেল স্কুলের স্থায়ী শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিয়ে Holzhansen ছেলেদের পড়ানোর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তখন তাকে পূর্ণ সময়ের গৃহশিক্ষক হিসেবে 1807 থেকে 1811 পর্যন্ত Holzhansen ছেলেদের সাথে শহরে না থেকে গ্রামে থাকতে বলা হয়েছিল। বাচ্চাদের মায়ের সাথে বাবার কলহের কারণে ছেলেদের তাদের বাবার প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা হয়েছিল। 1808 থেকে 1810 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দুই বছর Yverdon-এ পেস্তালৎসির স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে ফ্রোবেল তাঁর ছাত্রদের মা Caroline Von Holzhansen এর সাথে প্রণয়াবদ্ধ হন এবং 1816 পর্যন্ত Caroline কে অনেক আবেগময় চিঠিপত্র লেখেন। তবে একসময়ে তাদের সম্পর্কে ছেদ ঘটে এবং ক্যারোলিন ফ্রোবেলের ব্যক্তিগত উপহার প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু অন্যভাবে এই ঘটনার একটা স্থায়ী প্রভাব পড়ে। Baron Von Holzhansen তার ছেলেদের জন্য একটি জমি পৃথক করে রাখেন এবং ফ্রোবেল ঐ জমিতে ফুলবাগান তৈরি করার জন্য ছেলেদের সহায়তা করতেন। এই ঘটনাই পরবর্তীতে 'Kindergarten' দর্শনের উৎপত্তির রূপক তাৎপর্য হিসেবে গণ্য হয়। 'Kindergarten' কথাটির অর্থ 'Children-garden' অর্থাৎ 'শিশুদের বাগান'। ফ্রোবেল তার ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন খেলার জিনিস তৈরী করেছিলেন, যা ফ্রোবেলকে শিশুদের জন্য 'Gifts' বা উপহার এই নাম দিতে উৎসাহিত করেছিল।

ফ্রেডরিখ ফ্রোবেল উনবিংশ শতাব্দীর সবথেকে প্রভাবশালী শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি প্রচলিত ধারণা পাল্টে দিয়ে বলেন, প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। তিনি বলেন, ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রের সুস্বাস্থ্য ও আনন্দ প্রাক-বিদ্যালয়ের উন্নতির উপরই নির্ভর করে, কিন্তু সেই সময় তার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তিনিই 'Kindergarten' শব্দের উদ্ভাবক ও ঐ ধারণার প্রবক্তা। যখন শিক্ষকতা শুধুমাত্র পুরুষের পেশা ছিল, তখন ফ্রোবেল মহিলা কিন্ডারগার্টেন শিক্ষিকাদের শিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করেন।

শিশুদের জন্য একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরীর জন্য ফ্রোবেলের মনে দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি হয়। Bad Blankenburg-এ Town Council-এর একটি ভবনে ফ্রোবেল 1839 খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় খোলেন। তিনি বিদ্যালয়টির নাম দেন "Play and Activity Institute"। ফ্রোবেল একটা পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "Hey, let's live our lives so our children may benefit." কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজনৈতিক কারণে 1852-এ ফ্রোবেলের মৃত্যুর এক বছরেরও কম সময় আগে সরকার সমস্ত কিন্ডারগার্টেন স্কুল বন্ধ করে দেয়। তবে ভবিষ্যতে তাঁর কিন্ডারগার্টেন ধারণা মর্যাদা পায়।

9.4.2 'কিন্ডারগার্টেন' শিক্ষার বিস্তার (Expansion of Kindergarten Education)

ফ্রেডরিখ ফ্রোবেল 1837 খ্রিস্টাব্দে জার্মানির ব্ল্যাঙ্কেনবার্গে চলে আসেন এবং সেখানে 1839 খ্রিস্টাব্দে 'Play and Activity Institute' নামক প্রথম Kindergarten স্কুল খোলেন। ফ্রোবেল জার্মান নারীদের কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষিকা হওয়ার আহ্বান জানান এবং তাঁর কিন্ডারগার্টেন ধারণাকে সমর্থন করতে বলেন। যেহেতু 'Kinder' অর্থ শিশু এবং 'garden' অর্থ বাগান। তাই 'Kindergarten' কথাটির অর্থ হলো "শিশুদের বাগান"। ফ্রোবেল শিশুদের গাছপালা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মালী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ফ্রোবেল খেলার উপর জোর দিয়েছিলেন, যা সাধারণ খেলা দিয়ে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে জটিল খেলা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তিনি খেলার জিনিসকে শিশুদের জন্য 'উপহার' (Gifts) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ফ্রোবেল কিন্ডারগার্টেন ধারণাকে পরিমার্জিত করতে দশ বছর অতিবাহিত করেন এবং শেষ পর্যন্ত 20টি 'উপহার' বা শিক্ষামূলক খেলনা, গান প্রভৃতি তৈরী করেন।

জার্মানি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তর

কিন্ডারগার্টেন ধারণার স্থানান্তর শুরু হয়েছিল 1848 খ্রিস্টাব্দে, যখন জার্মানরা বিপ্লবের কারণে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। 1851 খ্রিস্টাব্দে জার্মান সরকার সমস্ত কিন্ডারগার্টেন স্কুল বন্ধ করে দেয়, তবে ভবিষ্যতে তাঁর কিন্ডারগার্টেন ধারণা মর্যাদা পায়। মার্গারেথা মেয়ার শুর্জ ফ্রোবেলের অধীনে জার্মানিতে পড়াশুনা করেছিলেন। 1855 খ্রিস্টাব্দে তিনি তার বাড়িতে কিন্ডারগার্টেন স্কুল খোলেন। 1859 খ্রিস্টাব্দে মার্গারেথা শুর্জের সাথে এলিজাবেথের (Elizabeth Peabody) একটা বৈঠক হয়, যখন এলিজাবেথ 'কিন্ডারগার্টেন' শিক্ষায় আগ্রহী হন।1960 খ্রিস্টাব্দে তিনি ম্যাসাচুসেটসের বোস্টনে প্রথম ইংরেজি মাধ্যম কিন্ডারগার্টেন খোলেন। আমেরিকান কিন্ডারগার্টেনে ফ্রোবেলের ধারণাকে সত্যিকার অর্থে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এলিজাবেথ পিবডি (Elizabeth Peabody) ফ্রোবিলিয়ান কিন্ডারগার্টেন অধ্যয়ন করতে জার্মানীতে গিয়েছিলেন। তিনি জার্মান ফ্রোবেল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রোবেলিয়ান কিন্ডারগার্টেনের প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্ডারগার্টেনের বৃদ্ধি এবং আন্দোলন শুরু হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্ডারগার্টেন আন্দোলন

সেন্ট লুইস পাবলিক স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট উইলিয়াম টি. হ্যারিসের সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে এলিজাবেথ পিবডি কিন্ডারগার্টেন আন্দোলনকে উন্নীতকরার চেষ্টা করেছিলেন। সুসান ব্লো ইউরোপে ফ্রোবেলের স্ত্রীর কাছে Kindergartening শিখেছিলেন। 1873 খ্রিস্টাব্দে সুসান ব্লো এবং উইলিয়াম টি. হ্যারিসের নির্দেশনায় সেন্ট লুইস প্রথম কিন্ডারগার্টেন খোলার সাথে সাথে কিন্ডারগার্টেন সম্প্রসারণ শুর হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কিন্ডারগার্টেন আন্দোলন খুব প্রগতিশীল হয়ে ওঠে। বিনা খরচে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং একটি কিন্ডারগার্টেনকে একটা কমিউনিটি স্টোর হিসেবে দেখা হতো। সুসান ব্লো ফ্রোবেলের নীতি চালু করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু প্যাটি স্মিথ হিল ফ্রোবেলিয় নীতিকে একটু কঠোর বলে মনে করেন। হিল অনুভব করেন যে, একটি আগ্রহগুলি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার সাথে মিলিত হওয়া উচিত। তিনি নতুন আমেরিকান কিন্ডারগার্টেনের জন্য নতুন গান, উপহার এবং পেশার বিকাশ ঘটাতে শুরু করেন।

1960 এর দশকে জ্যাঁ পেঁয়াজে এবং মারিয়া মন্টেসরির তত্ত্বও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে, যা অনেকটা ফ্রোবেলের প্রথম দিককার কিন্ডারগার্টেন তত্ত্বের অনুরূপ। তবে ঐ সময়ে বিভিন্ন সংগঠন এবং পিতা-মাতারা শিশুদের খেলার সাথে সাথে আরও বেশী পঠন-পাঠন গত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। তারা পড়া, পাটিগণিত ও লেখার উপর জোর দেয়। অন্যদিকে কিছু অভিভাবক মনে করেন যে শিশুদের পাঠক্রম প্রকৃতি নির্ভর এবং কম শেখার প্রক্রিয়ার উপর হওয়া উচিত। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয়—"Hurry–Hurry–Hurry and Don't Push Me"–শিক্ষাতত্ত্ব। তবে ক্রমান্বয়ে কিন্ডারগার্টেনে পড়া, লেখা, কথা বলা, শোনা, পাটিগণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক অধ্যয়ন, শিল্প, সঙ্গীত এবং শারীরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হয়। পাবলিক স্কুলগুলিতে বাধ্যতামূলক এবং ট্যাক্স সমর্থিত কিন্ডারগার্টেনের জন্য জনসমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাঁচ বছর বয়সী সকলের নথিভুক্তি বেড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যে পাবলিক কিন্ডারগার্টেন তৈরী হয়েছে।

9.5 শৈশব শিক্ষার জন্য ফ্রোবেলিয় পদ্ধতি (Froebelian Approach to Early Childhood Education)

9.5.1 শৈশব শিক্ষার জন্য ফ্রোবেলিয় নীতিমালা (Froebelian Principles on Early Childhood Education)

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার জন্য ফ্রোবেলিয় মৌলিক নীতিগুলি হলো—

(i) **স্ব-ক্রিয়াকলাপ (Self-activity) :** শিশুকে তার ক্রিয়াকলাপগুলি করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। শিশুর বৃদ্ধি শিশুর অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। শিশুর মনের স্ব-ক্রিয়াকলাপ হলো কিন্ডারগার্টেনের প্রথম নীতি। ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী শিশুকে সহজ থেকে জটিল, মূর্ত থেকে বিমূর্ত পর্যন্ত নিয়ে যায়। সে তার খেলার মাধ্যমেই শেখার দিকে এগিয়ে যায়।

(ii) **খেলার মাধ্যমে শেখা (Learning through Play) :** ফ্রোবেলের মতে খেলা শিশুকে আনন্দ, স্বাধীনতা ও তৃপ্তি দেয়। তবে জীবনের কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরিবর্তে লক্ষ্যহীন খেলায় পরিণত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। খেলায় যুক্তিসম্মত ও সচেতন দিক নির্দেশনা থাকা উচিত।

(iii) **গান (Song) :** ফ্রোবেল শিশুর গানের মাধ্যমে অঙ্গাভঙ্গি (Posture) ও নির্মাণের (Construction) সঙ্গে একটি জৈবিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। তিনি এগুলিকে শিশুর মধ্যে অভিব্যক্তির সমন্বিত রূপ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

(iv) **উপহার (Gifts) :** শিশুর খেলার জন্য সামগ্রী ফ্রোবেলের উপহার বা 'Gifts' আধুনিক কিন্ডারগার্টেনের ভিত্তি তৈরী করেছে। 'উপহার' আনুসঙ্গিক উপযুক্ত গান ও সঙ্গীত দ্বারা সংযুক্ত।

(v) **শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teachers) :** কিন্ডারগার্টেন শিক্ষায় শিক্ষকের নিষ্ক্রিয় থাকা ঠিক নয়। শিশুদের 'উপহার' দেওয়ার সময় শিক্ষককে নিজের পেশা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। শিক্ষককে তাদের কিছু কার্যকলাপ প্রদর্শন করতে হবে এবং শিশুদের সাথে গানও গাইতে হবে।

(vi) **শিক্ষায় স্বাধীনতা (Freedom in Education) :** স্বাধীনতা শিশুর মানসিক দিকগুলোর স্বাভাবিক ও যৌক্তিক বিকাশ ঘটায়। শিশুর কার্যকলাপে শিক্ষকের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। স্বাধীনতা বলতে যা পছন্দ তা করার স্বাধীনতা বোঝায় না। এটি একটি নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা যখন শিশু অন্যের স্বাধীনতাকে বিবেচনা করে।

(vii) **শৃঙ্খলা (Discipline) :** শৃঙ্খলা সম্পর্কে ফ্রোবেলের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, একজন শিক্ষককে সর্বপ্রথম শৃঙ্খলা পালন করতে হবে। শিক্ষককে ভালবাসা, সহানুভূতি, নম্রতা, সহযোগিতা এবং বড়দের প্রতি আনুগত্যের মতো মূল্যবোধগুলিকে জাগ্রত করতে হবে। শিক্ষককে সংযমী হতে হবে এবং শিশুদের শারীরিক শাস্তি থেকে বিরত থাকতে হবে। শিশুকে বোঝাতে হবে যে, শৃঙ্খলা নির্ভর করে অন্যদের প্রতি তার ভালবাসা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর।

9.5.2 শৈশব শিক্ষার জন্য ফ্রোবেলিয় পদ্ধতির অনুশীলন (Practicing the Froebelian Approach to Childhood Education)

শৈশব শিক্ষা বা কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার জন্য ফ্রোবেলিয় নীতির অনুশীলন পদ্ধতিগুলি হলো—

- ইহা গুরুত্বপূর্ণ যে, শিশুদের যা প্রয়োজন অনুশীলনকারীরা তা সরবরাহ করবেন বা তার সুযোগ দেবেন। উদাহরণস্বরূপ, শিশুদের পছন্দ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বা অঙ্গের দক্ষতা ও কৌশলগুলি ব্যবহার করার জন্য তাদের স্বাধীনতা দেওয়ার প্রয়োজন। যেমন, কোনো কোনো শিশুদের ছবি আঁকার জন্য ইচ্ছেমত বিভিন্ন রঙ মেশানোর দরকার হতে পারে, অথবা অন্যকোনো শিশুর রঙ মেশানোর প্রয়োজন নাও হতে পারে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুরা বালি, কাদামাটি ও নুড়ির সাথে জল মেশালে কি ঘটবে, তার জন্য অনুশীলনকারীদের সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে।

- অনুশীলনকারীদের অবশ্যই শিশুদের ধারণা, অনুভূতি, সম্পর্ক এবং শারীরিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। শিশুদের ব্যক্তিগত স্থানের প্রয়োজন হতে পারে, অথবা তাদের যথেচ্ছ ভাবে রঙের ব্যবহারে সৃষ্ট ছবি দেখে তাদের খারাপ বোধ হতে পারে, তার জন্য অনুশীলনকারীদের আগে থেকে কোনো কোনো রঙ সরিয়ে রাখতে হতে পারে। এই ব্যাপারে অনুশীলনকারীরা শিশুদের সংবেদনশীল ভাবে সাহায্য করবেন, যাতে তাদের আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা ও স্বায়ত্তশাসন তৈরী হয়।

- শিশুদের যেন এমনভাবে উৎসাহিত করা হয়, যাতে তারা স্ব-অনুপ্রাণিত হয় এবং তাদের শেখার জন্য অন্তর্নিহিত প্রেরণাকে চূর্ণ না করা হয়। শিশুদের প্রতি যথোপযুক্ত উপলব্ধি আছে, এই বিষয়ে যেন তারা বুঝতে পারে।

- শিশুদের স্ব-শৃঙ্খলা বিকাশের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। ইহা শিশুদের ভালভাবে মনোনিবেশ করতে এবং কার্যকরভাবে শিখতে সাহায্য করে।

- শিশুদের পছন্দের সুযোগ দিতে হবে, ভুল করার অনুমতি দিতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রয়োজনে সংবেদনশীল সাহায্য প্রদান করতে হবে। শিশুদের এমনভাবে শিখতে সাহায্য করতে হবে যা ব্যক্তি হিসেবে তাদের প্রত্যেকের জন্য সঠিক। এইভাবে অনুশীলনকারীরা শিশুদের শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

- শিশুরা কি করছে এবং কি করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তাদেরকে অনুশীলনকারীদের সাথে প্রচুর কথা বলার সুযোগ করে দিতে হবে। একে অপরের সাথে কথা বলা ও শোনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

- শিশুদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য যেমন ফ্রোবেলিয় পদ্ধতির কথা বিবেচনা করা হয়, তখন মনে

হতে পারে যে অনুশীলনকারীরা শুধুমাত্র শিশুদের পশ্চাতে আছেন, কিন্তু এটা সঠিক নয়, আসলে তারা কেন্দ্রীয়। শিশুদের সাথে কাজ করা অনুশীলনকারীরা দলগত ব্যবস্থায় বা গৃহভিত্তিক ব্যবস্থায় শিশুদের বিকাশে এবং শিখতে সাহায্য করার মূল চাবিকাঠি। অনুশীলনকারীরা উষ্ণ স্নেহপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করে, যা শিশুদের শেখার জন্য তাদের সামনে উন্মুক্ত করে এবং শিশুদের নিজেদেরকে জানতে, নিজেদেরকে সম্মান করতে, নিজেদের মতো কাজ করতে এবং তাদের শেখার সাথে খুব ইতিবাচকভাবে জড়িত হতে সাহায্য করে। ফ্রোবেলের মতানুসারে, অনুশীলনকারীদের কাছ থেকে বাহ্যিক চাপ ছাড়াই শিশুদের শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা লক্ষ্য করি যে শিশুরা যখন তাদের আগ্রহের বিষয় খুঁজে পায়, তখন তারা তা শিখতে কতটা আগ্রহী হয়।

9.6 সারাংশ (Summary)

আধুনিক কিন্ডারগার্টেন (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবর্তে শৈশবে) এর অস্তিত্ব জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রেডরিখ ফ্রোবেলের কাছে ঋণী। 1837 খ্রিস্টাব্দে যখন ফ্রোবেল কয়েকজন প্রাক-স্কুল বয়সী শিশুদের শিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি শিশুদের বিকাশ ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করার জন্য 'খেলা ও কার্যকলাপ' এবং 'সৃজনশীলতার লালন'-এর উপর ভিত্তি করে ছোট শিশুদের জন্য একটি প্রোগ্রাম তৈরী করেছিলেন। ফ্রোবেলই প্রথম ছিলেন যিনি মনে করেন যে শিশুরা জীবনের প্রথম তিন বছরে উল্লেখযোগ্য মস্তিষ্কের বিকাশ অনুভব করে এবং তাঁর কিন্ডারগার্টেন এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যে, মানুষ মূলত সৃজনশীল প্রাণী যাদের অভিজ্ঞতা, শেখার এবং বিকাশের সুযোগ দেওয়া দরকার। এই শেখার দর্শনটি একটি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক এবং শারীরিক বৃদ্ধিকে সহায়তা করার সময় খেলা, প্রকৃতি এবং হাতে কলমে অভিজ্ঞতার উপর জোর দেয়।

ফ্রোবেল পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দুতে বিশ্বাস করা হয় যে, খেলা হল প্রাকৃতিক উপায় যার মাধ্যমে শিশুর অন্বেষণ করে এবং উপলব্ধি করে। খেলাকে বিনোদন হিসেবে দেখা হয় না, বরং একটি অর্থবহ এবং উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপ হিসেবে দেখা হয় যা শিশুদের সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। খেলার মাধ্যমে শিশুরা স্ব-নির্দেশিত শিক্ষায় নিয়োজিত হয়।

ফ্রোবেল শিশুদের শিক্ষা ও বিকাশকে সমর্থন করার জন্য 'উপহার' এবং 'পেশা' ধারণাটি চালু করেছিলেন। উপহার বলতে সাধারণ খেলার বস্তুকে বোঝায়, যেমন কাঠের ব্লক, বল এবং লাঠি ইত্যাদি। অন্যদিকে পেশা হল আরও জটিল হাতে কলমে করার জন্য অন্বেষণ যেগুলি কাদামাটির কাজ, কাঠের কাজ, বুনন, অঙ্কন ও কাটার মতো দক্ষতার সাথে অনুশীলনের সাথে জড়িত। এই উপকরণ ও ক্রিয়াকলাপগুলি শিশুদের নিরবিচ্ছিন্নভাবে খেলার অনুমতি দেয় যেখানে তারা কিভাবে কাজ করে তার

নিজস্ব অর্থ তৈরী করে এবং শিশুদের কল্পনাশক্তি, সূক্ষ্ম সঞ্চালন দক্ষতা এবং স্থানিক সচেতনাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়।

9.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. ফ্রেডরিখ ফ্রোবেলের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
2. ফ্রোবেলের 'কিন্ডারগার্টেন' শিক্ষার উৎপত্তি সম্পর্কে লিখুন।
3. ফ্রোবেলের 'কিন্ডারগার্টেন' শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা করুন।
4. শৈশব শিক্ষার ফ্রোবেলিয় নীতিমালা উল্লেখ করুন।
5. শৈশব শিক্ষার ফ্রোবেলিয় পদ্ধতির অনুশীলন সম্পর্কে লিখুন।

9.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- The Froebel Approach care for Kids. https://www.careforkids.com.an Retrierved on 02.05.2024
- Philosophical and Educational Thoughts of Froebel. Dr. Shyama Prasad Mukherjee University, https://dspmuranchi,ac.in Retrieved on 02.05.2024
- Weston Peter (1998). Friedrich Froebel–His Life, Times & Significance. Froebel Trust, Roehamton Institute London. https://www.froebel.org.uk. Retrieved on 05.04.2024
- The History of Kindergarten : From Germany to the United States. https://digitalcommons.fin.edu, Retrieved on 06.05.2024
- Froebel's principles and practice today. Froebel Trust, https://www.froebel.org.uk Retrieved on 07.05.2024
- Friedrich Froebel,Wikipedia.https://en.wikipedia.org, Retrieved on 07.05.2024
- Friedrich Froebel–German Educator & Founder of Kindergarten. Britannica, https://www.britannica.com. Retrieved on 08.05.2024

Module – 4

Western Thinkers–II

একক 10 ❑ জন ডিউই (John Dewey)

গঠন

10.1 উদ্দেশ্য **(Objectives)**

10.2 ভূমিকা **(Introduction)**

10.3 জন ডিউই-র পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবন **(Family Life, Education and Service life of John Dewey)**

10.3.1 জন ডিউই-র পারিবারিক জীবন **(Family Life of John Dewey)**

10.3.2 জন-ডিউই-র শিক্ষা এবং কর্মজীবন **(Education and Service Life of John Dewey)**

10.4 ডিউই-র জীবন দর্শন, শিক্ষা দর্শন এবং শিক্ষার লক্ষ্য **(Dewey's Philosophy of Life, Educational Philosophy and Aims of Education)**

10.4.1 ডিউই-র জীবন দর্শন **(Dewey's Philosophy of Life)**

10.4.2 ডিউই-র শিক্ষা দর্শন **(Dewey's Educational Philosophy)**

10.4.3 শিক্ষার লক্ষ্য **(Aims of Education)**

10.5 ডিউই-র মতানুসারে পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, পরীক্ষাগার বিদ্যালয়, শৃঙ্খলা ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতি **(Curriculum, Teaching Method, Laboratory School, Discipline and Problem Solving Method according to Dewey)**

10.5.1 ডিউই-র মতে পাঠক্রম **(Curriculum as per Dewey)**

10.5.2 ডিউই-র শিক্ষণ পদ্ধতি **(Dewey's Teaching Method)**

10.5.3 ডিউই-র পরীক্ষাগার বিদ্যালয় **(Laboratory School of Dewey)**

10.5.4 শৃঙ্খলা সম্পর্কে ডিউই-র দৃষ্টিভঙ্গী **(Dewey's view on Discipline)**

10.5.5 ডিউই-র সমস্যা সমাধান পদ্ধতি **(Problem solving Method of Dewey)**

10.6 সারাংশ **(Summary)**

10.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

10.8 গ্রন্থপুঞ্জ **(Bibliography)**

10.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- ডিউই-র পারিবারিক জীবন, শিক্ষা এবং কর্মজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জন ডিউই-র জীবন দর্শন ও শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জন ডিউই-র মতানুসারে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জন ডিউই-র মতানুসারে বিদ্যালয়ে পাঠক্রমের ভিত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জন ডিউই-র মতানুসারে শিক্ষণ পদ্ধতির বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জন ডিউই-র 'পরীক্ষাগার বিদ্যালয়'-এর ধারণা সম্পর্কে অবগত হবেন।
- শৃঙ্খলা সম্পর্কে জন ডিউই-র দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ডিউই-র "সমস্যা সমাধান পদ্ধতি" সম্পর্কে জানতে পারবেন।

10.2 ভূমিকা (Introduction)

বিশিষ্ট দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন ডিউই (John Dewey) 1859 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার বার্লিংটন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ডিউই কেবল মহান শিক্ষক ছিলেন তাই নয়, তিনি শিক্ষা, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক পুস্তক লেখেন। 1896 খ্রিস্টাব্দে জন ডিউই-র Laboratory School নামে একটি পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানেই তিনি শিক্ষা সম্পর্কিত নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

ডিউই-র কাজের প্রধান বিষয় ছিল গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস। ডিউই পরীক্ষামূলক বুদ্ধিমত্তা এবং বহুত্বকে উৎসাহিত করার জন্য দুটি মৌলিক উপাদান—বিদ্যালয় এবং নাগরিক সমাজকে প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন, যেগুলির পুনর্গঠনের প্রয়োজন। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে, সম্পূর্ণ গণতন্ত্র কেবলমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ম্যধ্যমে নয়, বরং নাগরিক, বিশেষজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। 1896 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর গবেষণাপত্র "The Reflex Arc Concept in Psychology" মনোবিজ্ঞানে তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি শিক্ষা সম্পর্কে যেসব পুস্তক রচনা করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক হলো—The School and the Society, Democracy and Eduction, The School and Child ইত্যাদি।

10.3 জন ডিউই-র পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবন (Family Life, Education and Service life of John Dewey)

10.3.1 জন ডিউই-র পারিবারিক জীবন (Family Life of John Dewey)

জন ডিউই 1859 খ্রিস্টাব্দে 20 অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন্টের বার্লিংটনে একটি বিনয়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আর্চিবল্ড স্প্রাগ ডিউই এবং মাতার নাম লুসিনা আর্টেমিসিয়া রিচ ডিউই। জন ডিউই-রা চার ভাই ছিলেন। চার ভাইয়ের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। জন ডিউই-র বড় বেঁচে থাকা এক ভাইয়ের নাম ডেভিস রিচমন্ড ডিউই। তিনি একজন অর্থনীতিবিদ এবং ইতিহাসবিদ ছিলেন।

জন ডিউই 1886 খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাবিদ অ্যালিস চিপম্যানকে বিয়ে করেন। চিপম্যান মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে তাঁর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ডিউই এবং চিপম্যানের 6টি সন্তান ছিল—ফ্রেডেরিক আর্চিবল্ড ডিউই, এভলিন রিগস ডিউই, মরিস ডিউই (যিনি অল্প বয়সে মারা যান), গউন চিপম্যান ডিউই, লুসি অ্যালিস চিপম্যান ডিউই এবং জেন মেরি ডিউই। এলভিন রিগস ডিউই ছিলেন একজন শিক্ষা সংস্কারক ও সমাজকর্মী এবং শিক্ষার উপর বেশ কয়েকটি বই এর লেখক। জেন মেরি ডিউই ছিলেন একজন পদার্থবিদ।

1919 খ্রিস্টাব্দে ডিউই এবং তাঁর স্ত্রী অ্যালিস বিশ্রামকালীন ছুটিতে জাপানে যান। সেখানে তাঁরা জনগণের দ্বারা ভালভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন। জাপান সফরের সময় তাঁর প্রাক্তন দুই জন ছাত্র হু শিহ্ এবং চিয়াং মনলিনের ব্যবস্থাপনায় চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটি সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ডিউই এবং তাঁর স্ত্রী অ্যালিস 1919 এর 30 এপ্রিল সাংহাই পৌঁছান। 4 মে সেখানে ছাত্র বিক্ষোভ তাঁকে উজ্জীবিত করেছিল। চীনে দুই বছর থেকে 1921 এর জুলাই মাসে আমেরিকায় ফিরে যান। চীনে এই দুই বছরে ডিউই প্রায় 200টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 1934 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে দক্ষিণ আমেরিকার কেপটাউন এবং জোহানেসবার্গ নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সের আমন্ত্রণে ডিউই এবং তাঁর মেয়ে জেন যান এবং সেখানে বক্তব্য রাখেন। তাঁদের সম্মেলনে যাওয়ার খরচ কার্নেগি ফাউন্ডেশন বহন করে।

ডিউই-র স্ত্রী অ্যালিস চিপম্যান 1927 খ্রিস্টাব্দের 13 জুলাই 68 বছর বয়সে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে মারা যান। জন ডিউই 1952 খ্রিস্টাব্দের 1 জুন 92 বছর বয়সে নিউইয়র্ক সিটিতে তাঁর বাড়িতে কয়েক বছর অসুস্থ থাকার পর নিউমোনিয়ায় মারা যান।

10.3.2 জন-ডিউই-র শিক্ষা এবং কর্মজীবন (Education and Service Life of John Dewey)

জন ডিউই বাল্যকালে ভার্মন্টের বার্লিংটন পাবলিক স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। 15 বছর বয়সে

ডিউই ভার্মন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, যেখানে তিনি চার বছর দর্শন অধ্যয়ন করেন। তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্নাতক হওয়ার পর পেনসিলভানিয়ার অয়েল সিটিতে একটি সেমিনারিতে শিক্ষক হিসেবে তিন বছর অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি আমেরিকার প্রথম সাইকোলজি ল্যাবে জন্‌স্ হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে G. Stanley Hal-এর নির্দেশনায় অধ্যয়ন করেন। জন্‌স্ হপকিন্স থেকে তিনি Ph.D. ডিগ্রী অর্জনের পর এক দশক ধরে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করেন।

1894 খ্রিস্টাব্দে ডিউই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করেন। যদিও তাঁর দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের পূর্ববর্তী অধ্যয়নের জ্ঞান পরবর্তী কাজকে প্রভাবিত করেছে, তাহলেও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর নতুন চিন্তাধারা এক মতবাদে পরিণত হয়েছিল যা বাস্তববাদ বা 'Pragmatism' নামে শিক্ষাজগতে খ্যাত হয়েছে। বাস্তববাদের কেন্দ্রিয় ধারণা হল—"একটি ধারণার মূল্য, সত্য বা অর্থ তার ব্যবহারিক পরিণতির মধ্যে নিহিত"। ডিউই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাগার বিদ্যালয় বা 'Laboratory School' প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেখানে তিনি ছাত্রদের উপর শিক্ষাগত তত্ত্বগুলির সরাসরি প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। ডিউই পরবর্তীতে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যান এবং 1904 থেকে 1930 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কলেজে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করেন। তার পূর্বে 1899 খ্রিস্টাব্দে ডিউই আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি নির্বাচিত হন। 1905 খ্রিস্টাব্দে তিনি আমেরিকান ফিলোসফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে এক বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আমেরিকান ফেডারেশন অফ টিচার্সের দীর্ঘদিনের সদস্য ছিলেন।

ডিউই 1937 খ্রিস্টাব্দে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত Dewey Commission-এর নির্দেশনা দেন। 1939 খ্রিস্টাব্দে ডিউই League for Industrial Democracy (LID)-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। এটি একটি সংগঠন যার লক্ষ্য ছিল কলেজ ছাত্রদের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষিত করা। LID-এর ছাত্র শাখাটি পরে গণতান্ত্রিক সমাজের ছাত্র শাখা হয়ে ওঠে। ডিউই বিশ্বাস করতেন যে গণতন্ত্র মানে "প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ বা পরিসর থেকে স্বাধীন, তার যা কিছু উপহার আছে তার বিকাশের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে"।

10.4 ডিউই-র জীবন দর্শন, শিক্ষা দর্শন এবং শিক্ষার লক্ষ্য (Dewey's Philosophy of Life, Educational Philosophy and Aims of Education)

10.4.1 ডিউই-র জীবন দর্শন (Dewey's Philosophy of Life)

ডিউই-এর জীবনদর্শনে তিন ধরনের চিন্তাধারার সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে তিনি প্রকৃতিবাদ (Naturalism) এবং ভাববাদের (Idealism) মধ্যে একদিকে যেমন সমন্বয়সাধন

করেছেন, তেমনি অপরদিকে তাদের সঙ্গে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের (Theory of Evolution) সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। ফলে, তিনি উইলিয়াম জেম্স্-এর প্রয়োগবাদকে (Pragmatism) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করেন। তাই তাঁর দার্শনিক চিন্তাকে শুধুমাত্র প্রয়োগবাদ (Pragmatism) না বলে, পরীক্ষামূলক প্রয়োগবাদ (Experimental Pragmatism বা Instrumentalism) বলা যায়। ডারউইনের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন বিশ্বজগৎ চিরগঠনশীল এবং এই জগতে জীবজীবনও সদা পরিবর্তনশীল। তাঁর মতে মানুষের জীবনেরও চিরন্তন নির্দিষ্ট মান বা লক্ষ্য নেই। জীবনের লক্ষ্য ও মান-এর স্থানকালভেদে পরিবর্তন হয়। মানুষ নিজেই নিজের জীবনাদর্শ নির্ণয় করে। তিনি বলেন—"Everything is provisional; nothing ultimate. Knowledge is always a means, never an end in itself"। ডিউই বিশ্বাস করতেন, জ্ঞান, চিন্তা এবং কর্মের সঙ্গে একাত্মভাবে সংযুক্ত। প্রত্যেক জ্ঞানকে কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে; ফলের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। এর তাৎপর্য এই নয় যে, ডিউই কর্মকে জ্ঞান ও চিন্তার চেয়ে বড়ো করে দেখেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য হল চিন্তা ও কর্ম একত্রে সমন্বিত হলে তাদের যৌগিক ফল জ্ঞানকে সার্থক রূপদান করবে।

10.4.2 ডিউই-র শিক্ষা দর্শন (Dewey's Educational Philosophy)

ডিউই শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষা দর্শনকে কয়েকটি অংশে ব্যাখ্যা করেছেন—

(a) শিক্ষা জীবনের ক্রমবিকাশ : জীবনের এই ক্রমবিকাশের অর্থ হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বা সত্ত্বার বিকাশ। তিনি বিশ্বাস করতেন জগতে স্থির কোনো পদার্থ নেই সবই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের মধ্যেই মানুষের জীবনের বিকাশ ঘটে। এই পরিবর্তন শুধু আকার বা রূপের পরিবর্তন নয়, তা ব্যক্তির স্বরূপের পরিবর্তন।

(b) শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন : ডিউই মনে করেন জীবন একটি সক্রিয়তাভিত্তিক গতিশীল প্রক্রিয়া। সুতরাং নতুন সমস্যা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতাকে পুনর্গঠন, পুনর্বিন্যাস ও পুনঃসৃজন করতে হয়। শিক্ষা, অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাস করা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিক্ষা হল পরিস্থিতির চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত এক বিশেষ পরিবেশে চির বিকাশোন্মুখ প্রক্রিয়া। এই প্রসঙ্গে ডিউই বলেছেন, "Education is process involving continuous reconstruction and reorganization of experiences"।

(c) শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া : ডিউই মনে করতেন, শিক্ষা শুধু একটি ভিত্তিহীন প্রক্রিয়া নয়, এটা সামাজিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সামাজিক পটভূমিকায় মানুষ তার জীবনকে পুনর্গঠন করে, নতুন করে জীবন আরম্ভ করে। শিক্ষার ব্যাপকতর অর্থ হল একটি সামাজিক জীবনের নিরবচ্ছিন্ন গতির একটি উপায়। ডিউই শিক্ষাকে জীবনের সামাজিক নিরবচ্ছিন্নতার উপায় হিসেবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ শিক্ষাকে তিনি শিক্ষার্থীর জীবনে একীভূত করে দেখেননি। শিশুর বাইরে সামাজিক পরিবেশেই শিক্ষার গুরুত্ব কেননা, ব্যক্তি-মন ও সামাজিক মন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই শিক্ষা হল ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা এবং সমস্যার মধ্যে সার্থক সংগতিবিধান।

(d) শিক্ষা হল বৃদ্ধি : শিক্ষাকে ডিউই জীবনবিকাশের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন। জীবন ও শিক্ষা সমব্যাপক ও সমার্থক। জীবন মানেই সক্রিয়তা, আর অভিজ্ঞতাই সেই সক্রিয়তার প্রকাশ, সেই অভিজ্ঞতা আদি-অন্তহীন এক প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার কোনো লক্ষ্য বা শেষ নেই। এটির আছে ছেদহীন গতি। জীবনের বিকাশ মানে আরও বিকাশ, আরও বৃহত্তর, মহত্তর এবং গভীরতার বিকাশ। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ আরও শিক্ষা আরও অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন। তাঁর কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য গতিশীল এবং সেই উদ্দেশ্য গতিশীল জীবন, অভিজ্ঞতার বা শিক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো শিক্ষা নেই আর শিক্ষার বাইরে কোনো শিক্ষার লক্ষ্য নেই।

10.4.3 শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education)

ডিউই মনে করেন যে, শিক্ষার কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হতে পারে না। যেহেতু প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় পরিবেশই পরিবর্তনশীল, সেহেতু শিক্ষার কোনো স্থির লক্ষ্য নির্ণয় করা যায় না। তাঁর ধারণা অনুযায়ী, যখন শিক্ষাই জীবন তখন তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য হল আরও শিক্ষা। তাঁর মতে শিক্ষার কাজ হবে অসহায় শিশুকে সুখি, শৃঙ্খলাপরায়ণ ও সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সহায়তা করা। তাই তিনি বলেছেন—"The function of education is to help growing of helpless young man into a happy, moral and efficient human being"। ডিউই-এর মতে শিক্ষার কাজ হবে সামাজিক পরিবেশে শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে পরিস্ফুট করে তোলা। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে, এই দায়িত্ব পালন করবেন শিক্ষক মহাশয়।

10.5 ডিউই-র মতানুসারে পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, পরীক্ষাগার বিদ্যালয়, শৃঙ্খলা ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Curriculum, Teaching Method, Laboratory School, Discipline and Problem Solving Method according to Dewey)

10.5.1 ডিউই-র মতে পাঠক্রম (Curriculum as per Dewey)

পাঠক্রম (Curriculum) : ডিউই নির্দিষ্ট পাঠক্রমের কথা উল্লেখ করেননি। তবে তিনি শিশুদের পাঠক্রমে বাস্তব এবং প্রকৃত জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদাগুলিকেই স্থান দিতে চেয়েছেন। বিদ্যালয়ে শিশু সামাজিক আচরণ এবং সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা অভ্যাস করবে। তিনি যে বাস্তবসম্মত পাঠক্রম রচনার কথা বলেছেন তার ভিত্তিগুলি হল—

(i) **অভিজ্ঞতাভিত্তিক :** শিশুর পাঠক্রম হবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক। সমস্যামূলক কাজগুলি ক্রমান্বয়ে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়তার সাহায্যে সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে এবং জ্ঞানার্জন করতে পারে। তাঁর মতে, পুরাতন অভিজ্ঞতা যেন নতুন জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে।

(ii) উপযোগিতামূলক : ডিউই-এর মতে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু হবে উপযোগিতাভিত্তিক। বিষয়বস্তুর উপযোগিতা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুর উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারে।

(iii) নমনীয়তা : পাঠক্রম অবশ্যই নমনীয় হবে। পাঠক্রমের মধ্য দিয়েই শিশুর সামাজিক প্রয়োজনের প্রতিফলন ঘটবে। চার থেকে আট বছর বয়সের শিক্ষার্থীরা খেলার মাধ্যমে পারিবারিক কাজকর্মের অনুশীলন করবে এবং আট থেকে বারো বছর বয়সের শিশু সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

(iv) সামর্থ্যভিত্তিক : ডিউই-র মতে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও আগ্রহের ওপর বিশেষ করে নজর দিয়ে তাদের পাঠক্রম রচনা করতে হবে। শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বিষয়গুলির মধ্যে যেন সংযোগ থাকে। অর্থাৎ অনুবন্ধন প্রণালীর সাহায্যে বিষয়বস্তুগুলির সংযোগ ঘটিয়ে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(v) শিক্ষালয় : বিদ্যালয় ও সমাজের অসংগত ব্যবধান দূর করতে চেয়েছেন। তিনি গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষার্থীরা যে পরিবেশে বাস্তবজীবন নিয়ে বাস করবে সেই পরিবেশ থেকে এই বিদ্যালয়গুলি বঞ্চিত। ডিউই বিদ্যালয় সমাজের এই অসংগত ব্যবধান দূর করতে চেয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি 'গবেষণাগার বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। তিনি শিশুকে বিদ্যালয়ের মধ্যেই প্রধান প্রধান সামাজিক এবং শিল্পমূলক পরিবর্তনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। ডিউই-এর বক্তব্য হচ্ছে, সামাজিক সংগঠনে যে পরিবর্তন হয়েছে এবং ব্যক্তির জীবনে তার যে প্রতিক্রিয়া এসেছে, শিক্ষার্থীর জীবনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এইসব বিষয় পরিবেশন করবে। বিদ্যালয়কে ডিউই 'সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ' বলে অভিহিত করেছেন। বিদ্যালয় গড়ে উঠবে এক আদর্শ সামাজিক পরিবেশ আর সেই পরিবেশ একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভব। তাই তিনি বিদ্যালয় সম্পর্কে বলেছেন, "School as a purified, simplified and better balanced society"।

10.5.2 ডিউই-র শিক্ষণ পদ্ধতি (Dewey's Teaching Method)

ডিউই-এর শিক্ষণ পদ্ধতি মূলত তাঁর সক্রিয়তার তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি শিক্ষণ পদ্ধতির পাঁচটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। এই স্তরগুলি হল—

(a) সমস্যা সৃষ্টি : এই স্তরে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের সময় বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থী তার প্রবণতা অনুযায়ী কাজ গ্রহণ করে অগ্রসর হবে। কাজ করতে গিয়ে যখনই সে কোনো বাধার সম্মুখীন হবে তখনই সৃষ্টি হবে সমস্যার।

(b) **সক্রিয়তা :** এই স্তরে শিক্ষার্থী সমস্যার সম্মুখীন হলে সমাধানের জন্য সক্রিয়তার দ্বারা নানা কৌশল প্রয়োগ করবে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হবে।

(c) **তথ্য সংগ্রহ :** ডিউই-এর শিক্ষাদান পদ্ধতিতে তৃতীয় স্তরটি হল তথ্য সংগ্রহের স্তর। শিক্ষার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য নানা তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সেই তথ্য সংগ্রহ করবে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে।

(d) **প্রকল্প :** চতুর্থ স্তরে অনেকগুলি তথ্য থেকে নির্দিষ্ট তথ্যের দ্বারা একটি ধারণাকে সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় হিসেবে নির্বাচন করা হবে।

(e) **পরীক্ষণ :** সর্বশেষ স্তরে শিক্ষার্থী যে নতুন জ্ঞান আহরণ করল তা বাস্তবে প্রয়োগ করে তার যথার্থতা যাচাই করবে। তবেই শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন সম্পূর্ণ হবে। ডিউই তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে গতানুগতিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাকে বর্জন করেছেন। টেবিল, চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড দিয়ে সাজানো কোনো কক্ষ ছিল না। পুস্তক পাঠকে তিনি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বিদ্যালয়ে সক্রিয়ভাবে অভিজ্ঞতা গ্রহণের মাধ্যমে শিশুরা নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে।

10.5.3 ডিউই-র পরীক্ষাগার বিদ্যালয় (Laboratory School of Dewey)

ডিউই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য 1896 সালে শিকাগোতে নতুন পরিকল্পনায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টি গবেষণাগার বিদ্যালয় বা Laboratory School বা Dewey School নামে খ্যাত। এই বিদ্যালয়টিতে Dewey তাঁর আধুনিক সক্রিয়তামূলক শিক্ষাপদ্ধতি ও তার কার্যকারিতা প্রবর্তন করেন।

এই বিদ্যালয়টিতে প্রচলিত সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির কোনোটিই ছিল না। যেমন—বেঞ্চ, চেয়ার ও টেবিল দিয়ে সাজানো কক্ষ, পিরিয়ড অনুযায়ী সময়ের বিভাগ, শিক্ষকের প্ল্যাটফর্ম, বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান ইত্যাদি প্রচলিত বিদ্যালয়ের অপরিহার্য উপকরণগুলিকে তিনি স্থান দেননি। সেখানে পাঠ্যপুস্তক ছিল না। ইতিহাস, ভুগোল প্রভৃতি বিষয় অনুযায়ী কোনো বিভাজন ছিল না। পড়া দেওয়া, পড়া ধরা ইত্যাদি বহুযুগ ধরে অনুসৃত প্রথাগুলিরও অস্তিত্ব ছিল না। তা ছাড়া কোনো বাঁধাধরা রুটিং, ক্লাস, পঠন ও লিখনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম, বাড়ির কাজ ইত্যাদি কোনোটাই সেখানে ছিল না।

Dewey-র পদ্ধতি ছিল পরিপূর্ণভাবে সক্রিয়তাভিত্তিক। এমনকী পঠন, লিখন, গণিত প্রভৃতি প্রাথমিক জ্ঞানগুলিও শিশু অর্জন করত তার জীবনের কার্যাবলি থেকে। বিদ্যালয়ে পাঠক্রম বলতে ছিল নানারূপ সৃজনধর্মী সক্রিয়তা এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন। শিশুদের সক্রিয়তাও ছিল নানা প্রকৃতির, যেমন—কোনো কিছু তৈরি করা, প্রকৃতির সংস্পর্শে আসা, নিজের সৃজনশীলতাকে অভিব্যক্ত করা। এইভাবে Dewey বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়াটাই সম্পূর্ণরূপে বদলে দিলেন এবং বিদ্যালয়কে শিশুর জীবনের সঙ্গো অতিঘনিষ্ঠভাবে গ্রন্থিবদ্ধ করলেন। Dewey নিজে এই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যের

কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—"In intent, whatever the failure in accomplishment, the school was community centred"।

10.5.4 শৃঙ্খলা সম্পর্কে ডিউই-র দৃষ্টিভঙ্গী (Dewey's View on Discipline)

ডিউই শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে সার্থক রূপ পেয়েছে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সমন্বয়। ডিউই ছিলেন আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার জনক। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ণয়ে, নতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবনে, পরিবর্তনশীলতার নীতিতে বিশ্বাসী তিনি নতুন শিক্ষাধারার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় গুরুত্ব পেয়েছে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা। সেখানে তিনি চেয়েছিলেন বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইন্দ্রিয় ও পেশি সঞ্চালনের সৎ ব্যবহার ও সক্রিয়তা। তাঁর শিক্ষায় গুরুত্ব পেয়েছে সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে বিদ্যালয় ও সমাজের মেলবন্ধন এবং তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর। এছাড়া ডিউই একই সঙ্গে গুরুত্ব দিয়েছেন শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলার ওপর। তাঁর সেই শৃঙ্খলা হল স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা বা মুক্ত শৃঙ্খলা।

মুক্ত শৃঙ্খলা : মুক্ত শৃঙ্খলা হল স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে। এই শৃঙ্খলার মধ্যে কোনো বাধানিষেধ আরোপ করা হয়নি। ভালো-মন্দ বিভিন্ন কাজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার্থীরা সঠিক আচরণটি যখন বুঝে নিয়ে একটি নিয়মানুবর্তিতা পালন করতে শুরু করে স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ থেকে তখনই তাকে বলা হয় ইতিবাচক বা মুক্ত শৃঙ্খলা।

এখানে 'স্বাধীনতা' বলতে উচ্ছৃঙ্খল বোঝায় না, এই স্বাধীনতা সৃজনশীলতা এবং উদ্দেশ্যমূলক। Dewey বারবার উল্লেখ করেছেন যে শিশুরা নিজের আগ্রহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে স্থাপন করবে শৃঙ্খলার পরিবেশ। সক্রিয়তা, আগ্রহ এবং কর্মের সুযোগ ও সৎ ব্যবহারই মুক্ত শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। Dewey মনে করেন এই মুক্ত শৃঙ্খলা সৃষ্টির ক্ষমতাই হল বিদ্যালয়ের প্রধান শক্তি ও গুণ।

গণতন্ত্রের প্রতি গুরুত্ব, আদর্শ নাগরিকের চেতনা, নেতৃত্বের গুণ ইত্যাদি বিকশিত হবে এই শৃঙ্খলা-শক্তির পরিবেশে। ডিউই শৃঙ্খলার জন্য গুরুত্ব দিয়েছেন সামাজিক পরিবেশের ওপর। আদর্শ সামাজিক পরিবেশ তৈরি হলেই শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে এবং শৃঙ্খলাও গড়ে উঠবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বিদ্যালয়ে প্রতিকূল পরিবেশ বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। সামাজিক সংযোগ, বিভিন্ন দায়দায়িত্ব পালনের সুযোগ ইত্যাদির অনুশীলন শিক্ষার্থীর জন্য নিয়ন্ত্রিত করার কৌশলগুলি বিদ্যালয় শিখিয়ে দেয়। এই বিদ্যালয় থেকেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় নিয়মানুবর্তিতার, স্বতঃস্ফূর্ততার তাগিদ। সেই কারণে শিশুকে সামাজিক আচরণ ও সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা অনুশীলনের কথা ডিউই বলেছেন।

ডিউই শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো কৃত্রিমতাকে প্রশয় দিতে চাননি। জীবন ও সমাজের বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর শিক্ষা ভাবনার উদ্ভাবন করেছেন। সেই কারণে তিনি বিদ্যালয় সম্পর্কে বলেছেন—'The school is not a preparation for life. It is life itself'। ডিউই-র শৃঙ্খলা তত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে জীবনবোধ ও জীবনকেন্দ্রিকতা।

10.5.5 ডিউই-র সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem Solving Method of Dewey)

শিশুর মন হল সক্রিয়াতার ফল এবং সক্রিয়তার মাধ্যমেই তার বিকাশ হয়। শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়াকে জাগ্রত করার জন্য উদ্বোধকের প্রয়োজন হয়। এই উদ্বোধক সমস্যাভিত্তিক না হলে চিন্তন প্রক্রিয়ার পেছনে প্রেষণা থাকতে পারে না। শিক্ষণ পদ্ধতি পরিকল্পনা রচনা করার জন্য ডিউই এই সমস্যা ভিত্তিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে থাকে। ডিউই-র এই পদ্ধতির নাম হল সমস্যা সমাধান পদ্ধতি বা Problem Solving Method।

এই সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে সাতটি স্তরে কর্ম পরিচালনা করা হয়ে থাকে, সেগুলি হল—

(i) বিষয়বস্তু উপস্থাপন : এখানে বিষয়বস্তুকে সমস্যার আকারে উপস্থাপন করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সমস্যা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণাকে ধরে রাখতে সহায়তা করে।

(ii) সমস্যা সৃষ্টি : শিক্ষার্থীরা এমনভাবে শিক্ষা পরিস্থিতিকে সাজাবে যাতে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। এই কাজ করতে গিয়ে যখনই যে বাধার সম্মুখীন হবে তখনই সমস্যার সৃষ্টি হবে। এই সমস্যার সৃষ্টি করা শিক্ষার্থীর নিজের কাজ।

(iii) সম্ভাব্য সমাধান নির্ণয় : সমস্যার সম্মুখীন হলে শিক্ষার্থীরা সমস্যার সমাধানের জন্য চিন্তন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তুলবে। এই পর্যায়ে তারা চিন্তার দ্বারা সমস্যাটির সম্ভাব্য সমাধান নির্ণয় করবে।

(iv) তথ্যসংগ্রহ : শিক্ষার্থী তার চিন্তা অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে। এইসব তথ্য শিক্ষার্থী সমাজ পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করবে।

(v) যৌথভাবে সম্পাদন : এই পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের যৌথভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়। এর ফলে সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা যায়।

(vi) সক্রিয়তাভিত্তিক সম্পাদন : শিক্ষার্থী সংগৃহীত তথ্যগুলি নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য কর্ম সম্পাদনে অগ্রসর হবে। এই সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সমস্যাটির সমাধান করতে সক্ষম হবে।

(vii) প্রয়োগ : শিক্ষার্থী বিশেষ সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করল, সেটিকে নতুন নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে তার যথার্থতা বিচার করবে। এই প্রয়োগমূলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার জ্ঞানের পরিপূর্ণতা আসবে।

10.6 সারাংশ (Summary)

জন ডিউই আধুনিক যুগের একজন মহান দার্শনিক, শিক্ষাবিদ এবং চিন্তাবিদ। জন ডিউই-র শিক্ষার ধারণা প্রয়োগবাদ দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ডিউই বিশ্বাস করতেন যে জ্ঞান কর্মের ফলস্বরূপ। তাঁর মতে, পরিবর্তন হল বিশ্বের বাস্তবতা। শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক পুনর্গঠন'। শিক্ষার বিষয়ে তার প্রধান ধারণাটি তাঁর বইতে লেখা হয়েছে যেমন : 'গণতন্ত্র এবং শিক্ষা' (1916), 'যুক্তি' (1938) এবং 'অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা (1938)। তাঁর মতে, সত্য হল মানুষের দ্বারা তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত একটি যন্ত্র, যেহেতু সমস্যাগুলি পরিবর্তিত হয়, সত্য পরিবর্তিত হয় এবং তাই কোন চিরন্তন বাস্তবতা থাকতে পারে না। ডিউই-র মতে, পরিবর্তন শিক্ষার মৌলিক তত্ত্ব। ঘটনা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হয়। অতএব একজন ব্যক্তি কর্ম এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তত্ত্ব বিকাশ করে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিশুকে তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনের সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানব জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুখী করা। তাই, জন ডিউইকে বলা হয় প্রয়োগবাদী চিন্তাবিদ।

10.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. জন ডিউই-র পারিবারিক জীবন সম্পর্কে লিখুন।
2. ডিউই-র শিক্ষা ও কর্মজীবনের পরিচয় দিন।
3. ডিউই-র জীবনদর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
4. ডিউই-র শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
5. ডিউই-র শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে লিখুন।
6. ডিউই-র মতে পাঠক্রমের ভিত্তিগুলি উল্লেখ করুন।
7. ডিউই-র শিক্ষণ পদ্ধতির স্তরগুলি লিখুন।
8. ডিউই-র পরীক্ষাগার বিদ্যালয় সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
9. শৃঙ্খলা সম্পর্কে জন ডিউই-র দৃষ্টিভঙ্গী লিখুন।
10. ডিউই-র সমস্যা সমাধান পদ্ধতির স্তরগুলি লিখুন।

10.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- Purkait, B.R. (1995), Great Educators and their Philosophies, New Central Book Agency (P) Ltd., Kolkata
- SLM of Philosophical Perspectires of Education, Block-3, Indira Gandhi National Open University.
- John Dewey-Wikipedia, https://www.en.m.wikipedia.org, Retrieved on 14.05.2024
- John Dewey : Biography, Philosophy, Pragmatism & Education. Britannica, https://www.britannica.com. Retrieved on 14.05.2024
- Dewey's Educational Philosophy-THE EDUCATION HUB, https://theeducationhub.org.nz, Retrieved on 15.05.2024
- John Dewey's Educational Philosophy, My English Pages, https://www.myenglishpages.com, Retrieved on 15.05.2024
- John Dewey Biography (1859–1952), Very well Mind, https://www.verywellmind.com, Retrieved on 16.05.2024
- John Dewey, New World Encyclopedia, https://www.newworldencyclopedia.org, Retrieved on 16.05.2024

একক 11 ❑ ম্যাডাম মারিয়া মন্টেসরি (Madam Maria Montessori)

গঠন

11.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

11.2 ভূমিকা (Introduction)

11.3 মারিয়া মন্টেসরির পারিবারিক জীবন, শিক্ষা এবং কর্মজীবন (Family Life, Education and Carrear of Maria Montessori)

11.3.1 মারিয়া মন্টেসরির পারিবারিক জীবন (Family Life of Maria Montessori)

11.3.2 মারিয়া মন্টেসরির শিক্ষা (Education of Maria Montessori)

11.3.3 মারিয়া মন্টেসরির কর্মজীবন (Carrear of Maria Montessori)

11.4 মন্টেসরি বিদ্যালয় (Montessori School)

11.4.1 মন্টেসরি শিক্ষার ধারণা (Concept of Montessori Education)

11.4.2 প্রথম মন্টেসরি বিদ্যালয় বা 'ক্যাসা দেই বাম্বিনী সৃষ্টি' (Opening of First Montessori School or Casa dei Bambini)

11.4.3 মন্টেসরি পদ্ধতির নীতি (Principles of Montessori Method)

11.4.4 মন্টেসরি এবং সাফল্যের চার 'C' (Montessori and the Four 'C's Success)

11.4.5 মন্টেসরি শ্রেণীকক্ষে শিখনের ক্ষেত্রসমূহ (Areas of Learning in Montessori Classroom)

11.5 মন্টেসরি শিক্ষার প্রসার (Expansion of Montessori Education)

11.5.1 ইতালিতে মন্টেসরি শিক্ষার প্রসার (Expansion of Montessori Education in Italy)

11.5.2 মন্টেসরি শিক্ষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (International Recognition of Montessori Education)

11.5.3 ভারতে মারিয়া মন্টেসরি (Maria Montessori in India)

11.6 সারাংশ (Summary)

11.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

11.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

11.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- মারিয়া মন্টেসরির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মারিয়া মন্টেসরির শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মন্টেসরি শিক্ষার ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- প্রথম মন্টেসরি বিদ্যালয় বা 'কাসা দেই বাম্বিনী'-এর সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মন্টেসরি পদ্ধতির নীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মন্টেসরি এবং সাফল্যের চার 'C' সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মন্টেসরি শ্রেণীকক্ষের ক্ষেত্রসমূহ জানতে পারবেন।
- ইতালিতে মন্টেসরি শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মন্টেসরি শিক্ষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

11.2 ভূমিকা (Introduction)

মারিয়া টেকলা আর্টেমিসিয়া মন্টেসরি (Maria Tecla Artemisia Montessori) উনবিংশ শতাব্দীর একজন ইতালিয় ডাক্তার এবং শিক্ষাবিদ। ইতালিতে তিনি মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হওয়া প্রথম নারীদের একজন। 1896 খ্রিস্টাব্দে তিনি অনার্সসহ মেডিকেলে স্নাতক হয়। পরবর্তীতে তিনি শিক্ষাবিদ হন এবং শিশুদের জন্য মন্টেসরি শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন করেন, যা বিশ্বব্যাপী গৃহীত হয় এবং আজও শিশু শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে সমাদৃত।

মন্টেসরি পদ্ধতি হল একটি শিক্ষামূলক পদ্ধতি যার মাধ্যমে শিশুদের স্ব-নির্দেশিত এবং স্ব-প্রণোদিত শিখন হয়। প্রাথমিক শৈশব শিক্ষার চারটি উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে তাদের বিকাশে সহায়তা করার জন্য খেলাধূলা করানো হয়—বৌদ্ধিক, ভাষাগত, সামাজিক-মানসিক এবং শীরিরিক। মন্টেসরি পদ্ধতির লক্ষ্য হল একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরী করা যাতে শিশুরা অনুপ্রাণিত হতে পারে এবং স্বাধীনভাবে তাদের

শিক্ষা ও বিকাশ চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সফল প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হয়। মন্টেসরি শিক্ষা শিশুদের জন্য নিরাপদ, আকর্ষক এবং লালন-পালনের উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করে।

11.3 মারিয়া মন্টেসরির পারিবারিক জীবন, শিক্ষা এবং কর্মজীবন (Family Life, Education and Carrear of Maria Montessori)

11.3.1 মারিয়া মন্টেসরির পারিবারিক জীবন (Family Life of Maria Montessori)

মারিয়া টেক্‌লা আর্টিমিসিয়া মন্টেসরি (Maria Tecla Artemisia Montessori) 1870 খ্রিস্টাব্দে 31 আগস্ট ইতালির চিয়ারাভালে (Chiaravalle) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আলেসান্দ্রো মন্টেসরি (Alessandro Montessori) স্থানীয় রাষ্ট্র-চালিত তামাক কারখানায় কর্মরত অর্থমন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর মা রেনিল্ড স্টপপানি (Renilde Stoppani) সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি তাঁর মায়ের খুব কাছের ছিলেন, যিনি তাঁকে সহজেই উৎসাহিত করতেন। তাঁর বাবার সাথেও তাঁর স্নেহের সম্পর্ক ছিল, যদিও তিনি তাঁর শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন না।

1890 খ্রিস্টাব্দে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল স্কুলে প্রথম নারী হিসেবে মেডিসিনে ভর্তি হওয়ার জন্য তিনি অনুমতি পান এবং 1896 খ্রিস্টাব্দে তিনি মেডিসিনে স্নাতক হন। কিন্তু তিনি শিশু শিক্ষার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচিত হন। মারিয়া অর্থোফ্রোনিক স্কুল নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের সহ-পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। অন্য এক সহ-পরিচালক ছিলেন এক ফেলো ডাক্তার জিউসেপ্পে মন্টেসানো (Giusseppe Montesano)। মন্টেসানোর সাথে মারিয়ার সম্পর্ক তৈরী হয় এবং সেই সম্পর্কের কারণে 1898 খ্রিস্টাব্দের 31 মার্চ মারিয়া মারিও (Mario) নামে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। সামাজিক গঞ্জনার কারণে তিনি মারিওকে এক নার্সের উপর লালন-পালনের দায়িত্ব দেন। তবে তাদের মধ্যে কথা ছিল, ছেলের কিশোর বয়সে তিনি মারিওর সাথে থাকবেন। 1915 খ্রিস্টাব্দে মন্টেসরির বাবা মারা যান।

মারিয়া 1917 খ্রিস্টাব্দ থেকে স্পেনে বসবাস করতেন। তখন মারিয়া ছেলে মারিও ও তার স্ত্রী হেলেন ক্রিস্টির সাথে যোগ দেন। সেখানে তারা মারিও ও স্ত্রী হেলেনের চার সন্তান-মারিও জুনিয়ার, রোল্যান্ডো, মারিলেনা এবং রেনিল্ডকে বড় করেন। 1929 খ্রিস্টাব্দে মা মারিয়া ও ছেলে মারিও একত্রে মারিয়ার শিশু শিক্ষার কাজকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য Association Montessori International (AMI) প্রতিষ্ঠা করেন।

1936 খ্রিস্টাব্দে স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধ থেকে পালিয়ে মারিয়া ও মারিও ইংল্যান্ডে যান। পরবর্তীতে তারা নেদারল্যান্ডসে যান, যেখানে তারা অ্যাডা পিয়ারসনের পরিবারের সাথে ছিলেন। পিয়ারসন পরে মারিওর দ্বিতীয় স্ত্রী হয়েছিলেন। মারিয়া মন্টেসরি 1952 খ্রিস্টাব্দে 6 মে নেদারল্যান্ডসের নুরডউইকে (Noordwijk) 81 বছর বয়সে মারা যান।

11.3.2 মারিয়া মন্টেসরির শিক্ষা (Education of Maria Montessori)

প্রাথমিক শিক্ষা (Early Education)

মন্টেসরি পরিবার কাজের কারণে 1873 খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্সে এবং তারপর 1875 খ্রিস্টাব্দে রোমে চলে যায়। মারিয়া 1876 খ্রিস্টাব্দে 6 বছর বয়সে একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেকর্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল না। যদিও তিনি দুটি প্রশাংসপত্র পেয়েছিলেন একটি তাঁর ভাল ব্যবহারের জন্য এবং অন্যটি "lavori donneschi" বা "মেয়েদের কাজ" এর জন্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education)

1883 খ্রিস্টাব্দে 13 বছর বয়সে মন্টেসরি একটি মাধ্যমিক প্রযুক্তিগত স্কুল "রেজিয়া স্কুওলা টেকনিকা মাইকেলেঞ্জেলো বুওনারোতি" (Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buonarroti)-তে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি ইতালীয়, পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, হিসাববিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এবং বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। 1886 খ্রিস্টাব্দে ভাল গ্রেড ও পরীক্ষার ফলাফলসহ উত্তীর্ণ হন। সেই বছর অর্থাৎ 16 বছর বয়সে তিনি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট রেজিও ইনস্টিটিউটো টেকনিকো লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিতে (Regio Instituto Tecnico Leonardo da Vinci)-তে ভর্তি হন এবং ইতালীয় গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, অলঙ্কৃত অঙ্কন, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং দুটি বিদেশী ভাষা অধ্যয়ন চালিয়ে যান। তিনি বিজ্ঞান ও গণিতে ভাল ফল করেছিলেন। তিনি মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু একজন মহিলার পক্ষে সেটা ছিল অস্বাভাবিক আকাঙ্খা। 1890 খ্রিস্টাব্দে তিনি 20 বছর বয়সে পদার্থবিদ্যা-গণিতের একটা সার্টিফিকেটসহ উত্তীর্ণ হন। তখন তিনি মেডিসিন অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটাও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মে অসম্ভব ছিল।

রোম বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিকেল স্কুল (University of Rome–Medical School)

মারিয়া মন্টেসরি ডাক্তারী পড়ার অভিপ্রায় জানিয়ে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিকাল মেডিসিনের অধ্যাপক গুইডো ব্যাচেলি (Guido Baccelli)-র কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু দৃঢ়ভাবে তাঁকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। তখন তিনি 1890 খ্রিস্টাব্দে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হন। তিনি উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা (Experimental Physics), হিস্টোলজি, অ্যানাটমি এবং সাধারণ ও জৈব রসায়ন নিয়ে অধ্যয়ন করেন এবং 1892 খ্রিস্টাব্দে তিনি "ডিপ্লোমা ডি লাইসেন্সা" (diploma di licenza) অর্জন করেন। এই ডিগ্রি ইটালিয়ান এবং ল্যাটিন ভাষায় অতিরিক্ত পড়াশোনার পাশাপাশি 1893 খ্রিস্টাব্দে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল প্রোগ্রামে প্রবেশের জন্য তাঁকে যোগ্য করে তোলে।

তিনি তাঁর লিঙ্গের কারণে কিছু মেডিকেল ছাত্র এবং অধ্যাপকদের কাছে হয়রানির শিকার হয়েছিলেন। যেহেতু নগ্ন মৃতদেহের উপস্থিতিতে পুরুষদের সাথে ক্লাসে তাঁর উপস্থিতি অনুপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল, তাঁকে ঘন্টার পর ঘণ্টা একাই মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ করতে হয়েছিল। ফর্মালডিহাইডের আপত্তিকর গন্ধ ঢাকতে তিনি ধূমপানের আশ্রয় নেন। মারিয়া তাঁর প্রথম বছরেই একটি অ্যাকাডেমিক পুরস্কার জিতেছিলেন এবং 1895 খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক ক্লিনিকাল অভিজ্ঞতা অর্জন করে হাসপাতালের সহকারী হিসেবে একটি পদ লাভ করেন। তাঁর শেষ দুই বছরে তিনি পেডিয়াট্রিক ও সাইকিয়াট্রি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং পেডিয়াট্রিক কনসাল্টিং রুম এবং জরুরী পরিসেবাতে কাজ করেছিলেন। এইভাবে তিনি পেডিয়াট্রিক মেডিসিনে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। 1896 খ্রিস্টাব্দে মারিয়া মন্টেসরি মেডিসিনের ডাক্তার হিসেবে রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। তাঁর থিসিস 1897 খ্রিস্টাব্দে পলিক্লিনিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে সহকারী হিসেবে চাকুরী পেয়েছিলেন এবং একটি প্রাইভেট প্রাকটিস শুরু করেছিলেন।

পরবর্তী অধ্যয়ন (Further Studies)

1902 খ্রিস্টাব্দে তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হন। তিনি তাত্ত্বিক এবং নৈতিক দর্শন, দর্শনের ইতিহাস এবং মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলেন, কিন্তু তিনি দর্শনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে সমর্থ হননি। তাছাড়া তিনি নৃতত্ত্ব এবং শিক্ষাগত দর্শন স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন চালিয়েছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা পরিচালনা করেছেন। তিনি ইটার্ড এবং সেগুইনের (Itard and Seguin) কাজ পুনর্বিবেচনা করেছেন। ঐ সময়ে তিনি মূলধারার শিক্ষায় শেখার অসুবিধা সহ শিশুদের শিক্ষিত করার পদ্ধতিগুলিকে অভিযোজিত করার বিষয়ে বিবেচনা করতে শুরু করেন। তিনি 1903 খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাবিজ্ঞানের উপর দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 1904 খ্রিস্টাব্দে তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের একজন সাম্মানিক প্রভাষক হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পেডাগজিক স্কুলে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হন এবং 1908 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। তাঁর বক্তৃতাগুলি 1910 খ্রিস্টাব্দে "শিক্ষাগত নৃবিজ্ঞান" (Pedagocical Anthropology) নামে একটি বই হিসেবে মুদ্রিত হয়েছিল।

11.3.3 মারিয়া মন্টেসরির কর্মজীবন (Carrear of Maria Montessori)

1896 খ্রিস্টাব্দে মারিয়া মন্টেসরি রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিসিনের ডাক্তার হিসেবে স্নাতক হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে সহকারী হিসেবে চাকুরি পেয়েছিলেন এবং একটি প্রাইভেটে প্রাক্টিস শুরু করেছিলেন। 1897 খ্রিস্টাব্দে মারিয়া মন্টেসরি তুরিনে ন্যাশানাল কংগ্রেস অফ্ মেডিসিনে কিশোর অপরাধের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়ে বক্তৃতা করেন। 1898 খ্রিস্টাব্দে তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং তুরিনের প্রথম শিক্ষা সম্মেলনে আবার বক্তৃতা করেছিলেন। শেখার অসুবিধায় আক্রান্ত শিশুদের জন্য বিশেষ ক্লাশ এবং প্রতিষ্ঠান তৈরীর পাশাপাশি তাদের প্রশিক্ষকদের জন্য শিক্ষক

প্রশিক্ষণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। 1899 খ্রিস্টাব্দে মারিয়া মন্টেসরি প্রতিবন্ধী শিশুদের সুরক্ষার জন্য নবগঠিত ন্যাশানাল লীগের কাউন্সিলর নিযুক্ত হন এবং কলেজ অফ রোমের শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুলে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিশেষ পদ্ধতির উপর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন। সেই বছর মন্টেসরি বিশিষ্ট পাবলিক ব্যক্তিদের সামনে সক্ষম দর্শকদের জন্য দুই সপ্তাহের একটি জাতীয় বক্তৃতা সফর করেন। তিনি ন্যাশনাল লীগের বোর্ডে যোগদান করেন এবং ইতালীতে মহিলাদের জন্য দুটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে স্বাস্থ্যবিধি ও নৃবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন।

1900 খ্রিস্টাব্দে ন্যাশানাল লীগ 'স্কুওলা ম্যাজিস্ট্রেল আর্টোফ্রেনিকা" বা "অর্থফ্রেনিক স্কুল" খোলে, যে প্রতিষ্ঠানটি একটি "মেডিকো-পেডাগজিক্যাল ইনস্টিউট" এবং যেখানে শিক্ষকদের শেখার অসুবিধা (Learning disabilities) সহ শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, একটি সংযুক্ত পরীক্ষাগার ক্লাশরুম (Laboratolry Classroom) সহ। মারিয়া ঐ স্কুলে সহ-পরিচালক নিযুক্ত হন। 1904 খ্রিস্টাব্দে তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞানের একজন সম্মানিক প্রভাষক হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পেডাগজিক স্কুলে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হন এবং 1908 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। তাঁর বক্তৃতাগুলি 1910 খ্রিস্টাব্দে "শিক্ষাগত নৃবিজ্ঞান" নামে একটি বই হিসেবে মুদ্রিত হয়েছিল। মন্টেসরির খ্যাতি এবং কাজ আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। প্রায় সেই সময়ে তিনি তাঁর শিক্ষামূলক কাজে, তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির বিকাশ এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য আরও বেশি সময় দেওয়ার জন্য তাঁর চিকিৎসা অনুশীলন ছেড়ে দেন।

1911 খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মন্তেসরি শিক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে ইতালী এবং সুইজারল্যান্ডের পাবলিক স্কুলগুলিতে গৃহীত হয়েছিল এবং যুক্তরাজ্যের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। লন্ডন, জোহানেসবার্গ, রোম এবং স্টকহোমের পাবলিক স্কুল সিস্টেমে মন্টেসরি শিক্ষা পদ্ধতিটি গৃহীত হয়। 1913 খ্রিস্টাব্দে রোমে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্সটি আমেরিকান মন্টেসরি কমিটি দ্বারা স্পনসর করা হয়েছিল। 1913 থেকে 1936 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, রাশিয়া, সার্বিয়া, কানাডা, ভারত, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে মন্টেসরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 1936 খ্রিস্টাব্দে মন্টেসরি ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে বার্সেলোনা ছেড়ে যান। এইভাবে তিনি সারা বিশ্বে আমৃত্যু মন্টেসরি শিক্ষার বিস্তার ও প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

11.4 মন্টেসরি বিদ্যালয় (Montessori School)

11.4.1 মন্টেসরি শিক্ষার ধারণা (Concept of Montessori Education)

মারিয়া মন্টেসরি কর্তৃক প্রবর্তিত মন্টেসরি শিক্ষা হল শিক্ষার একটি পদ্ধতি যা স্ব-নির্দেশিত কার্যকলাপ, হাতে-কলমে শিক্ষা এবং সহযোগিতামূলক খেলার উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট। মন্টেসরি শ্রেণীকক্ষে

শিশুরা তাদের শেখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল হয় এবং যখন উচ্চ প্রশিক্ষিত শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পদ্ধতিটি পরিচালনা করার জন্য বয়স উপযুক্ত কার্যকলাপ প্রদান করেন। পরিবেশের তথা বিশ্বের জ্ঞান অন্বেষণ করতে এবং তাদের সর্বাধিক সম্ভাবনা বিকাশের জন্য শিশুরা দলবদ্ধভাবে এবং পৃথকভাবে কাজ করে। মন্টেসরি শ্রেণীকক্ষগুলি একটি বয়স সীমার শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী সুন্দরভাবে তৈরী করা পরিবেশ। ডঃ মারিয়া মন্টেসরি আবিষ্কার করেছেন যে, এই ধরণের শ্রেণীকক্ষে অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার ফলে ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া এবং আরও অনেক কিছুর গভীর উপলব্ধি হয়।

একটি মন্টেসরি শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি উপাদান শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত। উপাদানগুলি শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ এবং উপলব্ধ কার্যকলাপের মধ্যে একটি সমন্বয় তৈরি করে। শিশুরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং তাদের নিজস্ব গতিতে শিখতে পারে। তারা যে কোন মুহূর্তে সমস্ত মানুষের মধ্যে বিদ্যমান প্রাকৃতিক কৌতুহলের প্রতি সাড়া দিতে পারে এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরী করতে পারে।

1929 খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাজের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও স্কুল উভয়ের উচ্চমান নিশ্চিত করার জন্য ''অ্যাসোসিয়েশন মন্টেসরি ইন্টারন্যাশনাল'' (AMI) মারিয়া মন্টেসরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজও AMI নিউরোসায়েন্স এবং শিশু বিকাশে সমসাময়িক গবেষণার সাথে সহযোগিতা করার সময় মন্টেসরির দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে চলেছে। AMI-এর অফিসিয়াল শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে জন্ম থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সাথে কাজ করার প্রশিক্ষণ দেয় :

(ক) Infant/Toddler : জন্ম থেকে তিন বছর বয়সী শিশুদের জন্য

(খ) Primary : তিন থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের জন্য

(গ) Elementary : ছয় থেকে বারো বছর বয়সী শিশুদের জন্য

সর্বোপরি মন্টেসরি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশুর স্বাভাবিক জ্ঞানের তৃষ্ণাকে বিকশিত করা, শৃঙ্খলার অনুভূতি বিকাশ করা, কার্যকরী সৃজনশীলতাকে লালন করা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে গঠন, স্বাধীনতা এবং শেখার আত্মবিশ্বাস বিকাশে সহায়তা করা। ডাঃ মারিয়া মন্টেসরি বিশ্বাস করতেন যে, শৈশব শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ছোট শিশুকে প্রাক-নির্বাচিত কোর্সে ভর্তি করা নয়, বরং শিশুকে স্বাভাবিকভাবে শেখার জন্য তার নিজের ইচ্ছাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

11.4.2 প্রথম মন্টেসরি বিদ্যালয় বা 'ক্যাসা দেই বাম্বিনী' সৃষ্টি (Opening of First Montessori School or Casa dei Bambini)

মারিয়া মন্টেসরি 1907 খ্রিস্টাব্দে 6 জানুয়ারী প্রথম যে মন্টেসরি বিদ্যালয় খুলেছিলেন তার নাম ইতালীভাষায় ''কাসা দেই বাম্বিনী'', যার অর্থ ''শিশুদের জন্য ঘর''। এই স্কুলটি রোমের নিম্ন আয়ের জেলা সানলরেঞ্জোতে অবস্থিত। যেখানে মারিয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর শিশু শিক্ষার দর্শন ঐ স্কুলটির প্রতিষ্ঠার পর থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সাংবাদিক লুইগি লোদির স্ত্রী ওলগা ওসানি

(Olga Ossani) যিনি মারিয়া মন্টেসরির সাথে 1899 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে মহিলাদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ইতালীর প্রতিনিধি ছিলেন, মারিয়া মন্টেসরিকে "Children's House' নামটি শিশু শিক্ষার জন্য স্কুলের নাম হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন। মারিয়ার প্রথম কাসাটিতে তিন থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে 50 থেকে 60 জন শিশুকে ভর্তি করা হয়েছিল।

প্রথম কাসাতে শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষকের টেবিল ও ব্ল্যাকবোর্ড, একটি চুলা, ছোট চেয়ার, আর্মচেয়ার, শিশুদের জন্য গ্রুপ টেবিল এবং মন্টেসরি শিশুদের জন্য যে উপকরণগুলি তৈরী করেছিলেন সেগুলির জন্য একটি তালাবদ্ধ ক্যাবিনেট দ্বারা সজ্জিত ছিল। শিশুদের জন্য ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যক্তিগত যত্ন যেমন ড্রেসিং, পরিবেশের যত্ন যেমন ধুলাবালি পরিষ্কার করা এবং বাগানের যত্ন নেওয়া। মন্টেসরির তৈরী করা উপকরণের ব্যবহারও শিশুদের সেখানো হত। মারিয়া মন্টেসরি শিশু শিক্ষা নিয়ে গবেষণা, অন্যান্য পেশাগত কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকা এবং শ্রেণীকক্ষের কাজ তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করা প্রভৃতিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। কিন্তু সরাসরি শিশুদের শিক্ষা দেননি। মন্টেসরি ছোট বাচ্চাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতেন যা তাঁর শিক্ষা পদ্ধতির ভিত্তি তৈরী করেছিল। তিনি গভীর মনোযোগ এবং একাগ্রতা, কার্যকলাপের একাধিক পুনরাবৃত্তি এবং পরিবেশে শৃঙ্খলার প্রতি সংবেদনশীলতার উপর জোর দিয়েছিলেন। শিশুরা তাদের জন্য সরবরাহ করা খেলনাগুলির চেয়ে ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ ও মন্টেসরির তৈরী উপকরণগুলিতে বেশী আগ্রহ দেখিয়েছিল। মিষ্টি এবং অন্যান্য পুরস্কার দ্বারা আশ্চর্যজনক ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল না। সময়ের সাথে সাথে তিনি একটি স্বতঃস্ফূর্ত আত্মশৃঙ্খলার প্রকাশ ঘটতে দেখেছিলেন।

তাঁর পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে, তিনি বেশ কয়েকটি অনুশীলন বাস্তবায়ন করেছিলেন যা তাঁর শিক্ষাগত দর্শনের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। তিনি বাচ্চাদের নড়াচড়া করার জন্য যথেষ্ট হালকা বাচ্চাদের আকারের টেবিল এবং চেয়ার দিয়ে ভারী আসবাবপত্র প্রতিস্থাপন করেছিলেন। কম উচ্চতার তাকগুলিতে ছোট আকারের সামগ্রী স্থাপন করেছিলেন। তিনি ফুল সাজানো, হাত ধোয়া, জিমন্যাস্টিকস্, পোষা প্রাণীর যত্ন এবং রান্নাসহ পরিবেশ ও নিজের যত্নের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি শ্রেণীকক্ষের খোলা-বাতাস অংশগুলিতে ব্যক্তিগত যত্নের মত ব্যবহারিক কার্যের পরিসরের ব্যবস্থা করেছিলেন, যার ফলে শিশুরা কক্ষের বিভিন্ন এলাকায় যেমন খুশী তেমনভাবে উৎসাহিত হতে পারে। একটি সাধারণ শীতের দিনের পাঠের রূপরেখা সকাল 9.00 টায় শুরু হয় এবং বিকেল 4.00 টায় শেষ হয়। তিনি অনুভব করেছিলেন, স্বাধীনভাবে কাজ করার মাধ্যমে শিশুরা স্বায়ত্ত শাসনের নতুন স্তরে পৌঁছাতে পারে।

11.4.3 মন্টেসরি পদ্ধতির নীতি (Principles of Montessori Method)

ডাক্তার মারিয়া মন্টেসরি, যিনি বছরের পর বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মন্টেসরি শিক্ষা পদ্ধতির নীতিগুলি প্রণয়ন করেছিলেন, বলেন—"Children learn naturally through activity and their characters develop through freedom."

"শিশুরা স্বাভাবিকভাবে কার্যকলাপের মাধ্যমে শেখে এবং তাদের চরিত্রগুলি স্বাধীনতার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে।"

মন্টেসরি শিক্ষার নীতিগুলি শিশুদের শেখার প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে শিশুরা কীভাবে শেখে তা অনুধাবনের ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। নীতিগুলি প্রকাশ করে যে কীভাবে মন্টেসরি শিক্ষা প্রচলিত শিক্ষা থেকে আলাদা। মন্টেসরি শিক্ষা পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি হলো—

(i) **শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা (Respect for the Child)** : মন্টেসরি দর্শন শিশুকে সম্মান করাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, যার অর্থ প্রতিটি শিশু অনন্য এবং তার প্রতিভা এবং অনন্যতার জন্য অবশ্যই শ্রদ্ধা করা উচিত। শিশুদের তাদের বেছে নেওয়ার, চলাফেরা করার, তাদের ভুল সংশোধন করার এবং তাদের নিজস্ব গতিতে কাজ করার স্বাধীনতার জন্য সম্মান করা অবশ্যই কর্তব্য।

(ii) **প্রস্তুত পরিবেশ (Prepared Environment)** : একটি মন্টেসরি শ্রেণীকক্ষ প্রস্তুত পরিবেশ হিসেবে পরিচিত, কারণ এটি একটি সূক্ষ্মভাবে পরিকল্পিত শিক্ষার পরিবেশ যেখানে সবকিছুর নির্দিষ্ট স্থান এবং কার্য রয়েছে। শ্রেণীকক্ষের কেন্দ্রীয় ধারণা হচ্ছে, "পরিবেশ এবং মনের ক্রম"। শিশুরা তাদের আগ্রহগুলি অনুসরণ করতে, তাদের কাজ বেছে নিতে এবং এই পরিবেশে তাদের নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যেতে স্বাধীন।

(iii) **শোষক মন (Absorbent Mind)** : একটি শিশুর জীবনের প্রথম ছয় বছর তার সার্বিক বিকাশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ডাক্তার মারিয়া মন্টেসরি এই সময়টিকে "শোষক মনের" পর্যায় বলে অভিহিত করেছেন। কারণ শিশুর স্পঞ্জের মত তাদের পরিবেশ থেকে তথ্য শোষণ করার ক্ষমতা বিদ্যমান। এই বছরগুলিতে শিশুরা দ্রুত তাদের সংস্কৃতি এবং তাদের চারপাশের বিশ্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করে। তদুপরি, তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যক্তিত্বের ভিত্তি এই প্রাথমিক বছরগুলিতে নির্মিত হয়।

(iv) **শিশুকে শিক্ষিত করা (Educating the Child)** : মন্টেসরি শিক্ষা প্রতিটি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক বৃদ্ধিকে উন্নীত করে এমন শেখার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মন্টেসরি পাঠ্যক্রম ভাষা এবং পাটিগণিত ছাড়াও ব্যবহারিক জীবন, সংবেদনশীল এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। শিশু বিকাশ এবং শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে জড়িত এবং সমানভাবে আচরণ করা হয়।

(v) **স্বতন্ত্র শিক্ষা (Individual Education)** : মন্টেসরি শিক্ষার প্রোগ্রামগুলি প্রতিটি শিশুর বিকাশের অনন্য পর্যায়ে, আগ্রহ এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যক্তিগতকরণ করা হয়। পাঠ প্রতিটি

শিশুর শিখনের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে এবং শিক্ষকরা প্রতিটি শিশুর বিকাশের ধারা খেয়াল রেখে সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্মিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে তাদের কাজ করার উৎসাহ প্রদান করেন।

(vi) পছন্দের স্বাধীনতা (Freedom of Choice) : শিশুরা সবচেয়ে ভালো শেখে যখন তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং তাদের আগ্রহ বাছাই করে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সামগ্রিক ভাবে, মন্টেসরি শিক্ষা অত্যন্ত সক্রিয়, স্বতন্ত্রভাবে গতিশীল, স্ব-সংশোধনী এবং প্রতিটি শিশুর চাহিদা ও আগ্রহের সাথে ব্যক্তিগতকৃত। শিশুরা বড়দের চেয়ে বেশী স্বাধীনতা চায়। তারা নিজেরাই কিছু অন্বেষণ করতে চায় এবং এটি তাদের শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও মজাদার ও স্বাস্থ্যকর করে তোলে। শিশুদেরকে নিছক অল্পবয়সী শিশু হিসেবে দেখার পরিবর্তে তাদের জন্মগত নেতা হিসেবে বিবেচনা করে উপযুক্ত উদ্দীপনা প্রদান করা হলে, শিশুরা নিজেরাই শিখতে সক্ষম হয়।

এই প্রসঙ্গে মারিয়া মন্টেসরির বিখ্যাত উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ—

"Imagination does not become great until human beings, given the courage and strength, use it to create."

"কল্পনা ততক্ষণ পর্যন্ত মহৎ হয় না যতক্ষণ মানুষ তাকে প্রদত্ত সাহস ও শক্তির মাধ্যমে কিছু সৃষ্টি করতে ব্যবহার করে।"

11.4.4 মন্টেসরি এবং সাফল্যের চার 'C' (Montessori and the Four 'C's of Success)

গবেষণায় দেখা গিয়েছে মন্টেসরি শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের চার প্রকার দক্ষতার বিকাশ ঘটে, যেমন—Critical thinking, Collaboration, Creativity এবং Communication, যেগুলি The Four 'C's of Success বা সাফল্যের চার 'C' নামে পরিচিত। এই দক্ষতাগুলি শিশুদের মুখস্ত করা বা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ঘটবে না, তাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দক্ষতাগুলির বিকাশ ঘটানোর জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।

(i) Critical Thinking (সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা) : মন্টেসরি শিক্ষা শিশুদের হাতে-কলমে শিক্ষার উপকরণ প্রদান করে সমালোচনামূলক চিন্তার দক্ষতা বিকাশে উৎসাহিত করে। মন্টেসরি শিক্ষকের ভূমিকা হল, এই শেখার প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করা এবং শিশুদের নিজেদের ভুল বুঝতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহিত করা। এই সমালোচনা মূলক চিন্তা-দক্ষতা সমস্যা সমাধান, বিশ্লেষণ এবং জ্ঞাত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি স্থাপন করে।

(ii) Collaboration (সহযোগিতা) : মন্টেসরি শিক্ষা প্রোগ্রাম শিশুদের পারস্পরিক মিথোষ্ক্রিয়া শেখার অভিজ্ঞতা এবং সহযোগিতামূলক খেলার মাধ্যমে শক্তিশালী সামাজিক দক্ষতা বিকাশে উৎসাহিত করে। মন্টেসরি পরিবেশের এই গঠন সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণিকক্ষ দলের বিকাশের দিকে পরিচালিত করে, যা শিশুদের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে।

(iii) Creativity (সৃজনশীলতা) : মারিয়া মন্টেসরি মনে করেন, সৃজনশীলতা এমন একটি দক্ষতা নয় যা শেখা যায়, যতটা এটি জ্ঞানীয় বিকাশের প্রক্রিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। এই প্রক্রিয়াটি জন্মের পর সময়ের সাথে সাথে শিশুর বুদ্ধিমত্তার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিকাশ লাভ করে। মন্টেসরি শিক্ষায় সৃজনশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর দ্বারা শিশুরা আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে নিজেদের গঠন করে। মন্টেসরি শিক্ষকের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা শিশুদের উদ্বেগ এবং বিচারের ভয় কমায়, আর অন্বেষণ, একাগ্রতা এবং স্বাধীন শিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত হয়।

(iv) Communication (যোগাযোগ) : মন্টেসরি শিক্ষায় ব্যবহারিক জীবন এবং ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ শক্তিশালী হয়। সৌজন্যের ব্যবহারিক জীবনের পাঠের মাধ্যমে শিশুরা বিনয়ী এবং অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখে। প্রতিটি স্কুলের দিন শিশুরা অভিবাদন অনুশীলন করে, যেমন 'দয়া করে' (Please) এবং 'ধন্যবাদ' (Thank you) এবং কথা বলার সময় চোখের যোগাযোগ রক্ষা করে।

ভাষা পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশকেও শক্তিশালী করা হয়, যা শিশুদের কথ্যভাষা, লেখা ও পড়ার জগতে প্রবেশ ঘটাতে সাহায্য করে।

11.4.5 মন্টেসরি শ্রেণীকক্ষে শিখনের ক্ষেত্রসমূহ (Areas of Learning in Montessori Classroom)

মারিয়া মন্টেসরি দেখতে পেয়েছিলেন যে শিশুরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে শেখার সঙ্গে অন্যান্য শিশুদের থেকে সবচেয়ে ভাল শেখে। তাই তিনি একটি মিশ্র বয়সের গোষ্ঠী তৈরী করেছেন যেখানে ছোট শিশুরা অপেক্ষাকৃত বড় বাচ্চাদের অনুকরণ করে তাদের জ্ঞান ভাগ করে নেতৃত্বের দক্ষতাকে শক্তিশালী করে তোলে। প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ শিশুদের আকার অনুযায়ী তৈরী করা হয় এবং সেখানে সমৃদ্ধ ও উদ্দীপক পরিবেশ প্রদান করা হয়।

প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে নীচে উল্লেখিত পাঁচটি শিক্ষার ক্ষেত্র প্রদান করা হয় :

(i) ব্যবহারিক জীবন (Practical Life) : ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত যত্ন, পরিবেশের যত্ন, অনুগ্রহ এবং সৌজন্যের পাঠ। এই অভ্যাসগুলির মধ্যে কয়েকটি হলো বাস্তব জীবনের বস্তুগুলি বাছাই করে ব্যবহার করা, বোতাম সেলাই করা, গাজরের খোসা ছাড়ানো, পরিবেশন করা ইত্যাদি। এই ক্রিয়াকলাপগুলি ভালো কাজের অভ্যাসকে উৎসাহিত করে, একাগ্রতা বাড়ায়, স্বাধীনতা ও সমন্বয়ের (Coordination) বিকাশ ঘটায়। ব্যবহারিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ শিশুকে শ্রেণিকক্ষের অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রস্তুত করে।

(ii) সংবেদনশীলতা (Sensorial) : শিশুদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই সংবেদনশীল উপাদান শিশুকে পড়া, লেখা এবং গণিত শেখার ক্ষমতাকে তীক্ষ্ণ করে প্রস্তুত করে। উদাহরণস্বরূপ,

যে শিশুটি সাউন্ড সিলিন্ডারে শব্দের সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি উপলব্ধি করেছে তার অক্ষরের ধ্বনিগত সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুভব করার সম্ভাবনা বেশী হবে। শব্দ যন্ত্রের ছোট নবগুলি আঁকড়ে ধরা একটি শিশুকে ছোট ছোট আঙ্গুলের পেশীগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে শেখে। পরিবর্তনশীল মাত্রা, রঙ, আকৃতি, টেক্সাচার এবং গন্ধের অনুভূতি ব্যবহার করে ডিজাইন করা বিভিন্ন উপকরণ অন্বেষণ করতে ইন্দ্রিয় ব্যবহার করার বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে।

(iii) ভাষা (Language) : মন্টেসরি শ্রেণীকক্ষে ধ্বনিগতভাবে ভাষা অন্বেষণ করা হয়। প্রাথমিক বর্ণমালার শব্দগুলি প্রথমে স্যান্ডপেপার অক্ষর এবং মিলিত বস্তুর মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়। বাচ্চারা কিছু শব্দ শেখার পর তাদের চলনযোগ্য বর্ণমালার সাথে মিশ্রিত অনুশীলনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। মেটাল ইনসেটগুলি হলো একপ্রকার অভ্যাসের সামগ্রী, যা পেন্সিল নিয়ন্ত্রণকে পরিমার্জিত করতে এবং লেখার দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করে।

(iv) গণিত (Mathematics) : শিশুকে শেখানো গাণিতিক ধারণাগুলির একটি সহজ এবং স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য আমরা উপকরণের উপর হাত ব্যবহার করি। উদাহরণ স্বরূপ নম্বর রড, স্যান্ডপেপাপ নম্বর, নম্বর বোর্ড, নম্বর পুঁতি, টাইলস, গেমস্ ইত্যাদি। প্রতিটি ব্যবহারের অভ্যাস ধীরে ধীরে শিশুর গাণিতিক মনকে মূর্ত থেকে বিমূর্ত ক্ষেত্রগুলিকে নির্দেশিত করে।

(v) সাংস্কৃতিক (Cultural) : সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতি ও বিজ্ঞানে বিভক্ত। একটি শিশুকে বিশ্বে তাদের অবস্থান শেখানোর জন্য শ্রেণীকক্ষে কিছু ভূগোল সামগ্রী রাখা প্রয়োজন। ইতিহাস পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে শিখতে শিশুকে সাহায্য করে। ঋতু অনুযায়ী আবহাওয়ার পরিবর্তন অধ্যয়ন করা এবং প্রতিটি ক্যালেন্ডার পরিবর্তন করা শিশুকে সময়ের একটি চক্র স্থাপনে সহায়তা করে। শিশুদের প্রকৃতিতে নিয়ে গিয়ে প্রকৃতির কোন উপাদান সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করা হয়। কোন শিশুর জন্মদিনে তার হাতে একটি গ্লোব দিয়ে মেঝেতে রাখা সূর্যের একটি মডেলের চারপাশে ঘুরতে বলে, জন্মদিন পালনের আনন্দের মাধ্যমে পৃথিবী যে সূর্যের চারপাশে ঘোরে সেই বিজ্ঞান জানতে শিশুকে উৎসাহিত করা হয়।

11.5 মন্টেসরি শিক্ষার প্রসার (Expansion of Montessori Education)

11.5.1 ইতালিতে মন্টেসরি শিক্ষার প্রসার (Expansion of Montessori Education in Italy)

1907 খ্রিস্টাব্দে মারিয়া মন্টেসরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইতালীতে শিশুদের জন্য প্রথম স্কুল Casa dei Bambini সফল হওয়ার পর দ্বিতীয়টি খোলা হয়েছিল। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুরা একাগ্রতা, মনোযোগ এবং স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম-শৃঙ্খলা প্রদর্শন করতে থাকে এবং শ্রেণীকক্ষগুলি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। মন্টেসরি পড়া ও লেখার জন্য শিক্ষার উপকরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন, যেমন সরানো যায় এমন কাটআউট অক্ষর এবং লেবেল সহ ছবি, স্যান্ডপেপার থেকে অক্ষর কেটে বোর্ডে লাগানো ইত্যাদি। চার-পাঁচ বছর বয়সী শিশুরা উপকরণগুলির সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড়িত ছিল এবং তাদের বয়সের জন্য যা প্রত্যাশিত ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী লেখা ও পড়ায় দ্রুত দক্ষতা অর্জন করেছিল। মন্টেসরির কাজের প্রতি আরও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল। 1908 খ্রিস্টাব্দে আরও তিনটি 'ক্যাসা দেই বাম্বিনি' খোলা হয় এবং 1809 খ্রিস্টাব্দে ইতালীয় সুইজারল্যান্ড এতিমখানা এবং কিন্ডারগার্টেনগুলিতে মন্টেসরির সাথে ফ্রোবেলিয়ান পদ্ধতি প্রতিস্থাপন শুরু হয়।

1909 খ্রিস্টাব্দে মারিয়া মন্টেসরি ইতালীর Citta di Castello (ক্যাসল টাউন)-এ তাঁর নতুন পদ্ধতিতে প্রথম শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেন। একই বছরে তিনি "Il Metodo della Pedagogia Scientificia Applicato All Educazione Infanitile Nelle Case dei Bambini" (The Method of Scientific Pedagogy Applied to the Education of Children's Houses) শিরোনামের একটি বইয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও পদ্ধতি বর্ণনা করেন। আরও দুটি প্রশিক্ষণ কোর্স 1910 খ্রিস্টাব্দে রোমে এবং তৃতীয়টি 1911 খ্রিস্টাব্দে মিলানে অনুষ্ঠিত হয়। মন্টেসরির খ্যাতি এবং কাজ আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। প্রায় সেই সময় তিনি তাঁর শিক্ষামূলক কাজে, তাঁর পদ্ধতির বিকাশ এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য আরও বেশী সময় দেওয়ার জন্য তাঁর চিকিৎসা অনুশীলন ছেড়ে দেন। 1919 খ্রিস্টাব্দে তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং শিক্ষামূলক কাজে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

11.5.2 মন্টেসরি শিক্ষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (International Recognition of Montessori Education)

1909 খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে মন্টেসরির কাজ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক এবং দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে। তাঁর কাজ আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয় এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। 1911 খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মন্টেসরি শিক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে সুইজারল্যান্ডের পাবলিক স্কুলগুলিতে গৃহীত হয়েছিল এবং যুক্তরাজ্যের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 1912 খ্রিস্টাব্দে প্যারিস এবং অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় শহরে মন্টেসরি স্কুল খোলা হয়েছিল এবং আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, ভারত, জাপান, কোরিয়া, মেক্সিকো, সিরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নিউজিল্যান্ডে মন্টেসরি স্কুল বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। লন্ডন, জোহানেসবার্গ, রোম এবং স্টকহোমের পাবলিক প্রোগ্রামগুলি তাদের স্কুল সিস্টেমে মন্টেসরি শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্টেসরি আমেরিকান কমিটি এবং যুক্তরাজ্যে মন্টেসরি সোসাইটি ফর ইউনাইটেড কিংডম প্রতিষ্ঠিত হয়। 1913 খ্রিস্টাব্দে মন্টেসরি শিক্ষার প্রথম আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স রোমে অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয়টি 1914 খ্রিস্টাব্দে।

এই সময়কালে মন্টেসরির কাজ ব্যাপকভাবে অনুবাদ ও প্রকাশিত হয়। "Il Metodo della

Pegagogia Scientifica" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "The Montessori Method : Scientific Pedagogy as Applied to Child's Houses in Child Education" নামে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ইহা একটি বেস্ট সেলার হয়ে উঠেছিল। এটির একটি সংশোধিত ইতালীয় সংস্করণ 1913 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। রাশিয়ান এবং পোলিশ সংস্করণ 1913 খ্রিস্টাব্দে এবং জার্মান, জাপানি এবং রোমানিয়ান সংস্করণ 1914 তে, তারপর স্প্যানিশ (1915), ডাচ (1916) এবং ডানিশ (1917) সংস্করণগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রথম উত্তর আমেরিকার মন্টেসরি স্কুলটি 1911 খ্রিস্টাব্দে অক্টোবরে নিউ ইয়র্কের ট্যারিটাউনে খোলা হয়েছিল। আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল এবং তাঁর স্ত্রী এর উদ্যোক্তা ছিলেন এবং তাঁদের কানাডিয়ান বাড়ীতে দ্বিতীয় স্কুলটি খোলা হয়।

1913 খ্রিস্টাব্দে রোমে প্রথম আন্তর্জাতিক মন্টেসরি প্রশিক্ষণ কোর্সটি আমেরিকান মন্টেসরি কমিটি কর্তৃক স্পনসর করা হয়েছিল এবং 83 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 67 জনই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। 1913 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 100 টিরও বেশী মন্টেসরি স্কুল খোলা হয়েছিল।

মারিয়া মন্স্টেসরি 1913 এর ডিসেম্বরে তিন সপ্তাহের বক্তৃতা সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করেন এবং যেখানেই তিনি যান সেখানেই তিনি উৎসাহী জনতার সাথে দেখা করেছিলেন। 1915 খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্সে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে। প্রদর্শনীতে একটি কাঁচের দেওয়ালে যুক্ত শ্রেণীকক্ষ স্থাপন করা হয়েছিল এবং সেখানে 21 জন শিক্ষার্থীর ক্লাশ শিখতে হাজার হাজার পর্যবেক্ষক এসেছিলেন। তবে প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক The Montessori Method Examined নামে মন্টেসরি শিক্ষার সমালোচনা মূলক বই লেখেন, যার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। সমালোচকরা অভিযোগ করেছিলেন যে, মন্টেসরি পদ্ধতিটি পুরোনো, অত্যধিক কঠোর, ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল এবং কল্পনা, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং খেলার জন্য খুব কম সুযোগ ছিল। পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্টেসরি আন্দোলন ভেঙে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে আসার পর তিনি স্পেনের বার্সোলোনায় 1915 খ্রিস্টাব্দে একটি ছোট প্রোগ্রামের আয়োজন করেছিলেন, যাতে তিন থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে "ল্যাবরেটরি আই সেমিনারী ডি পেডাগগিয়া" নামক একটি প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়েছিল। 1916 খ্রিস্টাব্দে সেখানে একটি চতুর্থ আন্তর্জাতিক কোর্সের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে ছয় থেকে বারো বছর বয়সী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ব্যাকরণ, পাটিগণিত এবং জ্যামিতি শেখানোর জন্য বিভিন্ন উপকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে বার্সোলোনায় 1924 খ্রিস্টাব্দে মন্টেসরির মডেল স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। 1933 খ্রিস্টাব্দে আবার দ্বিতীয় স্প্যানিশ প্রজাতন্ত্রের অধীনে একটি নতুন মন্টেসরি শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স সরকার কর্তৃক স্পনসর করা হয়। 1936 খ্রিস্টাব্দে স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধ শুরু হলে মন্টেসরিকে স্থায়ীভাবে স্পেন ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়।

1917 খ্রিস্টাব্দে মারিয়া মন্টেসরি আমস্টারডামে বক্তৃতা দেন এবং নেদারল্যান্ডস মন্টেসরি সোসাইটি

প্রতিষ্ঠিত হয়। নেদারল্যান্ডসে মন্টেসরি প্রোগ্রামের বিকাশ ঘটে এবং 1930-এর দশকের মাঝামাঝি দেশে 200 টিরও বেশী মন্টেসরি স্কুল খুলেছিল। 1935 খ্রিস্টাব্দে অ্যাসোসিয়েশন মন্টেসরি ইন্টারন্যাশনাল (AMI)-এর সদর দপ্তর স্থায়ীভাবে আমস্টারডামে স্থানান্তরিত হয়।

1919 খ্রিস্টাব্দে মারিয়া মন্টেসরি প্রথমবারের মতো ইংল্যন্ডে যান এবং একটি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছিলেন, যা অধিক আগ্রহের সাথে গৃহীত হয়েছিল। মন্টেসরি শিক্ষা যুক্তরাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যদিও প্রচেষ্টাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত বিরোধিতার জন্য কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। মারিয়া মন্টেসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত প্রতি বছর ইংল্যান্ডে মন্টেসরি শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

মন্টেসরি 1923 খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনার শিশু শিক্ষা নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতাগুলি ''ফ্যামিগ্লিয়ায় ইল বাম্বিনো' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। 1913 থেকে 1936 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, রাশিয়া, সার্বিয়া, কানাডা, ভারত, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে মন্টেসরি স্কুল এবং সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপে ক্রমবর্ধমান সামরিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে, মারিয়া মন্টেসরি শান্তির বিষয়বস্তুর দিকে মনোযোগ দেন। 1937 খ্রিস্টাব্দে 6তম আন্তর্জাতিক মন্টেসরি কংগ্রেস ''শান্তির জন্য শিক্ষা'' বিষয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মন্টেসরি একটি ''শান্তি বিজ্ঞান''-এর আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সমাজ সংস্কারের চাবিকাঠি হিসেবে শিশু শিক্ষার ভূমিকা উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

11.5.3 ভারতে মারিয়া মন্টেসরি (Maria Montessori in India)

মারিয়া মন্টেসরির প্রতি আগ্রহ ভারতে 1913 খ্রিস্টাব্দ থেকে বিদ্যমান ছিল, যখন একজন ভারতীয় ছাত্র রোমে প্রথম আন্তর্জাতিক মন্টেসরি শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান করেছিলেন। 1920 থেকে 1930 এর দশকে মন্টেসরির অনুরাগী ছাত্ররা ভারতে মন্টেসরি শিক্ষার প্রচার এবং স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সক্রিয় হয়েছিলেন। 1926 খ্রিস্টাব্দে ''মন্টেসরি সোসাইট অফ ইন্ডিয়া'' গঠিত হয়েছিল এবং মারিয়া মন্টেসরি শিশু শিক্ষার প্রচার করতে পুত্র মারিওসহ ভারতে এসেছিলেন। ''ইল মেটোডো পেডাগগিয়া'' বা শিক্ষাবিদ্যার পদ্ধতি 1927 খ্রিস্টাব্দে গুজরাটি ও হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। 1929 খ্রিস্টাব্দে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতে ''টেগোর-মন্টেসরি'' স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মারিয়া মন্টেসরি নিজেই ''থিওসফিক্যাল সোসাইটি''র সাথে ব্যক্তিগত ভাবে যুক্ত ছিলেন। থিওসফিক্যাল আন্দোলন, ভারতের দরিদ্রদের শিক্ষিত করার জন্য অনুপ্রাণিত একটি সমাধান হিসেবে মন্টেসরি শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। মারিয়া মন্টেসরি 1939 খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে আয়োজিত একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি শিশু শিক্ষা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। 1940 খিরস্টাব্দে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, মারিয়া মন্টেসরির ছেলে মারিও মন্টেসরিকে ভারতে অন্তরীণ করা হয়েছিল, যখন মারিয়া মন্টেসরি নিজে থিওসফিক্যাল সোসাইটির কম্পাউন্ডে

সীমাবদ্ধ ছিলেন এবং মারিও দুই মাস পর তার মায়ের সাথে পুনরায় মিলিত হন। 1946 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মারিয়া মন্টেসরি ও মারিও মন্টেসরি মাদ্রাজ ও কোডাইকানালে ছিলেন। তাঁদের বক্তৃতাও শিশু শিক্ষা কোর্সের সাথে সাথে ভ্রমণের অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। ভারতে মন্টেসরি ও তাঁর ছেলে মারিও মন্টেসরি শিক্ষার বিকাশ অব্যাহত রেখেছিলেন।

শিশুরা তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে গাছপালা ও প্রাণীদের সাথে সরাসরি কাজ করেছিল এবং তাদের ব্যবহারের জন্য চিত্র, পাঠ, চার্ট এবং মডেল তৈরী করা হয়েছিল। 1942 এবং 1944 এর মধ্যে এই উপাদানগুলি ছয় থেকে বারো বছর বয়সী শিশুদের সাথে কাজের জন্য একটি উন্নত কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ভারতে থাকাকালীন মন্টেসরি সমস্ত বয়সের শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। 1944 খ্রিস্টাব্দে তিনি শিশুর জীবনের প্রথম তিন বছরের উপর 30টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং শ্রীলঙ্কায় একটি সরকার স্বীকৃত প্রশিক্ষণ কোর্স করেছিলেন। এই বক্তৃতাগুলি 1949 খ্রিস্টাব্দে "আপনার সন্তানের সম্পর্কে আপনার কী জানা উচিত"—বইটিতে প্রকাশিত হয়েছিল। 1944 খ্রিস্টাব্দে মন্টেরসরিদের চলাচলের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁরা শ্রীলঙ্কায় ভ্রমণ করেছিলেন। 1945 খ্রিস্টাব্দে মন্টেসরি জয়পুরে সর্বভারতীয় মন্টেসরি সম্মেলনে যোগ দেন এবং 1946 খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি ও তাঁর ছেলে মারিও ইউরোপে ফিরে যান। 1947 খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং শিশু শিক্ষার উপর কয়েকটি কোর্স পরিচালনা করেন। এই কোর্সগুলির সময়, মন্টেসরি জন্মের পর থেকে শিশুর বিকাশের ধারার বর্ণনা দেন। 1948 খ্রিস্টাব্দে "Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all educazione infantile nell Case dei Bambini" আবার সংশোধিত হয় এবং ইংরেজিতে "The Discovery of the Child" নামে প্রকাশিত হয়।

11.6 সারাংশ (Summary)

শিশু শিক্ষার মন্টেসরি পদ্ধতি একজন ইতালীয় ডাক্তার ও শিক্ষাবিদ ডঃ মারিয়া মন্টেসরি কর্তৃক প্রস্তাবিত ও বিকশিত হয়েছিল। এটি একটি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি যা বিশ্বজুড়ে গৃহীত হয়েছে। এই পদ্ধতিটি শিশুর শারীরিক, সামাজিক, প্রোক্ষোভিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দেয়। শ্রেণীকক্ষের স্থানগুলি উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে ডিজাইন করা হয়ে থাকে এবং শিশুদের ব্যবহারের জন্য উপকরণগুলির যত্নসহকারে তৈরী করা হয়। ডঃ মন্টেসরি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাগত প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো একটি শিশুর শেখার স্বাভাবিক ইচ্ছা গড়ে তোলা।

মন্টেসরি শিক্ষার শিক্ষাবিদরা শিশুদের জন্য এমনভাবে উপকরণগুলি তৈরী করেন যাতে সহজেই তারা হাতে পায় ও উপকরণগুলি উজ্জ্বল বর্ণের হওয়ায় সেগুলি শিশুদেরকে আকৃষ্ট করে। একটি মন্টেসরি শ্রেণীকক্ষে শিশুদের স্বাধীনতার একটি স্পষ্ট অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। ডঃ মন্টেসরি লক্ষ্য করেছেন যে,

শিশুরা কাজের মাধ্যমেই অনুপ্রাণিত হয় এবং সব থেকে ভাল শেখে। মন্টেসরি স্কুলে শিশুরা শেখে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, চিন্তা করতে হয়, মূল্যায়ন করতে হয় এবং শেখার আনন্দ অনুভব করতে হয়। শিশুরা হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে শেখে এবং স্বাধীনতার মাধ্যমে তাদের চরিত্রের বিকাশ ঘটে।

"Children learn naturally through activity and
thier characters develop through freedom."

—Doctor Maria Montessori

11.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. ড. মারিয়া মন্টেসরির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
2. মারিয়া মন্টেসরির শিক্ষা সম্পর্কে লিখুন।
3. মারিয়া মন্টেসরির কর্মজীবনের একটি পরিচয় দিন।
4. মন্টেসরি শিক্ষা সম্পর্কে একটি ধারণা দিন।
5. প্রথম 'ক্যাসা দেই বাম্বিনী" প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
6. মন্টেসরি শিক্ষা পদ্ধতির নীতিগুলির পরিচয় দিন।
7. মন্টেসরি শিক্ষার সাফল্যের চার 'C' সম্পর্কে লিখুন।
8. মন্টেসরি শিক্ষার শিখনের ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে লিখুন।
9. মন্টেসরি শিক্ষার ইতালীতে এবং আন্তর্জাতিক ভাবে প্রসার সম্পর্কে বিবৃত করুন।
10. ভারতে মন্টেসরি শিক্ষায় মারিয়া মন্টেসরির অবদান সম্পর্কে লিখুন।

11.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- Maria Montessori, Wikipedia, https://www.en.m.wikipedia.org. Retrieved on 05.06.2024
- Principles of Montessori Method, https://www.cbdmontessorianrora. Retrieved on 05.06.2024
- Who was Maria Montessori?American Montessori Society, https://amshq.org, Retrieved on 05.06.2024

- Montessori and the Four C's of Success, Rowntree Montessori School, https://rowntreemontessori.com, Retrieved on 06.06.2024
- Five Arears of the Montessori Classroom, https://pathwaymontessori.com, Retrieved on 06.06.2024
- Basic Concepts and Practice of Montessori Method, https://mybrightwheel.com, Retrieved on 07.06.2024
- Biography of Dr. Marie Montessori, Montessori Australia, https:// montessori.org.an, Retrieved on 07.06.2024
- Montessori Education, https://montessori-nw.org, Retrieved on 08.06.2024
- Casa dei Bambini, Wikipedia, https:// it.wikipedia.org, Retrieved on 08.06.2024
- Five Principles of the Montessori Method of Teaching, https://globalindianschool.org. Retrieved on 09.06.2024
- Montessori Principles, Montessori Academy, https://montessoriacademy.com, Retrieved on 09.06.2024

একক 12 ❑ উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক (William Heard Kilpatrick)

গঠন

12.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

12.2 ভূমিকা (Introduction)

12.3 কিলপ্যাট্রিকের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা এবং কর্মজীবন (Family Life, Education and Service of Kilpatrick)

12.3.1 কিলপ্যাট্রিকের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা (Family Life and Education of Kilpatrick)

12.3.2 কিলপ্যাট্রিকের কর্মজীবন (Service Life of Kilpatrick)

12.4 কিলপ্যাট্রিকের শিক্ষা দর্শন ও প্রোজেক্ট মেথড (Kilpatrick's Philosophy of Education and Project Method)

12.4.1 কিলপ্যাট্রিকের শিক্ষা দর্শন (Kilpatrick's Philosophy of Education)

12.4.2 প্রোজক্ট মেথড (Project Method)

12.5 কিলপ্যাট্রিকের প্রোজেক্ট মেথডের সাথে মন্টেসরির শিশু শিক্ষা পদ্ধতি এবং জন ডিউইয়ের সমস্যা সমাধান পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা (Comparative dicussion of Kilpatrick's Project Method with Montessori Child Education and John Dewey's Problem Solving Method)

12.5.1 কিলপ্যাট্রিকের প্রোজেক্ট মেথড এবং মন্টেসরির শিশুশিক্ষা পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা (Comparative discussion of Kilpatrick's Project Method with Montessori Child Education)

12.5.2 কিলপ্যাট্রিকের প্রোজেক্ট মেথড এবং জন ডিউইয়ের সম্যসা সমাধান পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা (Comparative discussion of Kilpatrick's Project Method with John Dewey's Problem solving Method)

12.6 সারাংশ (Summary)

12.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

12.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

12.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিকের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কিলপ্যাট্রিকের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হবেন।
- কিলপ্যাট্রিকের কর্মজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কিলপ্যাট্রিকের শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কিলপ্যাট্রিক প্রবর্তিত শিক্ষার প্রোজেক্ট মেথড সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মন্টেসরি পদ্ধতি সম্পর্কে কিলপ্যাট্রিকের সমালোচনা জানতে পারবেন।
- জন ডিউই-র সমস্যা সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে কিলপ্যাট্রিকের সমালোচনা জানতে পারবে।

12.2 ভূমিকা (Introduction)

উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক উনিবিংশ-বিংশ শতাব্দীর একজন আমেরিকান শিক্ষাবিদ, যিনি জন ডিউয়ের উত্তরসূরি ছিলেন। তিনি 20 শতকের গোড়ার দিকে প্রগতিশীল শিক্ষা আন্দোলনের একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি প্রকল্প পদ্ধতিকে শিক্ষার দর্শনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রকল্প পদ্ধতি শিশুকেন্দ্রিক এবং প্রগতিশীল শিক্ষার উপর ভিত্তি করে কার্যকরী। উভয় পন্থা আজও বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিলপ্যাট্রিক জর্জিয়ার ম্যাকনের মার্সার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। অতঃপর তিনি জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতে স্নাতক করতে যুক্ত হন। তিনি জর্জিয়ায় একটি পালবিক স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবেও কাজ করেছিলেন। 1908 খ্রিস্টাব্দে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কলেজে তাঁর ডক্টরেট গবেষণা শুরু করার জন্য নিউইয়র্ক সিটিতে চলে যান। যেখানে জন ডিউই তাঁর প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। জন ডিউই তাঁকে তাঁর সর্বকালের সেরা ছাত্র বলে অভিহিত করেছিলেন। কিলপ্যাট্রিক অবশেষে শিক্ষার দর্শনে একজন পূর্ণসময়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন, যে পদে তিনি 1912 থেকে 1937 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

1918 খ্রিস্টাব্দে টিচার্স কলেজ থেকে তাঁর প্রবন্ধ "The Project Method" প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষা জগতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সেই প্রবন্ধে তিনি জন ডিউই-এর সমস্যা সমাধান পদ্ধতির

বাস্তবায়নের জন্য একটি ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রদান করেছিলেন। তিনি প্রকাশ করেছিলেন কীভাবে শিক্ষার্থীরা বৌদ্ধিক, শারীরিক এবং প্রক্ষোভিক স্তরে উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপে নিযুক্ত হতে পারে। প্রকল্প পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তি সে সময় প্রগতিশীল শিক্ষাবিদদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল, যা শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতির সাথে মিল ছিল। "The Project Method" শিক্ষাবিদদের মধ্যে বেস্ট সেলার হয়েছিল এবং কিলপ্যাট্রিকের জাতীয় পাবলিক ক্যারিয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।

12.3 কিলপ্যাট্রিকের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা এবং কর্মজীবন (Family Life, Education and Service of Kilpatrick)

12.3.1 কিলপ্যাট্রিকের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা (Family Life and Education of Kilpatrick)

উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক 1871 খ্রিস্টাব্দের 20 নভেম্বর আমেরিকার জর্জিয়ার White Plains-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম James Hines Kilpatrick, একজন ব্যাপটিস্ট যাজক এবং মায়ের নাম Edna Perrim (Heard) Kilpatrick। স্থানীয় স্কুল পদ্ধতিতে স্কুল শিক্ষা শেষ করার পর তিনি 17 বছর বয়সে জর্জিয়ার একটি ব্যাপটিস্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মার্সার বিশ্ববিদ্যালয়ে (Mercer University) একজন Sophomore (দ্বিতীয় স্তর) হিসেবে ভর্তি হন। কিলপ্যাট্রিকের দাদা প্রতিষ্ঠানটির একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। 1891 খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্নাতক হন। তারপর কিলপ্যাট্রিক জনস হফকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত এবং পদার্থবিদ্যায় স্নাতক অধ্যয়নের এক বছর শেষ করেন। সেই বছরের শেষে তিনি মার্সারে ফিরে আসেন, সেখানে 1892 খ্রিস্টাব্দে হফকিন্সে তাঁর কাজের জন্য তাঁকে এম.এ. ডিগ্রী দেওয়া হয়।

অতঃপর তিনি জর্জিয়ার ব্লেকেলিতে স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরীতে নিযুক্ত হন। ব্লেকেলিতে শিক্ষকতা করার সময় রক কলেজে শিক্ষার গ্রীষ্মকালীন স্কুল কোর্স গ্রহণ করেন। তখন তিনি শিক্ষণ শিখনের প্রক্রিয়ার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। জর্জিয়ার সাভানা ও মার্সারে তিনি বিভিন্ন স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে কিলপ্যাট্রিক 1898 খ্রিস্টাব্দের 27 ডিসেম্বর ফ্লোরিডার মারিয়ানার Marie Beman Gnyton কে বিয়ে করেন। তাদের তিনটি সন্তান ছিল। যাদের দুইজন শৈশবেই মারা যান।

1907 খ্রিস্টাব্দে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার্স কলেজে 'শিক্ষাতত্ত্ব' অধ্যয়নের জন্য একটি বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং ছাত্র হিসেবে অধ্যয়ন করেন। ঐ বছরেই তাঁর স্ত্রী যক্ষ্মা রোগে মারা যান এবং 1908 খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার Margaret Manigault Pinckney কে বিয়ে করেন। তিনি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা চালিয়ে যান এবং তাঁর আগ্রহের বিষয় শিক্ষণ পদ্ধতির উপর অনেক গবেষণা করেন। তিনি "প্রোজেক্ট মেথড"-এর উদ্ভাবক এবং ঐ বিষয়ের উপর অনেক বই এবং প্রবন্ধ লিখে বিশ্বখ্যাত হয়েছেন। 1912 খ্রিস্টাব্দে তিনি টিচার্স কলেজে কর্মরত অবস্থায় তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রী

লাভ করেন। 1938 খ্রিস্টাব্দে অবসর নেওয়ার পর কিলপ্যাট্রিক নাগরিক বিষয়ে সক্রিয় ছিলেন এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়া চালিয়ে যান। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী 1938 খ্রিস্টাব্দেই মারা যান এবং তিনি 1940 খ্রিস্টাব্দের 8 মে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রী Marion Ostrander কে বিয়ে করেন। উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক 1965 খ্রিস্টাব্দের 13 ফেব্রুয়ারী 94 বছর বয়সে নিউইয়র্ক শহরে মারা যান।

12.3.2 কিলপ্যাট্রিকের কর্মজীবন (Service Life of Kilpatrick)

কিলপ্যাট্রিক মার্সার বিশ্ববিদ্যালয় এবং হফকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও পদার্থবিদ্যায় স্নাতক এবং স্নাতোকত্তর স্তরে পড়াশুনা শেষ করার পর 1892 খ্রিস্টাব্দে প্রথম জর্জিয়ার ব্লেকেলিতে একটি প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। স্কুলে প্রথম বছর শিক্ষকতা করার পর তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন। ব্লেকেলিতে শিক্ষকতা করার সময়, কিলপ্যাট্রিক রক কলেজে শিক্ষাতত্ত্বের উপর গ্রীষ্মকালীন কোর্স গ্রহণ করেন এবং শিক্ষণ-শিখনের প্রক্রিয়ার উপর গভীর আগ্রহ তৈরী হয়। ব্লেকেলিতে তিন বছর চাকুরী করার পর তিনি জর্জিয়ার সাভানাতে চলে যান যেখানে তিনি অ্যান্ডারসন এলিমেন্টারি স্কুলে অধ্যক্ষের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তিনি মার্সার বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ গ্রহণ করেন। কিলপ্যাট্রিক 1897 থেকে 1906 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মার্সার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং শেষের দিকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সাথে মত পার্থক্যের কারণে কিলপ্যাট্রিক 1906 খ্রিস্টাব্দে পদত্যাগ করেন।

অতঃপর তিনি জর্জিয়া হাই স্কুলে গণিতের শিক্ষক হিসেবে একটি পদ গ্রহণ করেন এবং স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবেও দ্বৈত ভূমিকা পালন করেন। পরের বছর তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কলেজে শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য একটি বৃত্তি গ্রহণ করেন, যেখানে তিনি ছাত্র ছিলেন এবং 1938 খ্রিস্টাব্দে অবসর না নেওয়া পর্যন্ত ফ্যাকাল্টি ছিলেন। 1909 খ্রিস্টাব্দে কিলপ্যাট্রিক টিচার্স কলেজে একজন আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। 1915 খ্রিস্টাব্দে তিনি সহযোগী অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং 1918 খ্রিস্টাব্দে তিনি পূর্ণ অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কেনটাকি বিশ্ববিদ্যালয়, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে বক্তৃতাও দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন দেশে স্কুল পরিদর্শনও করেন। তিনি অস্ট্রিয়া, সিলন (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা), চীন, চেকোস্লোভাকিয়া (বর্তমানে চেক প্রজাতন্ত্র এবং স্লোভাকিয়া), মিশর, হল্যান্ড, ভারত, জাপান, কোরিয়া এবং তুরস্কে প্রোজেক্ট মেথড বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

কিলপ্যাট্রিক শিক্ষা সংক্রান্ত এবং নাগরিক উভয় প্রকার সংস্থায় অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছেন, যেমন—আমেরিকান ইয়ুথ ফর ওয়ার্ল্ড ইয়ুতের চেয়ারম্যান, বেনিংটন কলেজের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি, জন ডিউই সোসাইটির সভাপতি, লীগ ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেমোক্রেসির সভাপতি এবং

গ্রেটার নিউ ইয়র্কের আর্বান লীগের সভাপতি। 1920 থেকে 1930-এর দশকে কিলপ্যাট্রিক সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রগতিশীল শিক্ষাবিদদের একজন হয়ে ওঠেন। জন ডিউই-কে বাদ দিয়ে কিলপ্যাট্রিক সম্ভবত শিক্ষাবিদ এবং সাধারণ জনগণের দ্বারা প্রায়শই প্রগতিবাদীদের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁকে পণ্ডিতেরা ডিউই-এর একজন যোগ্য শিষ্য এবং পরবর্তীদের শিক্ষাদর্শনের জনপ্রিয় পথপ্রদর্শক হিসেবেও দেখেছিলেন। জন ডিউই কিলপ্যাট্রিককে "আমার সর্বকালের সেরা ছাত্র" বলে অভিহিত করেছেন।

1934 খ্রিস্টাব্দে তিনি "দ্য সোশাল ফ্রন্টিয়ার" নামক একটি সংস্কারবাদী শিক্ষামূলক জার্নাল চালু করার জন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি 1939 থেকে 1943 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জার্নালটির সহ-সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি 14টি বই এবং শতাধিক নিবন্ধের লেখক ছিলেন। তাঁর লেখা ছাড়াও, আমেরিকান শিক্ষার উপর কিলপ্যাট্রিকের গভীর প্রভাব ছিল। ক্লাশ পরিচালনা করার ক্ষমতা কিংবদন্তি ছিল। অনুমান করা হয় যে, তিনি টিচার্স কলেজে প্রায় 35,000 শিক্ষার্থীকে পড়িয়েছেন, যাদের অনেকেই শিক্ষাজগতে প্রভাব ফেলেছেন।

12.4 কিলপ্যাট্রিকের শিক্ষা দর্শন ও প্রোজেক্ট মেথড (Kilpatrick's Philosophy of Education and Project Method)

12.4.1 কিলপ্যাট্রিকের শিক্ষা দর্শন (Kilpatrick's Philosophy of Education)

কিলপ্যাট্রিকের শিক্ষা দর্শন ছিল প্রগতিশীল শিক্ষার একটি রূপ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন শিক্ষকের ভূমিকা একজন কর্তৃত্ববাদী ব্যক্তিত্বের বিপরীত একজন "গাইড" এর মতো হওয়া উচিত। কিলপ্যাট্রিকের মতে, শিশুদের তাদের আগ্রহ অনুযায়ী তাদের নিজস্ব শেখার নির্দেশ দেওয়া উচিত, তাদের পরিবেশ অন্বেষণ করতে দিয়ে প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাদের শেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করা উচিত। প্রগতিশীল শিক্ষার প্রবক্তা হিসেবে তিনি প্রথাগত শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেমন যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ করা, কঠোর ভাবে সংগঠিত শ্রেণীকক্ষ (যেমন সারিবদ্ধ ডেস্ক, শিক্ষার্থীরা সর্বদা বসে থাকা, ইত্যাদি) এবং মূল্যায়নের সাধারণ রূপ। তাঁর শিক্ষার দর্শনকে উন্নয়নবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিলপ্যাট্রিকের শিক্ষা দর্শন অনুযায়ী পাঠ্যক্রম হল উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপ যা শিশুকেন্দ্রিক এবং শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশ ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি তাঁর শিক্ষা দর্শনকে "Project Method" হিসেবে প্রকাশ করেছেন। কিলপ্যাট্রিকের ধারাবাহিক প্রগতিশীল বার্তা ছিল যে, স্কুলগুলিকে আরও শিশুকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক এবং সমাজ ভিত্তিক হতে হবে।

শিশুদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এবং শিক্ষকদের 'তাদের পাশে থাকার' গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে এবং সেইসাথে শিক্ষকদের অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা প্রদান করা এবং শিশুদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের মানুষ হিসেবে আচরণ করার জন্য কিলপ্যাট্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতির আগ্রহের প্রতি মূল ভূমিকা দেখিয়েছিলেন। কিলপ্যাট্রিকের প্রকল্প পদ্ধতির মূল ধারণা হলো বিভিন্ন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমাধানের জন্য প্রকল্পে কাজ

করার সময় ছাত্ররা কীভাবে লেখে তা অনুধাবন করা। প্রকল্প পদ্ধতিটি আচরণগত মনোবিজ্ঞান (Behavioural Psychology) এবং প্রগতিবাদের (Progressivism) মিশ্রণ। ইহা আচরণগত ছিল কারণ এর মাধ্যমে ছাত্রদের আচরণ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ইহা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল।

কিলপ্যাট্রিকের মতে স্কুল শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দেশ্যেই পূরণ করে তা নয়, বরং ইহা সামাজিক উদ্দেশ্যও পূরণ করে। তাঁর মতে পাঠ্যক্রম বাস্তব জীবন থেকে আসা উচিত, পূর্ব নির্দ্ধারিত বিষয়বস্তু থেকে নয়। এই ধারণা থেকে একটি সমন্বিত পাঠ্যক্রমের ধারণার উদ্ভব ঘটে যা সর্বাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্ভব হয়।

12.4.2 প্রোজক্ট মেথড (Project Method) বা প্রকল্প পদ্ধতি

উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক 20 শতকের প্রথম দিকে 1918 খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাদানের প্রকল্প পদ্ধতিকে শিক্ষা জগতে প্রকাশ করেছিলেন, যা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর মতে—

"A project is supposed to be a whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment. It aims at social development besides nurturing abilities for problem-solving."

অর্থাৎ, একটি প্রকল্প একটি সামাজিক পরিবেশে অগ্রসর হওয়া একটি সম্পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপ বলে মনে করা হয়। এটির লক্ষ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সক্ষমতা লালন করার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন।

প্রকল্প পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Project Method)

(i) ইহা প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিচালিত হয়।

(ii) এই পদ্ধতিতে শিখন বাস্তবসম্মত এবং অভিজ্ঞতামূলক করে তোলে।

(iii) এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

(iv) এটি একটি অনুসন্ধানমূলক শিক্ষা।

(v) ইহা ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানকে উৎসাহিত করে।

(vi) ইহা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণার মনোভাবকে উৎসাহিত করে।

প্রকল্পের প্রকার ভেদ (Types of Projects)

কিলপ্যাট্রিক অনুসারে প্রকল্প চার প্রকার :

1. **গঠনমূলক প্রকল্প (Constructive Project) :** এই ধরণের প্রকল্পে ব্যবহারিক বা দৈহিক কাজ, যেমন প্রবন্ধ তৈরী, মডেল তৈরী, কূপ খনন করা, নাটকে অভিনয় করা ইত্যাদি।

2. **নান্দনিক প্রকল্প (Aesthetic Project) :** বাদ্যযন্ত্রের অনুষ্ঠান, কোন কিছুর সৌন্দর্যায়ন, কবিতার চর্চা করা, কোন দক্ষতার প্রশংসা করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিকশিত হয়।

3. **সমস্যাযুক্ত প্রকল্প (Problematic Project) :** এই ধরনের প্রকল্পে শিক্ষার্থীদের তাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। ইহা মনের বৌদ্ধিক ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে ঘটে।

4. **ড্রিল প্রকল্প (Drill Project) :** ইহা শিক্ষার্থীদের দক্ষতা এবং জ্ঞানের অর্জনের জন্য করা হয়। ইহা শিক্ষার্থীদের কাজের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

প্রকল্প পদ্ধতির ধাপসমূহ (Steps of a Projects Method) :

কিলপ্যাট্রিকের প্রোজেক্ট মেথড নিম্নলিখিত ধাপগুলির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় :

1. **একটি পরিস্থিতি তৈরী করা (Creating a Situation) :** প্রকল্প পদ্ধতির প্রথম ধাপে শিক্ষক ক্লাসে শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরী করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে প্রকল্প পদ্ধতির, পদক্ষেপ এবং ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান তুলে ধরবেন। শিক্ষক পরিস্থিতি খুঁজে বের করার জন্য শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও শখ যাচাই করবেন।

2. **বাছাই করা এবং প্রস্তাব করা (Choosing and Purposing) :** শিক্ষক ছাত্রদের সমস্যা নির্বাচন করতে তাদের গাইড করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রস্তাবিত আগ্রহ ও ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তাদের সমস্যা নির্বাচন করার স্বাধীনতা রয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাধ্য করবেন না, বরং তাদের কোন সমস্যা সমাধানে অনুপ্রাণিত করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাবেন, যতক্ষণ না তারা সঠিক পথে এগোবে।

3. **পরিকল্পনা (Planning) :** শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণে পরামর্শ দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সমস্যা সমাধানের ধাপগুলি জেনে, সেগুলিকে পরিমার্জিত করে বোর্ডে ধাপে ধাপে পরিকল্পনা লিখবেন।

4. **সম্পাদন (Excecution) :** শিক্ষার্থীরা প্রথমে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করবে। শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের নিজস্ব গতি, আগ্রহ এবং সামর্থ অনুযায়ী তাদের পরিচালনা করা। শিক্ষক তাদের উপকরণের অপচয় রোধ করতে এবং দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে ছাত্রদের তদারকি করবেন।

5. **মূল্যায়ন (Evaluation) :** প্রকল্পের মূল্যায়ন ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই করা উচিত। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব কাজের মূল্যায়ন করে ত্রুটি থাকলে তা পরীক্ষা করবে। তারা নির্দ্ধারণ করবে যে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা। এরপর তারা সমালোচনা করে এবং কাজ সম্পর্কে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে। প্রকল্পের মূল্যায়ন পরিকল্পনা, বাস্তবায়নে অসুবিধা এবং প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে করতে হবে।

6. **রিপোর্টিং এবং রেকর্ডিং (Reporting and Recording) :** এটি প্রকল্প পদ্ধতির শেষ ধাপ যেখানে কাজের প্রতিটি ধাপের রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করতে হয়। রিপোর্টিংগুলো একটি নির্দিষ্ট ক্রমে একটি Note Book এ লিখতে হয়, যাকে রেকর্ডিং বলে। এতে প্রস্তাবনা, পরিকল্পনা এবং তার আলোচনা, বিভিন্ন ছাত্রদের জন্য বরাদ্দকৃত দায়িত্ব এবং সেগুলি কতটা সম্পন্ন করা হয়েছে, সবকিছু অন্তর্ভুক্ত হবে। এতে ভবিষ্যতে এর পরিদর্শন ও পরীক্ষা করার কথাও লেখা থাকবে। সুন্দরভাবে প্রস্তুত রেকর্ডিং Note Book বা Report আকারে শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হয়।

12.5 কিলপ্যাট্রিকের প্রোজেক্ট মেথডের সাথে মন্টেসরির শিশুশিক্ষা পদ্ধতি এবং জন ডিউইয়ের সমস্যা সমাধান পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা (Comparative dicussion of Kilpatrick's Project Method with Montessori Child Education and John Dewey's Problem Solving Method)

12.5.1 কিলপ্যাট্রিকের প্রোজেক্ট মেথড এবং মন্টেসরির শিশুশিক্ষা পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা (Comparative discussion of Kilparick's Project Method with Montessori Child Education)

কিলপ্যাট্রিক মন্টেসরির শিশুশিক্ষা পদ্ধতিকে "শিক্ষামূলক যন্ত্রের" সাথে তুলনা করে বলেছেন যে ইহা খুব বেশী আনুষ্ঠানিক এবং এতে সামান্য বৈচিত্র্য রয়েছে। তিনি বলেছেন, পরিসরটি স্বাভাবিক শিশুর জন্য খুব সীমিত ও সংকীর্ণ। তিনি স্বীকার করেছেন যে শিশুদের জন্য তৈরী উপাদানগুলির শক্তিশালী আকর্ষণ রয়েছে, কিন্তু এটি "সাধারণভাবে সক্রিয় শিশুদের জন্য খুবই সামান্য"।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পদ্ধতি শিশুর শেখার জন্য সেরা হিসেবে বলা হয়েছে। কিলপ্যাট্রিকের প্রোজেক্ট মেথড এবং মন্টেসরি শিক্ষা এরূপ দুটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। যদিও উভয় পদ্ধতিই সক্রিয়তা ও হাতে কলমে শিক্ষার উপর জোর দেয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও রয়েছে। নীচে পদ্ধতি দুটির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হল—

1. **খাঁটি শেখার অভিজ্ঞতা (Authentic Learning Experiences) :** প্রোজেক্ট মেথড শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তব সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে উৎসাহিত করে, তাদেরকে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়। শিক্ষার্থীরা ধারণাগুলি এবং তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি করে, যা ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার জন্য তাদের প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।

   কিন্তু মন্টেসরি শিক্ষা প্রাথমিকভাবে একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে পৃথক অণ্বেষণ এবং

স্ব-নির্দেশিত শিক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যদিও এটি স্বাধীনতা এবং একাগ্রতা বৃদ্ধি করতে পারে, ইহা প্রকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতার গভীরতার তুলনায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

2. **সহযোগিতা এবং যোগাযোগ দক্ষতা (Collaboration and Communication Skills) :** কিলপ্যাট্রিকের প্রোজেক্ট মেথডের মাধ্যমে শিক্ষা সহযোগিতা এবং যোগাযোগ দক্ষতাকে উৎসাহিত করে, যা আধুনিক বিশ্বে সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দলগত প্রোজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শেখে কিভাবে দলে কার্যকরভাবে কাজ করতে হয়, দায়িত্ব অর্পন করতে হয় এবং তাদের ধারণাগুলি স্পষ্টভাবে সবার সাথে যোগাযোগ করতে হয়। এই সহযোগিতামূলক অভিজ্ঞতা সহানুভূতি, বোঝাপড়া এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করে।

   অন্যদিকে, মন্টেসরি পদ্ধতি সাধারণত ব্যক্তিগত কাজ এবং স্ব-গতিসম্পন্ন শিক্ষার উপর জোর দেয়। যদিও এটি শিশুদের স্বাধীনতা বিকাশে সাহায্য করে, ইহা সহযোগিতা এবং যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশের জন্য যথেষ্ট সুযোগ নাও প্রদান করতে পারে, যা আজকের আন্তঃসম্পর্ক যুক্ত সমাজে খুবই প্রয়োজন।

3. **সমস্যা সমাধান এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা (Problem-Solving and Critical Thinking) :** প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা (Project based Learning) শিক্ষার্থীদেরকে সমস্যা সমাধানের জন্য জটিল চ্যালেঞ্জের সাথে উপস্থাপন করে সমস্যার সমাধান এবং সমালোচনামূলক চিন্তার দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলভাবে চিন্তা করতে, তথ্য বিশ্লেষণ করতে এবং উদ্ভাবনী সমাধান তৈরী করতে উৎসাহিত করে। এই পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীর কৌতূহলকে উদ্দীপিত করে, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে উৎসাহিত করে এবং একটি চির-পরিবর্তনশীল বিশ্বে নির্দেশ দান করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের সজ্জিত করে।

   যদিও মন্টেসরি শিক্ষা স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে, এটি ধারাবাহিকভাবে একই স্তরের কাঠামোগত সমস্যা সমাধানের সুযোগ প্রদান নাও করতে পারে, যা প্রকল্প-ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করে। প্রকল্প-ভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের বহুমুখী সমস্যা মোকাবেলায় তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রয়োগ করার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে, যাতে সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তির আরও সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করা যায়।

4. **নমনীয়তা এবং ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষা (Flexibility and Personalized Learning) :** প্রকল্প পদ্ধতির শিক্ষা নমনীয়তা এবং ব্যক্তিগতকৃত শেখার অভিজ্ঞতার জন্য অনুমতি দেয়। শিক্ষার্থীরা তাদের আগ্রহের এবং শক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্পগুলি বেছে নিতে পারে, তাদের শিক্ষার কর্তৃত্ব নিতে সক্ষম হয়। এই স্বায়ত্তশাসন দায়িত্ব এবং অনুপ্রেরণার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, কারণ শিক্ষার্থীরা তাদের প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করে।

মন্টেসরি শিক্ষা ব্যক্তিত্ব এবং স্ব-নির্দেশিত শিক্ষাকেও মূল্য দেয়। এটি পূর্বনিধারিত পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার উপকরণের আশেপাশে পরিকল্পনা করা থাকে, যা শিক্ষার্থীদের আবেগ ও আগ্রহের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগতকৃত প্রকল্পের সুযোগকে সীমিত করে।

12.5.2 কিলপ্যাট্রিকের প্রোজেক্ট মেথড এবং জন ডিউইয়ের সমস্যা সমাধান পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা (Comparative discussion of Kilpatrick's Project Method with John Dewey's Problem solving Method)

কিলপ্যাট্রিকের প্রকল্প পদ্ধতির মূল ধারণা হল শিক্ষার্থীরা যখন বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকল্পে কাজ করে, তখন তারা কীভাবে শেখে তা ব্যাখ্যা করা। বিষয়বস্তুর সাথে পরিবেশে কাজের মাধ্যমে শেখাও জন ডিউই-র সমস্যা সমাধান পদ্ধতির অন্তর্গত। এই দুটি শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে কিছুটা মিল থাকলেও, তাদের মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট পার্থক্যও দেখতে পাওয়া যায়। প্রকল্প পদ্ধতি হলো একটি শিক্ষণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে একটি ধারণা, নীতি বা উদ্ভাবন সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যের ফলাফলকে সুনির্দিষ্ট আকারে উপস্থাপন করতে হয়। সমস্যা সমাধান পদ্ধতি হল একটি শিক্ষণ কৌশল যা তথ্য অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। এই দুটি পদ্ধতির বিশেষ বিশেষ সুবিধাগুলি নীচে উপস্থাপন করা হলো—

কিলপ্যাট্রিকের প্রোজেক্ট মেথডের সুবিধা (Advantages of Kilparick's Project Method)

- প্রকল্প পদ্ধতি উদ্যোগ এবং সৃজনশীলতার মূল্যবোধ স্থাপন করতে সাহায্য করে।
- দলগতভাবে একটি প্রকল্পে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার মনোভাব এবং ভাগাভাগি করে কাজ করার ধারণা সৃষ্টি হয়।
- কোন বিশেষ বিষয়ের ধারণা শেখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা উৎপাদনশীল এবং উদ্যোগী হয়ে ওঠে।
- এই শিক্ষণ পদ্ধতি "করিয়ে শেখার" (Learning by doing) উপর জোর দেয়।
- প্রকল্পের পরিকল্পিত নক্‌শা শিক্ষার্থীদের ব্যবহারযোগ্য উপকরণ নির্বাচনের মৌলিকত্ব সৃষ্টি করে এবং তারা উদ্‌ভাবনী হয়ে ওঠে।
- প্রকল্পের সমাপ্ত ফলাফল বা পণ্য অর্জিত শিখনের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা স্কুলে বা বাড়িতে নতুন প্রকল্প নির্মাণ ও সম্পাদন চালিয়ে যেতে পারে।

ডিউই-র সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Dewye's Problem Solving Method)

- সমস্যা সমাধান পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে দক্ষতা বিকাশে সবচেয়ে কার্যকর।

- একইভাবে এই শিক্ষণ পদ্ধতি অন্যান্য অ-বিজ্ঞান বিষয়গুলিতেও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ভবিষ্যতে অনুসরণ করার জন্য একটি শক্তিশালী প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।
- সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে উচ্চ স্তরের চিন্তার দক্ষতার বিকাশ ঘটায়।
- দায়িত্ব, মৌলিকতা এবং সম্পদের ব্যবহারের একটি প্রখর সামাঞ্জস্য বোধ তৈরী হয়, যা স্বাধীন অধ্যয়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

12.6 সারাংশ (Summary)

উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর একজন আমেরিকান শিক্ষাবিদ, যিনি জন ডিউই-র উত্তরসূরী ছিলেন। তিনি 1871 খ্রিস্টাব্দের 20 নভেম্বর আমেরিকার জর্জিয়ার White Plains-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি Project Method এর উদ্ভাবক এবং 1918 খ্রিস্টাব্দে এই বিষয়ের উপর তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য তিনি বিশ্বখ্যাত হন। 1908 খ্রিস্টাব্দে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কলেজে তিনি জন ডিউই-র অধীনে শিক্ষাতত্ত্বের উপর ডকটরাল গবেষণা শুরু করেন এবং জন ডিউই তাঁকে তাঁর সর্বকালের সেরা ছাত্র হিসেবে অভিহিত করেন। কিলপ্যাট্রিক তাঁর Project Method প্রবন্ধে জন ডিউই-র সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বাস্তবায়নের জন্য একটি ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত 'প্রকল্প পদ্ধতি' সে সময় প্রগতিশীল শিক্ষাবিদগণের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল, যা অনেকটা শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতির সাথে সাদৃশমুক্ত ছিল। তিনি টিচার্স কলেজে 1912 থেকে 1937 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষার দর্শনের একজন পূর্ণসময়ের অধ্যাপক হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কিলপ্যাট্রিকের পদ্ধতির মূল ধারণা হলো, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমাধানের জন্য প্রকল্পে কাজ করার সময় শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে তা অনুধাবন করা। কিলপ্যাট্রিকের মতে স্কুল শুধুমাত্র বুদ্ধিভিত্তিক উদ্দেশ্যই পূরণ করে তা নয়, বরং ইহা সামাজিক উদ্দেশ্যও পূরণ করে এবং তা প্রকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের মাধ্যমে সম্ভব। প্রকল্প পদ্ধতিতে শিখন প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘটে। ইহা একটি অনুসন্ধানমূলক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানকে উৎসাহিত করে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণার মনোভাবকে উৎসাহিত করে।

কিলপ্যাট্রিকের মতানুসারে প্রকল্প চার প্রকার—গঠনমূলক প্রকল্প, নান্দনিক প্রকল্প, সমস্যাযুক্ত প্রকল্প এবং ড্রিল প্রকল্প। প্রকল্প পদ্ধতির ধাপগুলি হলো—একটি পরিস্থিতি তৈরী করা, বাছাই করা ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করা, পরিকল্পনা, সম্পাদনা, মূল্যায়ণ এবং রিপোর্টিং। কিলপ্যাট্রিকের প্রোজেক্ট মেথড এবং মন্টেসরি

শিক্ষা উভয়ই সক্রিয়তা ও হাতে-কলমে শিক্ষার উপর জোর দেয়, যদিও এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও রয়েছে। প্রোজেক্ট মেথড এবং জন ডিউই-র সমস্যা সমাধান পদ্ধতির মধ্যেও কিছু সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য বিদ্যমান।

12.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিকের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে লিখুন।
2. কিলপ্যাট্রিকের চাকুরী জীবন সম্পর্কে পরিচয় দিন।
3. কিলপ্যাট্রিকের শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
4. প্রোজেক্ট মেথডের বৈশিষ্ট্য, প্রকল্পের প্রকারভেদ এবং প্রোজেক্ট মেথডের ধাপসমূহ বর্ণনা করুন।
5. কিলপ্যাট্রিকের প্রোজেক্ট মেথড এবং মন্টেসরি শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা করুন।
6. কিলপ্যাট্রিকের প্রোজেক্ট মেথড এবং জন ডিউই-র সমস্যা সমাধান পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

12.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- William Heard Kilpatrick, Wikiwand.https://www.wikiwand.com, Retrieved on 18.06.2024
- William Heard Kilpatrick, Wikipedia.https://en.m.wikipedia.org, Retrieved on 18.06.2024
- Beyer, L. E. (1997), William Heard Kilpatrick, Vidyaonline.https://vidyaonline.org, Retrieved on 19.06.2024
- Project Method, https://en.m.wikipedia.org, Retrieved on 19.06.2024
- Why Project-Based Learning is a More Effective Approach than Montessori, https://amped.education. Retrieved on 20.06.2024
- York, John and Heard. William H. Kilpatrick (1871–1965)-Education. https://education. stateuniversity.com. Retrieved on 21.06.2024
- David, Anavira (2014), Problem Solving and Project Method, Prezi. https://prezi.com. Retrieved on 21.06.2024
- Sutinen, Ari (2013). Two Project Methods : “Priliminary Observation on

the Similarities and differences between William Heard Kilpatrick's Project Method and John Dewey's Problem-Solving Method". Educational Philosophy and Theory. ERIC-EJ1021358, https://eric.ed.gov, Retrieved on 22.06.2024

- Kilpatrick–The Project Method (1918) Education in the UK. https://www.education-uk.org, Retrieved on 22.06.2024
- Guttay, Cyryhl (2021), William Kilpatrick, SCRIBD, https://scribd.com, Retrieved on 23.06.2024
- William Kilpatrick : The Project Method, https://educationalresearchtechniques.com, Retrieved on 23.06.2024
- The Project Method in Practice, Schools : Vol 17, No.1, https://www. journal.uchicago.edn. Retrieved on 23.06.2024
- Thayer-Bacon, Barbara (2012). Maria Montessori, John Dewey and William H. Kilpatrick, https://does.lib.purdue,edn, Retrieved on 23.06.2024

Module – 5

Radical Thinkers

একক 13 ❑ পাওলো ফ্রেইরে (Paulo Freire)

গঠন

13.1 উদ্দেশ্য **(Objectives)**

13.2 ভূমিকা **(Introduction)**

13.3 পাওলো ফ্রেইরের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবন **(Family Life, Education & Service Life of Paulo Freire)**

13.3.1 পাওলো ফ্রেইরের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা **(Family Life and Education of Paulo Freire)**

13.3.2 পাওলো ফ্রেইরের কর্মজীবন **(Service Life of Paulo Freire)**

13.4 ফ্রেইরের মতানুসারে শিক্ষার সংজ্ঞা, লক্ষ্য, শিক্ষক এবং ব্যাংকিং শিক্ষা **(Definition & Aims of Education, Teacher and Banking Education according to Freire)**

13.4.1 ফ্রেইরের মতানুসারে শিক্ষার সংজ্ঞা, লক্ষ্য এবং শিক্ষক **(Definition & Aims of Education and Teacher according to Freire)**

13.4.2 ব্যাংকিং শিক্ষা **(Banking Education)**

13.5 পাওলো ফ্রেইরের শোষিতের শিক্ষাতত্ত্ব, বিবেকীকরণ এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা **(Pedagogy of the Oppressed, Conscientization and Different Education System of Paulo Freire)**

13.5.1 পাওলো ফ্রেইরের শোষিতের শিক্ষাতত্ত্ব **(Paulo Freire's Pedagogy of the Oppressed)**

13.5.2 ফ্রেইরের মতে বিবেকীকরণ **(Conscientization as per Freire)**

13.5.3 ফ্রেইরের মতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা **(Different Education System as per Freire)**

13.6 সারাংশ **(Summary)**

13.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

13.8 গ্রন্থপুঞ্জ **(Bibliography)**

13.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- পাওলো ফ্রেইরের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ফ্রেইরের মতে শিক্ষার সংজ্ঞা, লক্ষ্য এবং শিক্ষক সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ব্যাংকিং শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পাওলো ফ্রেইরের মতে শোষিতর শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পাওলো ফ্রেইরের মতে বিবেকীকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পাওলা ফ্রেইরের মতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

13.2 ভূমিকা (Introduction)

পাওলো রেগ্লাস নেভেস ফ্রেইরে (19 সেপ্টেম্বর 1921–2 মে 1997) ছিলেন একজন মার্কসবাদী ব্রাজিলীয় শিক্ষাবিদ এবং দার্শনিক যিনি সমালোচনামূলক শিক্ষাবিজ্ঞানের (Critical Pedagogy) একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর বিখ্যাত কাজ 'Pedagogy of the Oppressed' সমালোচনামূলক শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তিমূলক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি বয়স্ক শিক্ষা এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণে সক্রিয় হন এবং রেসিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ বিভাগের প্রথম পরিচালক হিসেবে কাজ করেন (1961–1964)। ফ্রেইরে উত্তর-পূর্ব ব্রাজিলে স্বাক্ষরতা প্রশিক্ষণে তাঁর প্রচেষ্টার জন্য দ্রুত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন।

1969 খ্রিস্টাব্দে ফ্রেইরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভিজিটিং স্কলার ছিলেন এবং পরে জেনেভায় চলে যান। পরবর্তীতে তিনি বিশ্ব কংগ্রেসের বিশেষ শিক্ষা উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেন। 1979 খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রাজিলে ফিরে আসেন। 1988 খ্রিস্টাব্দে তিনি শিক্ষামন্ত্রী হন। ফ্রেইরের লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো—Pedogogy of the Oppressed, A Pedogogy of Liberation, Pedagogy of the Freedom, Critical Literacy, Pedagogy in Process ইত্যাদি।

13.3 পাওলো ফ্রেইরের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবন (Family Life, Education and Service Life of Paulo Freire)

13.3.1 পাওলো ফ্রেইরের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা (Family Life and Education of Paulo Freire)

পাওলো ফ্রেইরে 1921 খ্রিস্টাব্দের 19 সেপ্টেম্বর উত্তর-পূর্ব ব্রাজিলীয় রাজ্য পার্নামবুকোর রাজধানী রেসিফেতে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন জোয়াকিম ফ্রেইরে এবং মাতা ছিলেন এডেলট্রুড্স নেভেস। 1934 খ্রিস্টাব্দের 31 অক্টোবর তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পাওলো ফ্রেইরে 1944 খ্রিস্টাব্দের 20 এপ্রিল সহকর্মী শিক্ষয়িত্রী এলজা মারিয়া কোস্টা অলিভেইরাকে বিয়ে করেন। তাঁদের পাঁচটি সন্তান ছিল—লুটগার্ডিস কসটা, মারিয়া ম্যাডলেনা, জোয়াকুইম কসটা, মারিয়া দ্য ফাতিমা এবং মারিয়া ক্রিস্টিনা। এদের মধ্যে তিনজন ছিলেন শিক্ষাবিদ। 1986 খ্রিস্টাব্দে এলজার মৃত্যু হয়। 1988 খ্রিস্টাব্দে পাওলো ফ্রেইরে পুনরায় আনা মারিয়া আরাউজোকে বিয়ে করেন। 1997 খ্রিস্টাব্দের 2 মে 75 বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

ছোটবেলা থেকেই পাওলো ফ্রেইরে দারিদ্র্যের মধ্যেই বড় হয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোরকালে তিনি দরিদ্র শিশুদের সাথে খেলার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। এই অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর বিশেষ শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সাহায্য করেছে। ফ্রেইরে বলেছিলেন যে দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা তাঁর শেখার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেছিলেন, "আমার শিক্ষার অভিজ্ঞতা আমাকে সামাজিক শ্রেণী ও জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়েছে"।

1930 খ্রিস্টাব্দে বিশ্বজুড়ে যে গ্রেট ডিপ্রেশন বা মহামন্দা হয়, তার কারণে ছোটবেলা থেকেই পাওলো ফ্রেইরে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার সাথে মানুষের লড়াই দেখেছেন। অভাব ছিল তাঁর পরিবারের নিত্যসঙ্গী। অভাবের জন্য 1931 খ্রিস্টাব্দে তাঁরা রেসিফের পশ্চিমে অবস্থিত স্বল্প ব্যায়ের শহর 'জবাত পাওডো ডস গুয়ারারপেসে" চলে যান। 1934 খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তাঁরা আরও সমস্যায় পড়েন এবং তাঁর পড়াশুনার অনেক ক্ষতি হয়। সেখানকার আর দশটা কিশোরের মত তিনি তাঁর বস্তির বন্ধুদের সাথে গলিতে গলিতে ফুটবল খেলে বেড়াতেন। তাঁর সামাজিক জীবনের অনেকটা জুড়েই ছিল বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলার সময়টা। পরবর্তী জীবনে তিনি স্বীকার করেন—"ক্ষুদার কারণে কোনো পড়াশুনাই আমার মাথায় ঢুকতো না। এমন না আমি বোকা ছিলাম, অথবা আমার আগ্রহের কোনো অভাব ছিল না। আমার সামাজিক অবস্থা আমাকে শিক্ষা নিতে দেয়নি।"

1943 খ্রিস্টাব্দে পাওলো ফ্রেইরে রেসিফে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল স্কুলে পড়ার সুযোগ পান। সেখানে তিনি দর্শন এবং মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেন।

13.3.2 পাওলো ফ্রেইরের কর্মজীবন (Service Life of Paulo Freire)

1946 খ্রিস্টাব্দে পাওলো ফ্রেইরে পার্নাম্বুকো (Pernambuco) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত হন। প্রাথমিকভাবে নিরক্ষর দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করে, ফ্রেইরে একটি শিক্ষাগত Praxis তৈরি করতে শুরু করেন যা মুক্তির ধর্মতত্ত্ব আন্দোলনের উপর প্রভাব ফেলেছিল। 1961 খ্রিস্টাব্দে তিনি রেসিফে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত হন। 1962 খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর তত্ত্বগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছিলেন, যখন 300 জন আখ আহরণকারীদের মাত্র 45 দিনের মধ্যে পড়তে ও লিখতে শেখানো হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্রাজিল সরকার দেশে হাজার হাজার সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরী করার জন্য অনুমোদন দিয়েছিল। 1964 খ্রিস্টাব্দের ব্রাজিলিয়ান অভ্যুত্থান ফ্রেইরের স্বাক্ষরতা অভিযান বন্ধ করে দেয় কারণ ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা এটিকে সমর্থন করেনি। ফ্রেইরে 70 দিনের জন্য বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বন্দী ছিলেন। বলিভিয়ায় সংক্ষিপ্ত নির্বাসনের পর ফ্রেইরে খ্রিস্টান গণতান্ত্রিক কৃষি সংস্কার আন্দোলন এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার জন্য পাঁচ বছর চিলিতে কাজ করেন। এই সময়ের মধ্যে 1967 খ্রিস্টাব্দে ফ্রেইরে তাঁর প্রথম বই "Education as the Practice of Freedom" প্রকাশ করেন। এটাকে অনুসরণ করে তাঁর বিখ্যাত রচনা "Pedagogy of the Oppressed" প্রকাশিত হয়েছিল 1968 খ্রিস্টাব্দে।

তাঁর কাজের ইতিবাচক আন্তর্জাতিক গ্রহণ যোগ্যতার পর ফ্রেইরেকে 1969 খ্রিস্টাব্দে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসরশিপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। পরের বছর Pedagogy of the Oppressed স্প্যানিশ এবং ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল, যা ব্যাপকভাবে এর পরিধিকে প্রসারিত করেছিল। এরপর ক্যাম্ব্রিজ ও ম্যাসাসুটেস-এ এক বছর কাজ করার পর ফ্রেইরে World Council of Church-এর বিশেষ শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার জন্য জেনেভায় চলে যান। এই সময়ের মধ্যে ফ্রেইরে আফ্রিকায় বিভিন্ন পর্তুগাল উপনিবেশে শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এক দশকেরও বেশী সময় পর তিনি 1979 খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিলে ফিরে যান। 1980 থেকে 1986 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রেইরে সাও পাওলোতে ওয়ার্কার্স পার্টির বয়স্ক সাক্ষরতা প্রকল্পের সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেন। ওয়ার্কার্স পার্টি 1988 খ্রিস্টাব্দে সাও পাওলার মেয়র নির্বাচনে জয় লাভ করলে ফ্রেইরে শিক্ষার পৌর সচিব নিযুক্ত হন। ফ্রেইরেকে ব্যাপকভাবে সমালোচনামূলক শিক্ষাতত্ত্বের পিতামহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

13.4 ফ্রেইরের মতানুসারে শিক্ষার সংজ্ঞা, লক্ষ্য, শিক্ষক এবং ব্যাংকিং শিক্ষা (Definition & Aims of Education, Teacher and Banking Education according to Freire)

13.4.1 ফ্রেইরের মতানুসারে শিক্ষার সংজ্ঞা ও লক্ষ্য এবং শিক্ষক (Definition & Aims of Education and Teacher according to Friere)

ফ্রেইরের মতে শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Education according to Friere) : ফ্রেইরের মতে, "A humanizing education is the path through which men and women can become conscious about their presence in the world." অর্থাৎ "মানবমুখী শিক্ষা হল এমন একটি পথ যার দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সচেতন হয়।"

ফ্রেইরের মতে শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education according to Friere) : ফ্রেইরের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হল নিপীড়িতদের মধ্যে নীরবতার সংস্কৃতি ভেঙে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে বিবেক জাগ্রত করা। তারা সম্পূর্ণ মানুষ। ফ্রেইরে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত, সঠিক উপায়ে কথা বলার, চিন্তা করার এবং কাজ করার স্বাধীনতা। তাঁর শিক্ষাগত চিন্তা ছিল বাস্তবতার একটি দ্বান্দ্বিক উপলব্ধি বিকাশের উপর ভিত্তি করে। তাঁর মতবাদ ব্যাখ্যা করে যে, কিভাবে মানুষের সাথে থাকা যায়, যাতে তাদের চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ ঘটতে পারে। ফ্রেইরের মতে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি হল—

- শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বকে, বিশেষ করে নিপীড়িত মানুষের বিশ্বকে পরিবর্তন করা।
- মানুষের মধ্যে ক্ষমতার সচেতনতা (Power Awakness) গড়ে তোলা।
- শিক্ষা মানুষকে এবং তাদের চারপাশের বিশ্বকে বুঝতে সাহয্য করবে।
- শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জন করা।
- শিক্ষার মাধ্যমে সমালোচনামূলক স্বাক্ষরতার (Critical Literacy) বিকাশ ঘটানো।
- শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিকীকরণ করা।
- সংলাপ তৈরী করতে শেখানো।
- ব্যক্তিকে মানবিক হতে শেখানো।
- সমালোচনামূলক মূল্যায়ণ (Critical Evaluation) করতে শেখানো।

ফ্রেইরের মতানুযায়ী শিক্ষক (Teacher according to Freire) : ফ্রেইরের মতানুযায়ী শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্নের উদ্রেক করাবেন। সমস্যাকে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যাতে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করে। চিরাচরিত পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চালনে সাহায্য করতেন। ফলে শিক্ষক হতেন সক্রিয় কিন্তু শিক্ষার্থী থাকত নিষ্ক্রিয়। কিন্তু ফ্রেইরের মতে শিক্ষক হবেন তুলনামূলকভাবে কম সক্রিয়। তিনি সমস্যাগুলি এমনভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে পেশ করবেন যাতে তারা এর সমাধান নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকে। সেইসঙ্গো শিক্ষক খেয়াল রাখবেন সমস্যাগুলি যেন অবশ্যই জাগতিক হয় এবং শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গো সম্পর্কিত হয়।

13.4.2 ফ্রেইরের মতবাদ অনুযায়ী ব্যাংকিং শিক্ষা (Banking Education according to Freire)

ব্যাংকিং শিক্ষা (Banking Education) : ডিউই-এর মতো ফ্রেইরেও শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্কের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। ফ্রেইরে অভিযোগ করেছেন, শিখন বর্ণনা করার দুর্বলতাতে (Narration Sickness) ভোগে। গবেষণাতে দেখা গেছে এই দুর্বলতাতে প্রশিক্ষণ সমগ্র সময়ের মোটামুটি শতকরা 75 অংশ একচেটিয়া অধিকার করে। ফ্রেইরে বলেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে স্থির ও অপরিবর্তনীয় রেখে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা হতে পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়। যেহেতু শিক্ষাবিদের কাজকে দেখা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শূন্যস্থানকে তথ্য ও বিশ্বাস (Belief) দিয়ে পূর্ণ করা, তাই এটি ঘটে থাকে। এই সমস্ত জমা সম্পর্ক (Deposits) শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করে, ভর্তি করে ও জমা করে। ফ্রেইরে এই শিক্ষাকে ব্যাংকিং শিক্ষা (Banking Education) নাম দিয়েছেন।

এই সমস্ত জমা তথ্য সম্পদ দুর্ভাগাদের কাছে উপহার (Gift) হিসাবে প্রতিভাত হয়। ব্যাংকিং শিক্ষা প্রয়োগ করা হয়, যখন প্রশিক্ষক—

(a) বেশিরভাগ সময় কথা বলে চলেন ও শিক্ষার্থীরা তা শুনে যায়;

(b) তিনি তাঁর পছন্দকে নিজে নির্বাচন করেন ও বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকরী করেন, এবং

(c) তাঁর প্রিয় বিষয়কে ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেন। ফ্রেইরে আরও সাতটি পদ তালিকাভুক্ত করেছেন। এই ধরনের অনমনীয় দৃঢ় প্রশিক্ষণমূলক নির্দেশদান শিক্ষার্থীদের সৃজনী ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা খর্ব করে, এবং জগৎকে নিজ দৃষ্টি দিয়ে দেখাতে বাধা দেয়। সবচেয়ে খারাপ দিক হল এর ফলে শিক্ষার্থীরা বিবেকীকরণ (Concientization) প্রক্রিয়া হতে বঞ্চিত হয়।

ব্যাঙ্কিং শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ—

(i) শিক্ষক শিক্ষাদান করেন এবং শিক্ষার্থী তা গ্রহণ করে।

(ii) শিক্ষক সব কিছু জানেন এবং শিক্ষার্থী কিছু জানে না।

(iii) শিক্ষক চিন্তাভাবনা করেন শিক্ষার্থীরা তা করে না।

(iv) শিক্ষক কথা বলেন, শিক্ষার্থী তা শোনে।

(v) শিক্ষক শৃঙ্খলার কথা বলেন শিক্ষার্থী শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়।

(vi) শিক্ষক পছন্দ করেন এবং শিক্ষার্থীদের তাঁর পছন্দ মেনে নিতে বাধ্য করেন।

(vii) শিক্ষক কাজ করেন এবং শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করে।

(viii) শিক্ষক পরিকল্পনা নির্বাচন করেন শিক্ষার্থী সেই অনুযায়ী কাজ করে।

(ix) শিক্ষক তাঁর পেশাগত কর্তৃত্বের জোরে জ্ঞানের কর্তৃত্বকে শুনিয়ে দেবার চেষ্টা করেন এবং শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা কেড়ে নেবার চেষ্টা করেন।

(x) শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষক হলেন কর্তা (Subject) যেখানে শিক্ষার্থী হল শুধুমাত্র কর্ম (Object)।

13.5 পাওলো ফ্রেইরের শোষিতের শিক্ষাতত্ত্ব, বিবেকীকরণ এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা (Pedagogy of the Oppressed, Conscientization and Different Education System of Paulo Freire)

13.5.1 পাওলো ফ্রেইরের শোষিতের শিক্ষাতত্ত্ব (Paulo Freire's Pedagogy of the Oppressed)

শোষিতের শিক্ষাতত্ত্ব (Pedagogy of the Oppressed) : পাওলা ফ্রেইরের শোষিতের শিক্ষাতত্ত্বের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ :

জনগণের প্রতি বিশ্বাস : মানুষের প্রতি বিশ্বাস এবং মানুষকে কীভাবে মর্যাদা দেওয়া যায় এটাই ছিল তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মূল বক্তব্য। সনাতনী ভাবনা থেকে দেখা যায়, অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষকে আমরা ছোটো করে দেখি। অর্থাৎ তারা সমমানের নয় বলে মনে করা হয়। বাস্তব অবস্থায় দাঁড়িয়ে বুঝতে হবে মানুষের অসুবিধা কোথায়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, প্রচলিত শিক্ষা মানুষের জীবনাচরণকে স্থিতাবস্থায় রেখে দেয়। মানুষকে ক্ষমতা পেতে হলে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সমাজে প্রভাবক শ্রেণির মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সাধারণত অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণির মানুষকে প্রভাবিত করে। পাওলো ফ্রেইরে সমাজের এই হত দরিদ্র মানুষজনকে বর্ণনা ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সমাজে এই পিছিয়ে পড়া মানুষজনদের প্রভাবক সম্প্রদায় দমন করে রাখতে চায় এবং চালু শিক্ষা ব্যবস্থাকেও এমন করে রাখা হয়েছে যাতে উঁচু তলার মানুষ নীচুতলার মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারে। সমাজের এই শোষিত শ্রেণি একটি সংস্কৃতির মধ্যে থাকে। এই সংস্কৃতিকে ফ্রেইরে নীরবতার সংস্কৃতি (Cultural of Silence) বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রাজিলে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটানোর ফলে ফ্রেইরে

সেখানকার লোকদের নীরবতাকে নাম দিয়েছিলেন 'শোষিতদের নীরবতার সংস্কৃতি'। হতভাগ্য জনগণের তৎকালীন অজ্ঞতা ও কর্মবিমুখতা সৃষ্টি হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য এবং প্রভুত্ববাদের সামগ্রিক পরিস্থিতির চাপে। জনগণ এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছে মাত্র। এঁরা তাঁদের চতুর্দিকের কঠোর বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে, তার প্রতি সংবেদনশীল হতে এবং সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথভাবে সামর্থ্যবান হয়ে উঠতে অপারগ। কারণ তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন যে তাদের সম্যক সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা আদৌ নেই, অর্থাৎ একেবারে গভীরভাবে সুপ্ত। ফ্রেইরে স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন, সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাটা হল নীরবতার সংস্কৃতি বজায় রাখার অন্যতম হাতিয়ার। কার্নয় (Carnoy) শিক্ষাকে সংস্কৃতির সাম্রাজ্যবাদ (Education as Cultural Imperialism) রূপে বর্ণনা করেছেন।

সংলাপ (Dialogue) : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পাওলো ফ্রেইরে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষজনের সংস্কৃতিকে নীরবতার সংস্কৃতি (Culture of Silence) বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন মানুষকে প্রতিবাদ করতে শেখাতে হবে। তবেই এই শোষিত শ্রেণি বুঝতে পারবে যে, তারা সমাজের কোন অবস্থায় রয়েছে, তাদের সঠিক অবস্থান ঠিক কোথায়? শিক্ষার্থীরা নিজেরা যা বুঝেছে সেটি বলবে। প্রকৃত শিক্ষা নীরবতার সংস্কৃতির মাধ্যমে সম্ভব নয়। 'শব্দ' হল এক ধরনের প্রতিবাদ। নিজের উপলব্ধিকে প্রকাশ করাতে শেখানোই হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। তাই তিনি কথোপকথন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক্ষেত্রে একজন অপরজনকে চাপ দেবে না এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে। কথাবার্তার অর্থ হচ্ছে সহমর্মিতা ও সহযোগিতা, তার মধ্যে অবশ্যই ফল্গু ধারার মতো শ্রদ্ধা থাকবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা সমষ্টিগত মনোভাব এবং মানবতার বিকাশ ঘটে। মানুষ শব্দ ও কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করবে। নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করবে। শিক্ষা এজন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেবে। ফ্রেইরের এই চিন্তাধারাকে বলা হয় স্বর সংস্কৃতি (Culture of Voice)। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও মর্যাদা অবশ্য থাকবে। তা না হলে শিক্ষাব্যবস্থা সর্বাঙ্গীণ হতে পারে না। শিক্ষার্থীরা বিদ্যার্জনের জন্য সাধনা করবে, তবে স্বর সংস্কৃতিকে উন্নত করা যাবে। এই সংলাপ প্রক্রিয়ায় তিনটি মূল কথা আছে। এগুলি হল—

(i) চিন্তার অনুসন্ধান,

(ii) ধারণার বিষয়ীকরণ (Thematization) এবং

(iii) সমস্যায়ন (Problematization)।

প্রথম শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের বিষয়ের উপর চিন্তাভাবনা শুরু হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি একটা ধারণা জন্মাবে এবং সবশেষে তারা বিষয়কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রশ্ন করবে।

13.5.2 ফ্রেইরের মতে বিবেকীকরণ (Conscientization according to Freire)

বিবেকীকরণ (Conscientization) : বিবেকীকরণ এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানুষ গ্রহিতা না হয়ে, জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়ী হিসাবে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এই উভয় বাস্তবতা সম্পর্কে এক গভীর সচেতনতায় পৌঁছায়। এই সচেতনতা বাস্তবকে পরিবর্তন করতে তাঁদের জীবন ও ক্ষমতাকে গঠন করে। তাই বিবেকীকরণ হবে বাস্তবতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং এই বাস্তবতা অবশ্যই রাজনৈতিক সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষক ও জনগণ একত্রে মিথষ্ক্রিয়াশীল হয়ে পরস্পরকে বিবেকসম্পন্ন করে তোলে। এই আন্দোলন অতীত ক্রিয়ার উপর পরবর্তী ক্রিয়া চলমান সংগ্রামের সঙ্গো দ্বান্দ্বিকভাবে একসূত্রে গ্রথিত করে। ক্রিয়াশীল প্রতিবর্ত ক্রিয়াও। বিবেকীকরণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে, সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। তাই মানুষের চেতনা বা বোধ জাগ্রত হলেও বিবেকীকরণ ক্রিয়াকে বর্শামুখ করে অগ্রসর হতে চালিত করে। তাই উৎপীড়িত শ্রেণির প্রয়োজন অনুযায়ী জ্ঞানতত্ত্ব নির্মাণ করতে হবে। মুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জ্ঞান বা শিক্ষা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এটি হল জীবনের একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যাকে বাস্তবের উপর ক্রিয়া করতে করতে অবিরাম নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করতে হবে।

সচেতনতা (Awareness) এবং বাস্তবায়ন (Realization) এই পদ দুটি ফ্রেইরের ব্যবহৃত পদ। এর অর্থ হল জগতের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বৈপরীত্য বাস্তবায়িত করা এবং তার ফলে ব্যক্তিগতভাবে বা অন্তরঙ্গ দলের সঙ্গো জগৎ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করতে অগ্রণী হওয়া। এর সঙ্গো জড়িত থাকে ব্যক্তির বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতনতা, উদ্দেশ্যাবলি এবং কাম্য পরিবর্তন নিয়ে আসার সম্ভাবনা উপলব্ধি করা। ফ্রেইরের অভিমত অনুযায়ী বিবেকীকরণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া এবং একটি মনোভাব যা ব্যক্তির অন্তরে স্বাধীনতা এবং আত্ম-দায়িত্বের বিকাশে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়া ও প্রাসঙ্গিক সহায়ক উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদা ও আত্ম-আস্থার দমনমূলক শর্তাবলিকে উন্মোচন (Unveil) করতে সহায়ক করে। ফ্রেইরে সতর্কতার সঙ্গো 'Unveil' এই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। সংক্ষেপে ফ্রেইরের মতে বিবেকীকরণ জনসাধারণকে নিজ নিজ সত্ত্বা ও তাদের কর্মপ্রচেষ্টার সম্ভাবনাকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। ফলে তারা তাদের সমাজের দুর্বলতা ও কুসংস্কারগুলি দূর করতে নিজেরা অগ্রণী হয়ে ক্রিয়া শুরু করে।

যদি শিক্ষাবিদরা চান যে শিক্ষর্থীরা নিজেদের ব্যাপার ও পরিবেশ নিয়ে চিন্তাশীল ও অনুসন্ধানকারী হয়ে উঠুক, তাহলে প্রশিক্ষণমূলক পদ্ধতি ও শিখনপ্রক্রিয়াতে শিক্ষার্থীরা সহ-অংশীদার হয়ে ওঠে। ফ্রেইরে দাবি করেছেন, সনাতন শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা স্কুলকরণ (Schooling) প্রক্রিয়াতে প্রক্রিয়াকরণের ফলে বর্তমান জগতে পরিকাঠামো অনুযায়ী নিজেকে অনুবর্তন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত করে নেয়। তাদের প্রশ্ন করার ক্ষমতা ও পরিবর্তনকামী চিন্তা লোপ পেয়ে যায়। অপরদিকে, বিবেকীকরণ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত ও বাধ্য করে তাদের নিজ সত্ত্বাকে, পরিস্থিতি ও পরিবেশকে পরীক্ষা করতে ও অনুসন্ধান করতে। অতএব তারা নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করে পরিস্থিতি পরিবর্তন করার কাজে অগ্রণী

হওয়া এবং তা কেবলমাত্র নিজের স্বার্থে নয়, অন্যদের জন্যও। দ্বিমুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়াতে তথ্য এবং ভাবরাশি পারস্পরিক বিনিময় করতে হবে অন্তরঙ্গা বন্ধুদল ও প্রশিক্ষকের সঙ্গো, তবে মুক্তি প্রদায়িনী শিক্ষা ঘটবে। ফ্রেইরে বলেছেন এই ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়া, দীর্ঘস্থায়ী, মানবিককারী ব্যবহারযোগ্য শিখন নিয়ে আসবে। এই ধরনর যোগাযোগ বিবেকীকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত করে।

13.5.3 পাওলো ফ্রেইরের মতে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা (Different Education System according to Paulo Freire)

সমস্যা উত্থাপক শিক্ষা (Problem Posing Education) : প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক জ্ঞান দান বা জ্ঞান বিতরণ করে যান, অর্থাৎ তিনি যেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। ফ্রেইরে সনাতন শিক্ষা প্রক্রিয়াকে "ব্যাংক পদ্ধতি"-র সঙ্গো তুলনা করেছেন। এই ব্যবস্থায় শিক্ষক একজন প্রবক্তা। আর শিক্ষার্থীরা নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করে। একজন হলেন দাতা ও অন্যজন গ্রহিতা। এক্ষেত্রে শিক্ষা একমুখী প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। ফ্রেইরের মতে এইভাবে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভ করতে পারে না। শিক্ষক যা বলবেন শিক্ষার্থীদের সেটিকে প্রশ্ন করে বুঝতে হবে। সনাতনী শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা অল্প শিখি, অধিকাংশ বিষয় না বুঝে শুধুমাত্র মনে রাখি। তবে শিক্ষার্থীরা যে প্রশ্ন করে করে শিক্ষা গ্রহণ করবে তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ রচনা। এই পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে প্রশ্নগুলি তৈরি হবে এবং তারা জ্ঞানের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে। জ্ঞানের বিষয়কে তারা যাচাই করে নেবে। অর্থাৎ শোষিত শ্রেণির মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। একটি শোষিত সচেতনতার পর্যায় থেকে সরল সচেতনতার (Simple Awareness) পর্যায়ে এবং সবশেষে বিশ্লেষণী (Analytic) সচেতনতার পর্যায়ে উত্তরণ ঘটবে। এই পর্যায়গুলি অতিক্রম করে শোষিত শ্রেণি প্রশ্ন করতে পারবে। ফ্রেইরে চেয়েছেন যাতে জনসাধারণের চেতনার বিকাশ ঘটে।

অনুশীলনধর্মী শিক্ষা : একাধিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সমন্বিত প্রক্রিয়াকে ফ্রেইরে অনুশীলন বলে চিহ্নিত করেছেন। বারবার অনুশীলন করতে করতে কোনো বিষয়কে জানতে হবে। প্রত্যেকটি ঘটনা ও জ্ঞানের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। অর্জিত শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলে আমরা ভালো করে শিখতে পারব। সুতরাং বারবার চিন্তাভাবনা করা, প্রশ্ন করা অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের কোনো বিষয়কে ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পারব।

অনিরপেক্ষ শিক্ষা : পাওলো ফ্রেইরের মতে সনাতনী ব্যবস্থায় শিক্ষা সবসময় অল্প সংখ্যক মানুষের কথা বলে, সমাজের দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের কথা বলে না। খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও তার মধ্যে রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি (Political Strategy) আছে। নিরপেক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি বলে আসলে কিছু নেই। শিক্ষা হয় যুব প্রজন্মকে বর্তমান ব্যবস্থার যুক্তির সঙ্গো একীভূত করে এবং এর প্রতি তাঁদের আনুগত্য আদায় করে অথবা পরিণত হয় মুক্তির প্রয়াসে। এই মুক্তির প্রয়াসে জনগণ সূক্ষ্ম ও সৃজনশীলভাবে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে কীভাবে বিশ্বকে পরিবর্তন করতে কাজ করবেন, তা আবিষ্কার করে। তিনি বললেন এই

ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে আসতে হলে নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। তাদের চাহিদা পূরণের সুযোগ করে দিতে হবে। মানুষ যেমন পশু-পাখিকে পোষ মানানোর জন্য নানারকমের কৌশল অবলম্বন করে, প্রচলিত ব্যবস্থায় শিক্ষাও তেমনি পোষ মানানোর এক নতুন কৌশল, যদি তা সমাজের নিপীড়িত সর্বসাধারণের শিখন চাহিদা অনুসারে রূপায়িত না হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োগ : শিক্ষা মানুষকে স্বসংস্কৃতির রূপকার হিসেবে গড়ে তোলে। ফ্রেইরে শিক্ষাকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। মানবসম্পদ উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার কাঠামোকে উন্নত করতে হবে। তিনি অন্তরে বুঝতে পেরেছিলেন যে জনগণের নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে একমাত্র শিক্ষাই দরিদ্র ও নিপীড়িত জনসাধারণকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের মূলধারায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। পাওলো ফ্রেইরে সমাজের শোষিত শ্রেণির মানুষদের অবস্থার জন্য সভ্যতা ও সমাজ কাঠামোকে দায়ী করেছেন। মানুষের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে পারলে তবেই সমাজে পরিবর্তন আনা সম্ভব।

সাংস্কৃতিক তৎপরতা : শিক্ষা হল একটি সাংস্কৃতিক তৎপরতা। ফ্রেইরের মতে শিক্ষা কেবলমাত্র মানুষকে লিখতে ও পড়তে শেখায় না। বরং শিক্ষার সাহায্যে নতুন এক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। ইতিহাসে কেবলমাত্র সমাজের নিপীড়িত জনগণের সংগ্রামের কথা লেখা থাকবে। মানুষ এই পৃথিবীতে একা বাঁচতে পারে না। পরিবর্তনের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই চেষ্টা করতে হবে। তিনি চিন থেকে এই ধারণা নিয়েছিলেন। ষাটের দশকে চিনে মাও-জে-দং-এর নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক বিপ্লব (Cultural Revolution) ঘটেছিল। বহুমুখী বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি অংশ এবং সামাজিক বিপ্লবের পরে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এরই ভূমিকা হল প্রক্রিয়া। বিপ্লব সাধিত হয় নেতা ও সাধারণ মানুষ এই দুই পক্ষের অবিচ্ছেদ্য সংহতির ভিত্তিতে একসাথে চলার মধ্য দিয়ে। নেতৃত্ব—যখন তাদের বিনয়, ভালোবাসা ও সাহসের সঙ্গে মানুষের মুখোমুখি হয়ে এটি প্রমাণ করতে পারে, তখনই এই সংহতি জন্ম নেয়। এই বিপ্লব কেবলমাত্র চিনের জনগণকে আন্দোলিত করেনি বরং তা তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জনগণকেও উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ফ্রেইরে এই শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সাংস্কৃতিক ক্রিয়া (Cultural Action) বলে উল্লেখ করেছেন। এই ক্রিয়াকে শোষিত মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠার একটি উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মুক্তিদায়ী শিক্ষা (Liberating Education) : শিক্ষা হবে মুক্তিদায়ী। এখানে শিক্ষার্থীর মুক্তি আসে চারটি দিক থেকে। এগুলি হল—মনের জগতে, সামাজিক দিক থেকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং সবশেষে রাজনৈতিক দিক থেকে। এই ধরনের শিক্ষা নির্বাক সংস্কৃতির বদলে এক প্রতিবাদী সংস্কৃতির জন্ম দেয়। তার ফলে মানুষ নিজের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে, তা উপলব্ধি করতে শেখে। মুক্তিদায়ী শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও চেতনা সুসংগঠিত হয় এবং একজন মানুষ সক্রিয় স্বাধীন মানুষে পরিণত হয়ে ওঠে।

13.6 সারাংশ (Summary)

পাওলো ফ্রেইরের সবচেয়ে সুপরিচিত কাজ হল Pedagogy of the Oppressed (1970) এবং পরবর্তী বইগুলিতে, তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি দেন যা শিক্ষাকে সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতার একটি কাজ হিসাবে জোর দেয়। পাওলো ফ্রেইরে কোন ভাববাদী নন, না প্রয়োগবাদী বা যান্ত্রিক। ফ্রেইরে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার করেন যে, মানুষ বিমূর্ত, বিচ্ছিন্ন, স্বাধীন এবং বিশ্বের সাথে সংযুক্ত নয়। তিনি এ কথাও অস্বীকার করেন যে, পুরুষ ছাড়া বিশ্ব একটি বাস্তবতা হিসেবে বিদ্যমান। তার দৃষ্টিতে চেতনা ও জগৎ যুগপথ। চেতনা ভাববাদী হিসাবে জগতকে অগ্রাধিকার দেয় না বা বস্তুবাদীদের বিশ্বাস হিসাবে এটি বিশ্বকে অনুসরণ করে না। পাওলোর অবস্থান অস্তিত্ববাদীদের কাছাকাছি যারা দৃঢ় ইচ্ছা শক্তিতে সজ্জিত অস্তিত্ববাদী মানুষের উপর অনেক জোর দেয় এবং যারা নিজের প্রচেষ্টায় বিশ্বকে রূপান্তর করতে পারে।

সংক্ষেপে, "বিশ্বে এবং বিশ্বের সাথে একটি বিষয় হিসাবে মানুষের ভূমিকা।" ফ্রেইরের কাজটি মূলত স্বাক্ষরতা এবং পুরুষ ও মহিলাদের নিজেদের পক্ষে কাজ করার মাধ্যমে তাদের শক্তিহীনতার অনুভূতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পর্কিত।

13.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. পাওলো ফ্রেইরের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
2. ফ্রেইরের মতে শিক্ষার সংজ্ঞা দিন।
3. শিক্ষার লক্ষ্য এবং শিক্ষক সম্পর্কে ফ্রেইরের মতবাদ লিখুন।
4. ফ্রেইরের মতবাদ অনুযায়ী 'ব্যাংকিং শিক্ষা'-র ধারণা ব্যাক্ত করুন।
5. পাওলা ফ্রেইরের "শোষিতের শিক্ষাতত্ত্ব" সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
6. ফ্রেইরের মতে "বিবেকীকরণ" বলতে কি বোঝেন?
7. ফ্রেইরের মতে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচয় দিন।

13.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

• Paulo Freire, Wikipedia, https:// en.m.wikipedia.org. Retrieved on 10.08.2024

- What are the main ideas in Paulo Freire's Philosophy of education, https:// typeset.io, Retrieved on 11.08.2024
- Paulo Freire (1921–1997), Internet Encyctopedia of Philosophy, https://iep. utm. edn, Retrieved on 12.08.2024
- পাওলো ফ্রেইরে, Wikipedia, https://bn.wikipedia.org, Retrieved on 13.08.2024
- Paulo Freire, Britanica, https://www.britanica.com, Retrieved on 15.08.2024
- Key Pedagogic Thinkers : Paulo Freire–University of Bedfordshie, https:// www.beds.ac.uk, Retrieved on 16.08.2024
- Darder Autonia, The Student Guide of Freire's (2024), https://bloomsburry.com 'Pedagogy of the Oppressed', Retrieved on 18.08.2024

একক 14 ❑ ইভান ইলিচ (Ivan Illich)

গঠন

14.1 উদ্দেশ্য **(Objectives)**

14.2 ভূমিকা **(Introduction)**

14.3 ইভান ইলিচের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবন **(Family Life, Education and Service Life of Ivan Illich)**

14.3.1 ইভান ইলিচের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা **(Family Life and Education of Ivan Illich)**

14.3.2 ইভান ইলিচের কর্মজীবন **(Service Life of Ivan Illich)**

14.4 ইভান ইলিচের মতবাদ অনুযায়ী "ডিস্কুলিং" **("Deschooling" according to Ivan Illich)**

14.4.1 ডিস্কুলিং-এর অর্থ, নীতি ও বৈশিষ্ট্য **(Meaning, Principles and Characteristics of Deschooling)**

14.4.2 বর্তমান স্কুল বর্জনের স্বপক্ষে কারণ **(Reason in support of exclusion of present schools)**

14.5 ইভান ইলিচের মতে শিখন, নন্-ক্লাসরুম লার্ণিং এবং শিক্ষা সম্পদ কেন্দ্র **(Learning, Non-classroom Learning and Educational Resource Centre according to Ivan Illich)**

14.5.1 ইভান ইলিচের মতে শিখন ও নন্-ক্লাসরুম লার্ণিং **(Learning and Non-classroom Learning according to Ivan Illich)**

14.5.2 ইভান ইলিচের মতে শিক্ষা সম্পদ কেন্দ্র **(Educational Resource Centre according to Ivan Illich)**

14.6 সারাংশ **(Summary)**

14.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

14.8 গ্রন্থপুঞ্জ **(Bibliography)**

NSOU/6CC-ED-04 (4th Proof) Seva Mudran

14.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- ইভান ইলিচের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইভান ইনিচের মতবাদ অনুযায়ী "ডিস্কুলিং" সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইভান ইলিচের মতবাদ অনুযায়ী বর্তমান স্কুল বর্জনের স্বপক্ষে কারণ জানতে পারবেন।
- ইভান ইলিচের মতে শিখন ও নন্-ক্লাসরুম লার্ণিং সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইভান ইলিচের মতে শিক্ষা সম্পদ কেন্দ্র সম্পর্কে জানতে পারবেন।

14.2 ভূমিকা (Introduction)

ইভান ইলিচ (1926–2002) ছিলেন একজন অস্ট্রিয়ান দার্শনিক, সমাজ সমালোচক, শিক্ষাবিদ এবং রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত যিনি আধুনিক প্রতিষ্ঠানের সমালোচনার জন্য পরিচিত। তিনি ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ করেন। ইলিচের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হলো "ডিস্কুলিং সোসাইটি" (1971) যেখানে তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সৃজনশীলতা এবং কার্যকরী শিক্ষাকে বাধা দেয় পরিবর্তে স্ব-নির্দেশিত শিক্ষা পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন করে। ইলিচের অন্যতম আর একটি কাজ হলো "মেডিক্যাল নেমেসিস", যা স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসনের উপর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের সমালোচনা করে। ইলিচের ধারণাগুলি প্রায়শই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের নেতিবাচক প্রভাব এবং জীবনযাপন ও শিক্ষার বিকল্প উপায়গুলির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তিনি সমাজের উপর বিদ্যালয় ও শিক্ষার প্রভাব বিশ্লেষণ করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিদ্যালয়গুলি বিপর্যস্ত করার মাধ্যমে একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থা অর্জন করা যেতে পারে। তিনি আরও মনে করেন যে শিক্ষার সার্বজনীনকরণের লক্ষ্য অর্জন এবং বিশ্বের জনসাধারণ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য বিকল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। তিনি বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষা প্রদানের বিকল্প উপায় হিসেবে শিক্ষা সম্পদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।

14.3 ইভান ইলিচের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা ও কর্মজীবন (Family Life, Education and Service Life of Ivan Illich)

14.3.1 ইভান ইলিচের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা (Family Life and Education of Ivan Illich)

ইভান ডোমিনিক ইলিচ 1926 খ্রিস্টাব্দের 4 সেপ্টেম্বর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ করেন। ইলিচের

পিতা ইভান পিটার ইলিচ একজন অস্ট্রিয়ান প্রোকৌশালী এবং মা এলেন ইলিচ ছিলেন একজন ক্রোয়েশিয়ান বংশোদ্ভূত শিক্ষিকা। ইলিচ একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিসহ একটি পরিবারে বেড়ে ওঠেন, যা তার পরবর্তী কাজ ও চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর পারিবারিক জীবন অস্ট্রিয়ান ও ক্রোয়েশিয়ান প্রভাবের সংমিশ্রণ দ্বারা গড়ে উঠেছিল। ইভান ইলিচের তিন ভাইবোন ছিল—তাঁর বড়ভাই আলেকজান্ডার, তাঁর ছোট বোন হেলেন এবং কনিষ্ঠ ভাই জর্জ। 1938 খ্রিস্টাব্দে তাঁর পরিবার ন্যাৎসিদের হাত থেকে বাঁচতে ইতালিতে চলে যান। ইলিচের পিতা 1952 খ্রিস্টাব্দে এবং মা 1968 খ্রিস্টাব্দে মারা যান। ইভান ইলিচ কখনো বিয়ে করেননি। তাঁর জীবন ছিল ব্যক্তিগত এবং তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনার জন্য নিবেদিত। ইভান ইলিচ 2002 খ্রিস্টাব্দে 2 ডিসেম্বর 76 বছর বয়সে জার্মানির ব্রেমেনে মারা যান।

ইভানের শিক্ষাগত যাত্রা শুরু হয়েছিল ইউরোপে, যেখানে তিনি ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে শিক্ষিত হয়েছিলেন। ইলিচ ফ্লোরেন্সে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করেন। তারপর তিনি ফ্লোরেন্সের স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে হিস্টোলজি এবং ক্রিস্টালোগ্রাফি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি সালজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগীয় ইতিহাসে ডক্টরেটে ভর্তি হন। তাঁর ডক্টরেটের কাজ করার সময়, তিনি ইতালিতে ফিরে আসেন, যেখানে তিনি রোমের পন্টিফিকাল গ্রেগরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শন অধ্যয়ন করেন, কারণ তিনি একজন ক্যাথলিক যাজক হতে চেয়েছিলেন। তিনি 1951 খ্রিস্টাব্দে রোমে একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজক হিসেবে নিযুক্ত হন। এরপর তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতোকোত্তর অধ্যয়ন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। কিন্তু তিনি ওয়াশিংটন হাইটসের চার্চ অফ দ্য ইনকারনেশনে প্যারিস যাজক হওয়ার জন্য এই পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত হন।

14.3.2 ইভান ইলিচের কর্মজীবন (Service Life of Ivan Illich)

ইভান ইলিচ সারা জীবন বিভিন্ন সংস্থার সাথে কাজ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ :

(i) **ক্যাথলিক চার্চ :** ইলিচ একজন যাজক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং গির্জার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতায় কাজ করেছিলেন। তিনি পুয়ের্তো রিকোতে একজন ধর্ম প্রচারক ছিলেন। পরে ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং আধুনিক প্রতিষ্ঠানের একজন বিশিষ্ট সমালোচক হয়ে ওঠেন।

(ii) **দ্য সেন্টার ফর ইন্টারকালচারাল স্টাডিজ :** 1968 খ্রিস্টাব্দে ইভান ইলিচ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা সহ আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলি পরীক্ষা এবং সমালোচনা করার জন্য নিবেদিত ছিল।

(iii) **দ্য সেন্টার ফর ইন্টারকালচারাল ডকুমেন্টেশন (CIDOC) :** মেক্সিকোতে কুয়ের্নাভাকাতে

ইলিচ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত CIDOC বিভিন্ন সংস্কৃতির উপর আধুনিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অধ্যয়নের জন্য একটি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, বিশেষ করে শিক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়গুলিতে জোর দেয়।

ইলিচের কর্মজীবন ঐতিহ্যগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপর তাঁর সমালোচনামূলক অবস্থান দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, যা বিকেন্দ্রীভূত এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন করে। ইলিচের সাফল্য নিউইয়র্কের আর্চবিশপ কার্ডিনাল স্পেলম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং 1956 খ্রিস্টাব্দে 30 বছর বয়সে তিনি পুয়ের্তো রিকোর ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস রেক্টর নিযুক্ত হন।

14.4 ইভান ইলিচের মতবাদ অনুযায়ী "ডিস্কুলিং" ("Deschooling" according to Ivan Illich)

14.4.1 ডিস্কুলিং-এর অর্থ, নীতি ও বৈশিষ্ট্য (Meaning, Principles and Characteristics of Deschooling)

ডিস্কুলিং-এর অর্থ (Meaning of Deschooling) : 1971 সালে ইলিচের ডিস্কুলিং সোসাইটি প্রকাশিত হওয়ার সময় 'ডিস্কুলিং' শব্দটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ডিস্কুলিং হল একটি আধুনিক ধারণা যা "বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার বিচ্ছেদ" এবং "স্কুলিং সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে" এর উপর জোর দেয়। ডিস্কুলিং সোসাইটির মূল ধারনা হল শিক্ষার সার্বজনীনীকরণ যা স্কুলের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাই ইলাচ মনে করেন যে শিক্ষার সার্বজনীনীকরণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং বিশ্বের জনসাধারণ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য বিকল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উচিত।

Deschooling-এর নীতি : ইভান ইলিচ যে নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে ডিস্কুলিং সোসাইটির ধারণা তৈরি করেছেন সেগুলি হলো :

- শিক্ষা এবং স্কুলিং এক নয় এবং তারা একে অন্যের থেকে আলাদা।
- স্কুল প্রত্যাখ্যান একটি আমূল পরিবর্তন আনবে সমাজে।
- স্কুলে পড়ালেখার নির্দেশমূলক এবং বাধ্যতামূলক প্রকৃতি শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করে।
- যেহেতু শিশুদের শেখার সহজাত ক্ষমতা থাকে, তাই তারা তাদের সামাজিক পরিবেশ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।
- একটি নতুন সামাজিক শৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য পূর্বে Deschooling করা প্রয়োজন।

ডিস্কুলিং-এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Deschooling) : ইলাচ স্কুলগুলোকে শুধুমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বলে সমালোচনা করেন যেগুলো যুগ যুগ ধরে শিক্ষা প্রদান করে আসছে এবং

জ্ঞানের উৎসগুলোকে কার্যত একচেটিয়া ভাবে দখল করেছে। স্কুলে পড়া বাধ্যতামূলক, যান্ত্রিক, ব্যয়বহুল, মৃত এবং ভীতিকর করা হয়েছে। অতএব, একটি শিক্ষাহীন সমাজের জন্য একটি বিপ্লব শুরু হয়েছে যার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

(1) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিরুদ্ধে (Against Institutionalization) : ইলাচ যে কোনো ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, এটি শারীরিক দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যার ফলে সমাজের অবক্ষয় ঘটে। তাঁর কথায়, "সারা বিশ্বে, স্কুলের সমাজে শিক্ষাবিরোধী প্রভাব রয়েছে। স্কুল এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত যেটি শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ। স্কুলের ব্যর্থতাকে বেশিরভাগ লোকেরা প্রমাণ হিসাবে নেয় যে শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, খুব জটিল, সর্বদা আড়ম্বরপূর্ণ এবং প্রায়শই একটি অসম্ভব কাজ।"

(2) স্কুলিং-এর বিরুদ্ধে (Against Schooling) : ইলিচ মনে করেন যে স্কুলিং প্রক্রিয়া সামগ্রিক ভাবে বিভ্রান্ত করে। শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষা, গ্রেড এবং শিক্ষার সঙ্গে কৃতিত্ব, দক্ষতা এবং নতুন কিছু বলার ক্ষমতা সহ একটি ডিপ্লোমাকে বিভ্রান্ত করতে স্কুল করা হয়।

(3) অ্যান্টি-স্কুল (Anti-schools) : ডিস্কুলিং হল অ্যান্টি-স্কুল এবং তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করা প্রাঙ্গণ, অর্থাৎ, শিশুরা স্কুলের অন্তর্গত, শিশুরা স্কুলে শেখে এবং শিশুদের স্কুলে পড়ানো যাবে। ইলাচ একটি স্কুলকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যেমন—

বয়স নির্দিষ্ট, শিক্ষক নির্দিষ্ট, উপস্থিতি নির্দিষ্ট, পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট, এবং স্থান নির্দিষ্ট, স্কুলগুলি বয়স অনুযায়ী ছাত্রদের গ্রুপ করে।

(4) শিক্ষক-বিরোধী (Anti-teacher) : ইলিচ বলেছেন, "সবাই স্কুলের বাইরে কীভাবে বাঁচতে হয় তা শেখে। আমরা একজন শিক্ষকের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কথা বলতে, ভালবাসতে, অনুভব করতে, খেলতে, বক্তৃতা করতে এবং কাজ করতে শিখতে পারি। শিশুরা বেশিরভাগই সহকর্মী গোষ্ঠী থেকে, পর্যবেক্ষণ থেকে শিখে স্কুলে যাওয়ার জন্য তারা সার্টিফিকেশন এবং তারা যে অর্থ উপার্জন করবে তার চেয়ে তারা কী শিখবে তা নিয়ে কম উদ্বিগ্ন। ইলাচ আরও বলেন যে মধ্যবিত্ত বাবা-মায়েরা তাদের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠান যাতে তারা রাস্তায় গরীবরা যা শেখে তা শিখতে না পারে।

(5) পূর্ণ-সময়ের উপস্থিতি বিরোধী (Anti-full time Attendance) : ইলাচ বলেছেন যে স্কুলগুলি পূর্ণ-সময় বাধ্যতামূলক উপস্থিতি প্রয়োগ করে। শিক্ষক হয়ে ওঠেন একজন অভিভাবক, একজন নৈতিকবাদী এবং শিশুর একজন থেরাপিস্ট। ডিস্কুলিং স্কুলের এই ঐতিহ্যের বিরোধিতা করে।

14.4.2 বর্তমান স্কুল বর্জনের স্বপক্ষে কারণ (Reason in support of present schools)

বর্তমান স্কুলে বর্জন বা খারাপ হওয়ার কারণ : ইভান ইলাচ ডিস্কুলিং-এর জনক। তিনি বর্তমান

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাকে এই কারণে আক্রমণ করেন যে এগুলি সমাজের জন্য কিছু ভাল করেনি। শিক্ষাই সব শিক্ষা নয়। ইলাচের মতে, "বিদ্যালয়ে শেখার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই তবে জীবনের স্কুলে সবকিছু শেখা হয়। স্কুলের কুফল অনেক, যথা, জ্ঞান স্কুলের অন্তর্গত, জ্ঞান একটি নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব গঠন করে এবং জ্ঞান সমাজকে প্রাধান্য দেয়।" ইলাচ বর্তমান স্কুল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং নিম্নলিখিত কারণে তিনি স্কুল বন্ধ করার পক্ষে :

(1) শেখা একটি জটিল এবং জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। অতএব, এটি কেবলমাত্র সেই বিশেষজ্ঞের কাছেই অর্পণ করা উচিত যার যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

(2) এই বিশেষজ্ঞদের তাদের শিক্ষাগত পরিচয় দেখানোর জন্য সার্টিফিকেট থাকতে হবে কর্মদক্ষতা। তাদের উচ্চ অর্থ প্রদান করা প্রয়োজন।

(3) যেহেতু শেখা একটি জটিল এবং ক্রমাগত প্রক্রিয়া, তাই শিশু ও যুবক উভয়কেই শেখার জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হবে স্কুল এবং কলেজে।

(4) স্কুলটি একটি জবরদস্তিমূলক, বৈষম্যমূলক এবং ধ্বংসাত্মক সংস্থা হয়ে উঠেছে।

(5) স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষা বা শেখা ব্যয়বহুল।

(6) শিক্ষার উপর স্কুলের একচেটিয়া আধিপত্য, এবং বাধ্যতামূলক উপস্থিতি শিশু এবং যুবকদের স্কুলে যেতে বাধ্য করা শেখার উন্নতি করবে না।

(7) বিদ্যালয়ের একচেটিয়া ভোক্তা সমাজের দিকে পরিচালিত করে, সেবামূলক সমাজ নয়।

(8) শিক্ষা একটি বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিনিয়োগ করতে হবে বেশি কিন্তু অর্জন অল্প।

(9) স্কুল শিক্ষাকে একচেটিয়া করার চেষ্টা করে, যা শিক্ষাকে জটিল এবং ব্যয়বহুল করে তুলেছে।

(10) সরকার বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বাস্তবায়ন করলেও অসমতা বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষায়।

14.5 ইভান ইলিচের মতে শিখন, নন্-ক্লাসরুম লার্ণিং এবং শিক্ষা সমুহ কেন্দ্র (Learning, Non-classroom Learning and Educational Resource Centre according to Ivan Illich)

14.5.1 ইভান ইলিচের মতে শিখন ও নন্-ক্লাসরুম লার্ণিং (Learning and Non-classroom Learning according to Ivan Illich)

ইভান ইলিচের মতে শিখন (Ivan Illich on Learning) : একজন বিপ্লবী শিক্ষাবিদ হিসেবে, ইলিচ স্কুলে পড়ার পৌরাণিক কাহিনিকে আক্রমণ করেন। একই সময়ে, তিনি Deschooling-এর পক্ষে এবং শেখার বিষয়ে তাঁর ধারণাগুলিকে জোর দিয়েছিলেন। যেমন—

- এটি একটি ধারবাহিক প্রক্রিয়া।
- এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্যার সমাধান চায়। এটা স্কুলের দেওয়ালে সীমাবদ্ধ নয়।
- এটি ঘটে যখন লোকেরা তাদের স্বার্থ অনুসরণ করে এবং তাদের পূরণ করতে চায়।

নন-ক্লাসরুম লার্নিং (Non-Classroom Learning) : শ্রেণীকক্ষবিহীন শিক্ষার ধারণাটি ইভান ইলিচের সমাজকে শিক্ষাহীন করার ধারণা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু নন-ক্লাসরুম শেখার ধারণাটি জন হল্ট দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। তিনি বলেছেন যে স্কুল সংস্কার ছাড়াও, আমরা শিক্ষার ভিত্তিগুলি পরীক্ষা করার চেষ্টা করি এবং দেখতে পাই যে স্কুল প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের সর্বোত্তম উপায় বা অন্যান্য বিকল্পগুলি কী তা খুঁজে বের করে। স্কুলে ছাত্রের স্বাধীনতা সীমিত, অত্যধিক নিয়ম-কানুন এবং কর্তৃত্ব তাদের মধ্যে দাসত্ব ও ভয়ের অনুভূতি তৈরি করে। শ্রেণীকক্ষ বহির্ভূত শিক্ষা বিদ্যালয়ের থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করে।

কমিউনিটি রিসোর্স ব্যবহার করে শেখাকে নন-ক্লাসরুম লার্নিং বলে। অ-শ্রেণীকক্ষ শিক্ষা স্কুলের বাইরে থেকে অর্জিত শেখার ব্যবহারিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ঘটে।

নন-ক্লাসরুম শেখার পদ্ধতি (Methods of Non-Classroom Learning) : শিক্ষার্থীরা যখন ভ্রমণ, প্রশিক্ষণ, সেবা, স্ব-অভিজ্ঞতা এবং অন্যদের কাছ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিবেশের সংস্পর্শে আসে তখন অ-শ্রেণীকক্ষ শিক্ষা হয়।

- **ভ্রমণ (Travel) :** ভ্রমণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে, বিভিন্ন স্থানের সত্যতা, ভাষা, জলবায়ু, শিল্প ও ভূগোল এবং সেখানকার মানুষ।
- **বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (Vocational training) :** এটি চাকরির প্রশিক্ষণের জন্য শেখার সবচেয়ে সহজ উপায়। মানুষ যখন তাদের পেশাগত দিক দেখে তখন ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যেমন—হাসপাতাল, হোটেল, বেকারি, সেলাইয়ের দোকান, শিল্প, টুলের দোকান, স্টুডিও, প্রিন্ট দোকান ইত্যাদি।
- **স্বেচ্ছাসেবামূলক পরিষেবা (Voluntary service) :** রাস্তা তৈরি, রাস্তা, কূপ, পার্ক এবং পুকুর পরিষ্কার করা, অভাবী লোকদের সাহায্য করা ইত্যাদি পরিষেবা যার দ্বারা একজন ব্যক্তি আরও ভালভাবে শিখতে এবং সামাজিক গুণাবলী বিকাশ করতে পারে।
- **অনানুষ্ঠানিক জরিপ (Informal survey) :** এই ধরনের শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চালিত হয় যখন সে অন্য মানুষের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে এবং সংস্পর্শে আসে।
- **আত্ম-অভিজ্ঞতা (Self-experience) :** আত্ম-অভিজ্ঞতা হল নিজের কার্যকলাপের ফলাফল। এটি সামাজিক নাটক, বই পড়া, টেলিভিশন দেখা থেকেও অর্জিত হয় এবং অন্যদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন ঘটে। একজন ব্যক্তি স্ব-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আরও ভাল শিখতে পারে।

14.5.2 ইভান ইলিচের মতে শিক্ষা সম্পদ কেন্দ্র (Educational Resource Centre according to Ivan Illich)

শিক্ষা সম্পদ কেন্দ্র (Educational Resource Centre) : ইভান ইলিচ স্কুলের বাইরে শিক্ষা প্রদানের বিকল্প উপায় হিসেবে শিক্ষামূলক সম্পদ কেন্দ্রের সুপারিশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছেন :

1. প্রতিটি গ্রামে শিক্ষা সম্পদ কেন্দ্র খোলা উচিত।
2. জনসাধারণকে তাদের বয়স নির্বিশেষে এই কেন্দ্রগুলি ব্যবহার করা উচিত।
3. গণমাধ্যম যেমন রেডিও, টেলিভিশন, জার্নাল এবং সংবাদপত্রের উচিত কেন্দ্রে একটি জায়গা তৈরী।
4. এতে লাইব্রেরি সুবিধা প্রদান করতে হবে।
5. তাদের নিজস্ব আগ্রহ অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবী শেখার দল তৈরি করে।
6. প্রায় একই বয়সের লোকদের কেন্দ্রে জড়ো হওয়া উচিত এবং ভাগ করা উচিত নিজেদের মধ্যে তাদের প্রতিভা।
7. এটি স্কুলে পড়ালেখার বাধ্যতামূলক এবং নির্দেশমূলক প্রকৃতি থেকে মুক্ত।
8. এটি শিক্ষাকে অনানুষ্ঠানিক, আনুষঙ্গিক এবং জীবনকে দীর্ঘায়িত করে।
9. এটি সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য এবং কোন হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত।

14.6 সারাংশ (Summary)

ইভান ইলিচ ছিলেন একজন ক্রোয়েশিয়ান অস্ট্রিয়ান দার্শনিক, যিনি শিক্ষা, চিকিৎসা, কাজ, শক্তির ব্যবহার, পরিবহণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমসাময়িক অনুশীলনকে সম্বোধন করেছিলেন। যে বইটি ইভান ইলিচকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হল 1971 সালে প্রকাশিত Deschooling Society। এটি বাধ্যতামূলক গণশিক্ষার একটি যুগান্তকারী সমালোচনা ছিল। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে স্কুল ব্যবস্থার নিপীড়নমূলক কাঠামো সংস্কার করা যাবে না তবে আজীবন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পঙ্গু প্রভাব থেকে মানবতাকে মুক্ত করার জন্য অবশ্যই এটি ভেঙে ফেলতে হবে। Deschooling, শিক্ষার উপর ইভান ইলিচের লেখাগুলি বিভিন্ন ভাষায় পুনরুৎপাদিত নিবন্ধ এবং জনসাধারণের বক্তৃতার সংগ্রহের পাশাপাশি বই, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবহণের মতো বিষয়গুলিতে এবং যে উপায়ে আন্তর্জাতিকভাবে

বিতরণ করা হয় তা নিয়ে গঠিত। ভবিষ্যৎ সমাজ সংগঠিত হতে পারে। তিনি চারটি কেন্দ্রীয় ধারণা উপস্থাপন করেন যা শিক্ষার উপর তার পুরো কাজকে জুড়ে দেয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ের ধাঁচে গড়ে ওঠা বিকল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এটির চেষ্টা করা হলে এটি আরও বাস্তবসম্মত হবে; না তাদের ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের নতুন মনোভাব, না শিক্ষাগত হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যারের বিস্তার, না শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদের দায়িত্ব প্রসারিত করার প্রয়াস যতক্ষণ না এটি ছাত্রদের জীবনকালকে আচ্ছন্ন করে দেয় তা সর্বজনীন শিক্ষা প্রদান করবে। ডিস্কুলিং সোসাইটির ভূমিকায় ইলিচ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এভারেট রেইমারের কাছেই তিনি পাবলিক শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহের জন্য ঋণী।

14.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. ইভান ইলিচের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
2. ইভান ইলিচের কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
3. ইভান ইলিচের ডিস্কুলিং-এর অর্থ, নীতি এবং বৈশিষ্ট্য লিখুন।
4. ইভান ইলিচের মতানুসারে বর্তমান স্কুল বর্জনের কারণ লিখুন।
5. ইভান ইলিচের মতানুসারে শিখন ও নন্-ক্লাসরুম লার্ণিং সম্পর্কে লিখুন।
6. ইভান ইলিচের মতে শিক্ষা সম্পদকেন্দ্র বলতে কি বোঝেন?

14.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- Ivan Illich, Wikipedia, https://en.m.wikipedia.org, Retrieved on 19.08.2024
- Ivan Illich. Austrian Philosophy, Priest & Social Critic, https"//www. britannica. com, Retrieved on 20.08.2024
- Pearce Wright (2003), Ivan Illich, The Laneet, vol 361, https"// www.thelancet.com, Retrieved on 12.08.2024
- Ivan Illich (1971), Deschooling Society, Wikipedia, https://en. m. wikipedia. org, Retrieved on 21.08.2024
- Illich, Ivan (1973), Deschooling Society, Harmondsworth UK: Penguin, https:// www.learningonline.com, Retrieved on 22.08.2024

- Smith, M. K (2011), Ivan Illich : deschooling, comiviality and lifelong learning, The encyclopedia of pedagogy and informal education. https:// infed org. Retrieved on 22.08.2024
- Suryanarayan, shalini (2018), Ivon Illich. Education and Society, https:// ebooks, inflibent ac.in, Retrieved on 23.08.2024

একক 15 ❑ এ. পি. জে. আবদুল কালাম (A. P. J. Abdul Kalam)

গঠন

15.1 উদ্দেশ্য **(Objectives)**

15.2 ভূমিকা **(Introduction)**

15.3 এ. পি. জে. আবদুল কালামের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা, কর্মজীবন এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি **(Family Life, Education, Service Life and Spiritual Perspective of A. P. J. Abdul Kalam)**

15.3.1 এ. পি. জে. আবদুল কালামের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা **(Family Life and Education of A. P. J. Abdul Kalam)**

15.3.2 এ. পি. জে. আবদুল কালামের কর্মজীবন **(Service Life of A. P. J. Abdul Kalam)**

15.3.3 এ. পি. জে. আবদুল কালামের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি **(Spiritual Perspective of A. P. J. Abdul Kalam)**

15.4 বিজ্ঞানী হিসেবে এ. পি. জে. আবদুল কালামের অবদান এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর ভূমিকা **(A. P. J. Abdul Kalam's Contribution as a Scientist and his role as the President of India)**

15.4.1 বিজ্ঞানী হিসেবে এ. পি. জে. আবদুল কালামের অবদান **(A. P. J. Abdul Kalam's Contribution as a Scientist)**

15.4.2 ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে কালামের ভূমিকা **(Kalam's role as the President of India)**

15.5 এ. পি. জে. আবদুল কালামের শিক্ষাগত দর্শন, কিছু অনুপ্রেরণামূলক উদ্ধৃতি এবং তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ **(Educational Philosophy, some Inspiring Quatations of A. P. J. Abdul Kalam and his notable books)**

15.5.1 এ. পি. জে. আবদুল কালামের শিক্ষাগত দর্শন **(Educational Philosophy of A. P. J. Abdul Kalam)**

15.5.2 এ. পি. জে আবদুল কালামের কিছু অনুপ্রেরণামূলক উদ্ধৃতি (Some Inspiring Quotations of A. P. J. Abdul Kalam)

15.5.3 এ. পি. জে আবদুল কালামের উল্লেখযোগ্য রচিত গ্রন্থ (Notable Works of A. P. J. Abdul Kalam)

15.6 সারাংশ (Summary)

15.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

15.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

15.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা—

- এ. পি. জে. আবদুল কালামের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এ. পি. জে. আবদুল কালামের কর্মজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এ. পি. জে. আবদুল কালামের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিজ্ঞানী হিসেবে এ. পি. জে. আবদুল কালামের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে এ. পি. জে. আবদুল কালামের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এ. পি. জে. আবদুল কালামের শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এ. পি. জে. আবদুল কালামের কিছু অনুপ্রেরণামূলক উদ্ধৃতি জানতে পারবেন।
- এ. পি. জে. আবদুল কালামের কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম জানতে পারবেন।

15.2 ভূমিকা (Introduction)

এ. পি. জে. আবদুল কালাম (1931–2015) একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং ভারতের 11 তম রাষ্ট্রপতি ছিলেন, যিনি 2002 থেকে 2007 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন কর্মসূচীতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তিনি "মিসাইল ম্যান" হিসেবে পরিচিত। প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ গবেষণায় দেশের জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কালাম তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং শিক্ষা ও যুব উন্নয়নে নিষ্ঠার জন্য গভীরভাবে সম্মানিত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে অনুপ্রেরণামূলক বই এবং তাঁর আত্মজীবনী, "উইংস অফ ফায়ার", যা তাঁর নম্র

সূচনা এবং বিশিষ্টতার উত্থানের বর্ণনা দেয়। তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব এবং পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত ও শিক্ষিত করার প্রচেষ্টার জন্য ভারতীয় ইতিহাসে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হিসেবে রয়ে গিয়েছেন।

15.3 এ. পি. জে. আবদুল কালামের পারিবারিক জীবন, শিক্ষা, কর্মজীবন এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি (Family Life, Education, Service Life and Spiritual Perspective of A. P. J. Abdul Kalam)

15.3.1 এ. পি. জে. আবদুল কালামের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা (Family Life and Education of A. P. J. Abdul Kalam)

পারিবারিক জীবন

আভুল পাকির জয়নুলাবদিন আবদুল কালাম 1931 খ্রিস্টাব্দের 15 অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির (অধুনা ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের) রামেশ্বরমের এক তামিল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আভুল পাকির জয়নুলাবদিন ছিলেন একজন নৌকা মালিক ও স্থানীয় মসজিদের ইমাম এবং মাতা অশিয়াম্মা ছিলেন গৃহবধূ। তাঁর পিতা রামেশ্বরমে ও অধুনা লুপ্ত ধনুষ্কোড়ির মধ্যে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের নৌকায় পারাপার করতেন। কালামের পরিবার ছিল অত্যন্ত গরিব। অল্প বয়স থেকেই পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তাঁকে কাজ করা শুরু করতে হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর পিতাকে সাহায্য করার জন্য তাঁকে সংবাদপত্রে লেখালেখি শুরু করতে হয়।

এ. পি. জে. আবদুল কালাম পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবেচেয়ে ছোট ছিলেন। তাঁর বড় এক দিদি ছিলেন, আসিস জোহরা। তারপরে তিন দাদা মোহাম্মদ মুথু মীরা লেব্বাই মারাইকায়ার, মুস্তফা কালাম এবং কাসিম মোহাম্মদ। তিনি সারা জীবন তাঁর বড় ভাইবোন এবং তাদের বর্ধিত পরিবারের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে তাঁর পরিবারের জন্য অর্থ পাঠাতেন। তিনি আজীবন ব্যাচেলার ছিলেন। কালাম তাঁর সততা এবং সরল জীবনযাপনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর কখনই টেলিভিশন ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদের মধ্যে ছিল তাঁর বইপত্র, বীণা, কিছু পোশাক, একটি সিডি প্লেয়ার এবং একটি ল্যাপটপ। কালামের পিতা 1956 খ্রিস্টাব্দে এবং মাতা 1990 খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

2015 খ্রিস্টাব্দের 27 জুলাই মেঘালয়ের শিলং শহরে অবস্থিত 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট' নামক প্রতিষ্ঠানে ''বসবাসযোগ্য পৃথিবী'' বিষয়ে বক্তব্য রাখার সময় কালাম ভারতীয় সময় সন্ধ্যা 6.30 নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে বেথানী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে ভারতীয় সময় সন্ধ্য 7.45 নাগাদ 83 বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কালামের মৃতদেহ ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে করে শিলং থেকে গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে একটি সি-130 হারকিউলিস বিমানে নতুন দিল্লীর পালাম বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতের তদানিন্তন রাষ্ট্রপতি

প্রণব মুখোপাধ্যায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তিন বাহিনীর প্রধান কালামের মরদেহে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এরপর জাতীয় পতাকায় ঢেকে কালামের দেহ তাঁর দিল্লীর বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব সহ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিরা কালামের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শিক্ষা

বিদ্যালয়ে এ. পি. জে. আবদুল কালাম ছিলেন সাধারণ মানের ছাত্র। কিন্তু তাঁর শিক্ষা গ্রহণে তীব্র আগ্রহ ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি পড়াশুনা করতেন এবং অঙ্ক কষতেন। রামনাথপুরম স্কোয়ার্টজ ম্যাট্রিকুলেশন স্কুল থেকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পর কালাম তিরুচিরাপল্লির সেন্ট জোসেফস কলেজে ভর্তি হন। 1954 খ্রিস্টাব্দে কলাম সেই কলেজ থেকেই পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হন।

1955 খ্রিস্টাব্দে তিনি মাদ্রাজে (অধুনা চেন্নাই) চলে আসেন। তিনি মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি" থেকে 1957 খ্রিস্টাব্দের বিমান প্রযুক্তিতে তাঁর শিক্ষা শেষ করেন। একটি ক্লাস প্রোজেক্টে কাজ করার সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিন তাঁর কাজের অগ্রগতি না দেখে অসন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁকে বলেন, তিন দিনের মধ্যে কাজটি শেষ করতে না পারলে তাঁর বৃত্তি প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। কালাম তিন দিনেই কাজটি শেষ করেন। তা দেখে ডিন খুশী হন। পরে তিনি কালামকে লিখেছিলেন, "আমি তোমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলাম। তোমাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে বলেছিলাম, যা করা খুব কঠিন ছিল।" কালাম অল্পের জন্য ফাইটার পাইলট হওয়ার সুযোগ হারান। উক্ত পরীক্ষায় ভারতীয় বিমানবাহিনীর আটজন পাইলটের দরকার ছিল। তিনি পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করেছিলেন। এ. পি. জে. আবদুল কালাম 40টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 7টি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী পান।

15.3.2 এ. পি. জে. আবদুল কালামের কর্মজীবন (Service Life of A. P. J. Abdul Kalam)

এ. পি. জে. আবদুল কালাম "মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজি" থেকে বিমান প্রযুক্তিতে শিক্ষা শেষ করার পর 1960 খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার এরোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এস্ট্যাবলিশমেন্টে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি একটি ছোট হোভারক্রাফটের নকশা তৈরি করে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন।

তিনি 1963–64 সালে নাসার ল্যাংচি রিসার্চ সেন্টার, গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার এবং ওয়ালোপ্স ফ্লাইট ফেসিলিটি পরিদর্শন করেন। কালাম ভারতীয় জাতীয় মহাকাশ গবেষণা কমিটিতে প্রখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানী ড. বিক্রম সারাভাইয়ের অধীনে কাজ করতেন। 1969 খ্রিস্টাব্দে আবদুল কালাম ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় বদলি হন। সেখানে তিনি ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী যানের (SLV-III) প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন যা 1980 খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে "রোহিণী" কৃত্রিম উপগ্রহকে তার কক্ষপথে

স্থাপন করে। কালাম 1965 খ্রিস্টাব্দে প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থায় স্বাধীনভাবে একটি রকেট প্রকল্পের কাজ শুরু করেন। 1969 খ্রিস্টাব্দে তিনি সরকারের অনুমোদন লাভ করেন এবং আরও কয়েকজন প্রকৌশলীকে নিয়ে এই প্রকল্পের ব্যপ্তি ঘটান।

কর্মজীবন থেকে আনুষ্ঠানিক অবসর নেওয়ার পর কালাম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট শিলং, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট আহমেদাবাদ এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ইন্দোরে ভিজিটিং প্রফেসর হন। তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোরের একজন সাম্মানিক ফেলো, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, তিরুবনন্তপুরমের চ্যান্সেলর, আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভিজিটিং প্রফেসর এবং ভারত জুড়ে অন্যান্য অনেক একাডেমিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

15.3.3 এ. পি. জে. আবদুল কালামের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি (Spiritual Perspective of A. P. J. Abdul Kalam)

কালামের জীবনে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক যাত্রাকে নিয়ে লেখা তাঁর সর্বশেষ বই এর নামকরণ করেছিলেন, "Transcendence : My Spiritual Experience with Pramukh Swami Maharaj".

ইসলাম

কালাম একজন গর্বিত এবং অনুশীলনকারী মুসলমান ছিলেন। রমজানে দৈনিক নামাজ ও রোজা কালামের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। তাঁর পিতা আভুল পাকির জয়নুলাবেদিন তাঁর নিজের শহর রামেশ্বরমের একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন এবং কঠোরভাবে তাঁর সন্তানদের মধ্যে ইসলামিক রীতিনীতিগুলি স্থাপন করেছিলেন। কালামের পিতা তরুন কালামকে আন্তঃধর্মীয় সম্মান এবং সংলাপের মূল্য বুঝিয়েছিলেন। কালাম যেমন লিখেছিলেন, "প্রতি সন্ধ্যায় আমার বাবা এ. পি. জয়নুলাবেদিন একজন ইমাম, পাকশী লক্ষণ শাস্ত্রী, রামনাথস্বামী হিন্দু মন্দিরের পুরোহিত গরম চা নিয়ে বসতেন এবং নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন"। যেহেতু কালাম বিশ্বাস করতেন যে "অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা" ইসলামের মূল ভিত্তিগুলির মধ্যে একটি, তাই তিনি বলতেন, "মহাপুরুষদের জন্য, ধর্ম হল বন্ধুত্ব করার একটি উপায়; ছোট লোকেরা ধর্মকে যুদ্ধের হাতিয়ার করে তোলে।

সমন্বয়বাদ

ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কালামের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। ভারতের বহুবিধ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপাদানের প্রশংসা করার জন্য তিনি সমন্বয়বাদকে নির্বাচিত করেছিলেন। কোরান এবং ইসলামিক অনুশীলনে তাঁর বিশ্বাস ছাড়াও, কালাম হিন্দু ঐতিহ্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিখেছিলেন, ভগবদগীতা পড়েছিলেন এবং তিনি একজন নিরামিষাশী ছিলেন। কালাম তামিল

কবিতা লেখা, বীণা বাজানো এবং প্রতিদিন কর্ণাটকীয় ভক্তিমূলক সঙ্গীতও উপভোগ করতেন। 2002 খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর পার্লামেন্টে তাঁর একটি প্রাথমিক বক্তৃতায় তিনি অখণ্ড ভারতের জন্য তাঁর আকাঙ্খা পুর্নব্যক্ত করেছিলেন, "গত এক বছরে আমি সমস্ত ধর্মের অনেক আধ্যাত্মিক নেতার সাথে দেখা করেছি এবং আমি চাই, আমাদের দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে মনের ঐক্য আনয়নের জন্য কাজ করার চেষ্টা করব"।

গুরু রূপে প্রমুখ স্বামী

একীভূত ভারত তৈরিতে সাহায্য করার জন্য কালাম হিন্দু গুরু প্রমুখ স্বামীকে তাঁর চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক শিক্ষক ও গুরু হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। কালাম এবং প্রমুখ স্বামীর মধ্যে চৌদ্দ বছরে আটটি সাক্ষাতের মধ্যে প্রথমটি 2001 সালের 30 জুন নতুন দিল্লীতে হয়েছিল, যে সময় কালাম প্রমুখ স্বামীর সরলতা এবং আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে বর্ণনা করেছিলেন। কালাম প্রমুখ স্বামীর সহানুভূতি এবং সমবেদনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে "Transeendence : My Spiritual Experience with Pramukha Swami Maharaj" বইটি লিখেছিলেন।

15.4 বিজ্ঞানী হিসেবে এ. পি. জে. আবদুল কালামের অবদান এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর ভূমিকা (A. P. J. Abdul Kalam's Contribution as a Scientist and his role as the President of India)

15.4.1 বিজ্ঞানী হিসেবে এ. পি. জে. আবদুল কালামের অবদান (A. P. J. Abdul Kalam's Contribution as a Scientist)

মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজি (MIT) থেকে স্নাতক হওয়ার পর কালাম 1960 খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্টে যোগ দেন এবং ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেপমেন্ট সার্ভিস (DRDS) এর সদস্য হওয়ার পর বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেন। কালাম বিখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানী বিক্রম সারা ভাইয়ের অধীনে মহাকাশ গবেষণার জন্য ভারতীয় জাতীয় কমিটির অংশ হয়েছিলেন। 1969 খ্রিস্টাব্দে কালামকে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনে (ISRO) স্থানান্তর করা হয়েছিল, যেখানে তিনি ভারতের প্রথম স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্ল্ (SLV-III) এর প্রকল্প পরিচালক ছিলেন যেখান থেকে 1980 খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে "রোহিণী" স্যাটেলাইটকে পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষপথে সফলভাবে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল।

1970-এর দশকে কালাম দুটি প্রকল্প প্রোজেক্ট ডেভিল ও প্রোজেক্ট ভ্যালিয়েন্ট পরিচালনা করেছিলেন, যা সফল SLV প্রোগ্রামের প্রযুক্তি থেকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে চেয়েছিল। কালামের গবেষণা এবং শিক্ষাগত নেতৃত্ব 1980-এর দশকে তাঁকে দারুণ খ্যাতি ও মর্যাদা এনে দেয়,

যা ভারত সরকারকে তাঁর পরিচালনায় একটি উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি শুরু করতে উৎসাহিত করে। ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলমেন্ট প্রোগ্রাম (IGMDP) নামে মিশনের জন্য 3.88 বিলিয়ন টাকা বরাদ্দের জন্য ভারতের মন্ত্রিসভা অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর. ভেঙ্কটরামন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং কালামকে প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। 'অগ্নি' একটি মধ্যবর্তী রেঞ্জের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং "পৃথ্বী" নামক কৌশলগত সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল সহ মিশনের অধীনে অনেকগুলি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে কালাম একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এ. পি. জে. আবদুল কালাম 1992 এর জুলাই থেকে 1999 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা এবং প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ের মধ্যে পোখরান-2 পারমাণবিক পরীক্ষা পরিচালিত হয়েছিল যেখানে তিনি একটি নিবিড় রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কালামের মিডিয়া কভারেজ তাঁকে দেশের সেরা পরিচিত পরমাণু বিজ্ঞানী করে তোলে।

1998 খ্রিস্টাব্দে কার্ডিওলজিস্ট সোমা রাজুর সাথে কালাম একটি কম মূল্যের করোনারি স্টেন্ট তৈরি করেন, যার নাম "কালাম-রাজু-স্টেন্ট"। 2012 খ্রিস্টাব্দে এই জুটি গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবার জন্য একটি শ্রমসাধ্য ট্যাবলেট কম্পিউটার ডিজাইন করেছিল, যার নামকরণ করা হয়েছিল "কালাম-রাজ-ট্যাবলেট্"।

15.4.2 ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে কালামের ভূমিকা (Kalam's role as the President of India)

এ. পি. জে. আবদুল কালাম 2002 খ্রিস্টাব্দের 25 জুলাই থেকে 2007 খ্রিস্টাব্দের 25 জুলাই পর্যন্ত কে. আর. নারায়ণণের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভারতের 11তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কালাম ছিলেন ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি যাকে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান "ভারতরত্ন" দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্নান (1954) এবং জাকির হুসেন (1963) ছিলেন ভারতরত্ন প্রাপক যাঁরা পরে ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।

কালাম রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর পাঁচ বছরের মেয়াদে ধর্ষক ধনঞ্জয় চ্যাটার্জির ক্ষমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যাকে পরে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। কালাম 2005 খ্রিস্টাব্দে বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার বিতর্কিত সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রপতির মেয়াদের শেষদিকে 2007 খ্রিস্টাব্দের 20 জুন কালাম দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার নেওয়ার কথা বিবেচনা করার জন্য তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যদি 2007 এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁর বিজয় নিশ্চিত থাকে। দুই দিন পর তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন।

15.5 এ. পি. জে. আবদুল কালামের শিক্ষাগত দর্শন, কিছু অনুপ্রেরণামূলক উদ্ধৃতি এবং তাঁর রচিত কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ (Educational Philosophy, some Inspiring Quotations of A. P. J. Abdul Kalam and his Notable Books)

15.5.1 এ. পি. জে. আবদুল কালামের শিক্ষাগত দর্শন (Educational Philosophy of A. P. J. Abdul Kalam)

এ. পি. জে. আবদুল কালাম ভারতের 11তম রাষ্ট্রপতি এবং একজন বিখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানী। তাঁর প্রভাবশালী শিক্ষা দর্শন সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(i) শিক্ষার লক্ষ্য : কালাম বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে শুধুমাত্র জ্ঞানই দেওয়া উচিত নয়, বরং মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা ও সমালোচনামূলক চিন্তা করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি করা উচিত।

তিনি এমন শিক্ষার পক্ষে কথা বলেছেন যা শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করে, উদ্ভাবনী চিন্তাবিদ হয়ে উঠতে সাহায্য করে এবং জাতির অগ্রগতিতে অবদান রাখে।

(ii) পাঠ্যক্রম : কালাম একটি পাঠ্যক্রমের কথা বলেছেন যা ব্যবহারিক প্রয়োগের সাথে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে একীভূত করে। তিনি শিক্ষাকে বাস্তব জগতের সমস্যার সাথে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে বিশ্বাস করতেন।

তিনি সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে উৎসাহিত করে এমন বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মতামত ব্যাক্ত করেছেন, শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্যার পক্ষে নয়।

(iii) পাঠদান পদ্ধতি : কালাম উদ্ভাবনী এবং পারস্পরিক সক্রিয় শিক্ষণ পদ্ধতির পক্ষে কথা বলেন। তিনি প্রথাগত মুখস্থ বিদ্যা থেকে দূরে সরে যাওয়ার এবং প্রকল্প-ভিত্তিক শিক্ষা, হাতে-কলমে ক্রিয়াকলাপ এবং অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন।

তিনি এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে বিশ্বাস করতেন, যেখানে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে এবং তাদের জ্ঞানকে ব্যবহারিক উপায়ে প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করা হয়।

(iv) শিক্ষক : কালাম ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষকদের পরামর্শদাতা ও অনুপ্রেরণাদাতা হওয়া উচিত, যাঁরা কেবল বিষয়বস্তু সরবরাহ করার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে এবং পরিচালনা করে।

তিনি শিক্ষকদের সুপ্রশিক্ষিত, আবেগপ্রবণ এবং তাঁদের ক্ষেত্রে নতুন শিক্ষার পদ্ধতি এবং অগ্রগতির সাথে ক্রমাগত আপডেট করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

(v) **তরুণদের অনুপ্রেরণা :** কালামের বক্তৃতা এবং লেখা লক্ষ লক্ষ তরুণ ভারতীয়তকে শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং তাদের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে অনুপ্রাণিত করে। "Wings of Fire" এবং "Ignited Minds" সহ তাঁর প্রেরণামূলক বইগুলি স্বপ্ন, কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যাবসায়ের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে।

(vi) **শিক্ষাগত সংস্কার :** রাষ্ট্রপতি হিসেবে, তিনি সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের উপর জোর দেওয়া শিক্ষাগত সংস্কারের পক্ষে কথা বলেন। শেখার বিষয়টিকে আরও আকর্ষক ও ব্যবহারিক করতে তিনি "প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান" ধারণাটি প্রচার করেন।

(vii) **শিক্ষার মিশন :** কালাম ভারতের যুব সমাজের উন্নয়নকে জাতীয় অগ্রগতির চাবিকাঠি হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং পাঠ্যসূচিতে আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের দিকে মনোনিবেশ করেন।

সর্বোপবি,কালামের শিক্ষা দর্শন একটি আকর্ষক, অগ্রগতিমূলক চিন্তা এবং মূল্যবোধ চালিত শিক্ষার পরিবেশ তৈরির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

15.5.2 এ. পি. জে আবদুল কালামের কিছু অনুপ্রেরণামূলক উদ্ধৃতি (Some Inspirational Quotations of A. P. J. Abdul Kalam)

ছাত্র, শিক্ষক এবং জনগণের জন্য এ. পি. জে. আবদুল কালামের কিছু অনুপ্রেরণামূলক উক্তি :

ছাত্রদের জন্য

(i) "Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result into action."
"স্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন। স্বপ্ন চিন্তায় রূপান্তরিত হয় এবং চিন্তা কর্মে পরিণত হয়।"

(ii) "You have to dream before your dreams can come true."
"তোমার স্বপ্ন সত্যি হওয়ার আগে তোমাকে স্বপ্ন দেখতে হবে।"

(iii) "If you want to shine like a sun, first burn like a sun."
"তুমি যদি সূর্যের মতো দীপ্তিমান হতে চাও, তাহলে প্রথমে সূর্যের মতো পোড়ো।"

শিক্ষকদের জন্য

(i) "Teachers are the pillars of our society. They are the ones who guide and shape our future."

"শিক্ষকরা আমাদের সমাজের স্তম্ভ। তাঁরাই আমাদের ভবিষ্যৎকে নির্দেশিত ও রূপদান করে।"

(ii) "The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see."
"সর্বোত্তম শিক্ষক হলেন তাঁরা, যারা তোমাকে দেখান কোথায় দেখতে হবে, কিন্তু কী দেখতে হবে তা বলেন না।"

(iii) "To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal."
"আপনার উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য, আপনার লক্ষ্যের প্রতি এককভাবে নিষ্ঠা থাকতে হবে।"

জনগণের জন্য

(i) "Excellence happens not by accident. It is a process."
"উৎকর্ষ ঘটনাক্রমে ঘটে না। এটি একটি প্রক্রিয়া।"

(ii) "The best way to predict the future is to creat it."
"ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী করার সর্বোত্তম উপায় হল এটি তৈরি করা।"

(iii) You can not change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future."
"আপনি আপনার ভবিষ্যত পরিবর্তন করতে পারবেন না, কিন্তু আপনি আপনার অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারেন এবং অবশ্যই আপনার অভ্যাস আপনার ভবিষ্যত পরিবর্তন করবে।"

এই উদ্ধৃতিগুলি কালামের স্বপ্ন, উৎসর্গ, শিক্ষা এবং অধ্যবসায়ের রূপান্তরকারী শক্তির প্রতি বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে।

15.5.3 এ. পি. জে আবদুল কালামের উল্লেখযোগ্য রচিত গ্রন্থ (Some Notable Works of A. P. J. Abdul Kalam)

এ. পি. জে. আবদুল কালাম বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ :

(i) "Wings of Fire"-একটি আত্মজীবনী, তাঁর প্রাথমিক জীবন এবং কর্মজীবনের বিবরণ।

(ii) "India 2020 : A vision for the New Millenium"-ভারতের উন্নয়নের জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির রূপরেখার একটা বই।

(iii) "The Life Tree : Memories of an Indian Scientist"-তাঁর বৈজ্ঞানিক কর্মজীবনকে কেন্দ্র করে আরেকটি আত্মজীবনীমূলক কাজ।

(iv) "Ignited Minds : Unleashing the Power Within India"—ভারতের সম্ভাবনা এবং একটি শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার একটি প্রেরণামূলক বই।

(v) "My Journey : Transforming Deams into Actions"-তাঁর প্রতিচ্ছবি এবং অভিজ্ঞতার একটি সংগ্রহ।

কালামের এই কাজগুলি ভারতের উন্নতির জন্য তাঁর আকাঙ্খা এবং তরুণ মনকে অনুপ্রাণিত করার প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

15.6 সারাংশ (Summary)

এ. পি. জে. আবদুল কালাম (1931–2015) ছিলেন একজন প্রভাবশালী ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদ। ভারতের মহাকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে তাঁর অবদানের জন্য তিনি ব্যাপকভাবে সম্মানিত। তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাকাশ প্রোকৌশল অধ্যয়ন করেন এবং ISRO (Indian Space Research Organisation) এবং DRDO (Defence Research and Development Organisation)-তে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন।

তিনি ভারতের মহাকাশ মিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যার মধ্যে স্যাটেলাইটের সফল উৎক্ষেপণ এবং দেশের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার উন্নয়ন, যেমন অগ্নি ও পৃথ্বী ক্ষেপনাস্ত্র উল্লেখযোগ্য। কালামকে প্রায়শই "ভারতের মিসাইল ম্যান" বলা হয়।

2002 খ্রিস্টাব্দে কালাম ভারতের 11তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং 2007 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন, তিনি ভারতকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এবং শিক্ষাগত ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উপর মনোযোগ দেওয়ার জন্য পরিচিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতির মেয়াদকালের পর তিনি শিক্ষা ও উদ্ভাবনের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে তাঁর লেখা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে "Wings of fire" এবং "India 2020"। কালামের উত্তরাধিকারিদের প্রতি তাঁর নিবেদন, জাতীয় উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা এবং নেতৃত্ব ও শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুপ্রেরণামূলক পদ্ধতির দ্বারা যেন চিহ্নিত হয়।

15.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. এ. পি. জে. আবদুল কালামের পারিবারিক জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
2. কালামের কর্মজীবনের পরিচয় দিন।

3. কালামের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্পর্কে লিখুন।

4. বিজ্ঞানী হিসেবে এ. পি. জে. আবদুল কালামের অবদান কী?

5. রাষ্ট্রপতি হিসেবে কালামের ভূমিকা কি ছিল?

6. এ. পি. জে. আবদুল কালামের শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে লিখুন।

7. কালামের কিছু অনুপ্রেরণামূলক উদ্ধৃতি লিখুন।

8. কালামের রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম লিখুন।

15.8 গ্রন্থপুঞ্জ (Bibliography)

- Kalam, A. P. J. (1999), Wings of Fire : An Autobiography. Universities Press.
- Kalam, A. P. J. & Ramjan, Y. S. (1988), India 2020 : A vision of the new Millenium. Penguin Books.
- Kalam, A. P. J. & Ramjan, Y. S. (2014). Beyond 2020 : A vision for Tomorrow's India. Penguin Books.
- Manna, A. K. (2024). Educational Philosophy of APJ Abdul Kalam. Shipra Publications, Delhi, India.
- A. P. J. Abdul Kalam, Wikipedia. https://bn.wikipedia.org, Retrieved on 27.08.2024.
- A. P. J. Abdul Kalam, Wikipedia. https://en.wikipedia. org, Retrieved on 27.08.2024.

NOTES